অযোধ্যার বেগম



অযোধ্যার বেগম

চণ্ডীচরণ সেন

নবপত্র প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ : ১৮৮৭

প্রথম নবপত্র প্রকাশ : জুলাই, ১৯৫২

প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক : তপন ভৌমিক
প্রেস্ লিঙ্ক
৫/এ রামনাথ বিশ্বাস লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৭

প্রকাশকের নিবেদন

প্রায় একশো বছর পরে আমরা পুনরায় প্রকাশ করলাম চণ্ডীচরণ সেনের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'অযোধ্যার বেগম'। দু'বছর আগে বিস্মৃতির কবল থেকে উদ্ধার করে আমরা পুনরায় প্রকাশ করেছিলাম চণ্ডীবাবুর ব্রিটিশ রাজরোষে দণ্ডিত ঐতিহাসিক উপন্যাস 'মহারাজ নন্দকুমার'। সেদিন আমাদের মনে ছিল সংশয়, আজকের পাঠক সমাজের উৎসাহ সম্পর্কে গভীর সন্দেহ। সেদিনের সেই সংশয় ও সন্দেহ যে কত ভুল তা আজ অক্ষরে-অক্ষরে প্রমাণিত হয়েছে। বাঙালী পাঠকেরা পরম আদরে গ্রহণ করেছেন চণ্ডীবাবুর সেই মহৎ সৃষ্টি। 'অযোধ্যার বেগম' যে একইভাবে গৃহীত হবে এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে জুন পলাশীর প্রান্তরে বণিক ইংরেজ ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারে এগিয়ে এল। ঐ দিনেই হল বাঙালার নবাবী আমলের উচ্ছেদ আর ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ। বণিক ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রথমে প্রচ্ছন্নভাবে আগ্রাসী নীতির মাধ্যমে পূর্ব ভারতের বিশাল ভুখণ্ডে একের-পর-এক রাজ্য গ্রাস করতে লাগল—কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার নীতিতে। তারপর প্রত্যক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠিত হল ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে সাজানো বঙ্গেশ্বর মীর কাশিমকে সমূলে উচ্ছেদ করে। পূর্ব ভারতে রাজ্য বিস্তারের পর বণিক দস্যুদের দৃষ্টি গেল ভারতের উত্তর-পশ্চিম ভুখণ্ডে। সেখানে ছিল তিনটি রাজ্য—রোহিলা, অযোধ্যা, কাশী। শুধু কুটনীতির জোরে এগুলি এক এক করে ধ্বংস করা হল। আর এই ঘটনাগুলি অভিনীত হয়েছিল অষ্টাদশ শতকের সাত-আট দশকে মাত্র পনেরো বছরের ব্যবধানে—১৭৭৫—১৭৮৪ অব্দে। এই ঘটনাবলী নিয়ে ওয়ারেন্ হেস্টিংসের স্বজাতি একটি কালজয়ী ইতিহাস রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থ উদ্বুদ্ধ করেছে বাংলা সাহিত্যের দু'টি মহৎ গ্রন্থ রচনায়—তার একটি হল চণ্ডীচরণ সেনের উপন্যাস 'অযোধ্যার বেগম'। এই ঐতিহাসিক উপন্যাসে যথাযথ পরিচয় পাওয়া যাবে ইংরেজ চরিত্রের। 'অযোধ্যার বেগম' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিবেদন আমরা হুবহু প্রকাশ করলাম।

চণ্ডীচরণ ছিলেন বাংলা সরকারের বিচার বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। শাসক ইংরেজের রোষদৃষ্টি তাঁর ওপর পড়ে। গ্রন্থটির অংশবিশেষ পরিবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হয়। গ্রন্থকার এজন্যে গ্রন্থটির পুনঃপ্রচারে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন।

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯২১ সালে চণ্ডীচরণের এই

ঐতিহাসিক উপন্যাস অবলম্বনে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'অযোধ্যার বেগম' নাটক রচনা করেন। এবং ঐ বছরেই নাটকটি স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। নাট্যকার অপরেশচন্দ্র রোহিলা-সর্দার হাফেজ রহমত খাঁর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

আমাদের সীমিত শক্তির মধ্যে গত কয়েক বছরে আমরা কয়েকটি মহাগ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ করেছি। তার সঙ্গে আজ যুক্ত হল আর একটি মহাগ্রন্থ - চণ্ডীচরণ সেনের 'অযোধ্যার বেগম'। এই গ্রন্থ-প্রকাশে আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত। তাঁর কাছে আমরা বিশেষভাবে ঋণী। শ্রীমতী যূথিকা দেবী তাঁর সংগ্রহের বই দিয়ে আমাদের সাহায্য করার জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ।

প্রসূন বসু

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

ইংরেজি ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দের প্রারম্ভে 'অযোধ্যার বেগম' প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে অযোধ্যা এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল, তাহাই উপন্যাসাকারে এই পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে চৈৎসিংহের রাজ্যধ্বংস এবং অযোধ্যার বেগমদিগের প্রতি অত্যাচার সবিস্তারে বিবৃত হইয়াছে। প্রথমবারে যে দুই সহস্র পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা অল্পকাল মধ্যে নিঃশেষিত হইলে আমি গ্রন্থকারকে এই পুস্তক পুনঃ মুদ্রণের জন্যে অনুরোধ করি, কিন্তু গ্রন্থকার পুস্তক পুনঃমুদ্রিত করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় গত কয়েক বৎসর পর্যন্ত পাঠকগণকে এই পুস্তক প্রদান করিতে পারি নাই। পুস্তকখানি সাধারণের নিকট এত আদৃত হইয়াছে যে শুনিলাম হিন্দী, উর্দু ও গুজরাটী ভাষাতে ইহা অনুবাদিত হইয়াছে। সম্প্রতি পাঠকদিগের আগ্রহাতিশয় দর্শনে আমি গ্রন্থকারের অনুমতি লইয়া এই পুস্তক পুনঃ মুদ্রিত করিলাম। পূর্ব সংস্করণে যে যে স্থান সংশোধনযোগ্য ছিল বর্তমান সংস্করণে ঐ সকল স্থান সংশোধিত পরিবর্তিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে। আশা করি এই সংস্করণ পাঠকদিগের হৃদয়গ্রাহী হইবে।

অগ্রহায়ণ, ১৩০১

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক

The Company and their servants, up to this date, did their "POSSIBLE" in this behalf. They drained the territory of Oude of every Rupee they could wring from it. ***They played the part of great dacoits on a scale most oppressive to its frugal ryots and industrious cultivators.*** They plundered the revenues of Wuzier, nobles, and people, on the plea of defending those who were competent to defend themselves against the force of ***any*** native adversary; and they appropriated their soldiers and military resources, while they charged them tribute for the bereavement.—***Dacoitee in excelsis*** ; ***or, the spoiliation of Oude.***

প্রথম খণ্ড/উল্লঙ্ঘন

প্রথম অধ্যায়/হরিদ্বার

নাদের শাহের ভারত আক্রমণের পরেই দিন দিন মোগল সম্রাটদিগের ক্ষমতার হ্রাস হইতে লাগিল। সমগ্র ভারতবর্ষ ঘোর অরাজকতা পরিপূর্ণ হইল; এবং সেই সার্বভৌমিক অরাজকতার সঙ্গে সঙ্গে স্থানে স্থানে সংগ্রামানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। দিল্লীর বাদশাহের আর রাজ্যশাসন করিবার ক্ষমতা রহিল না। কেমনেই বা থাকিবে? শুদ্ধ কেবল পাশববল প্রয়োগ দ্বারা কি কেহ কখনও রাজ্যশাসন কিম্বা রাজ্যরক্ষা করিতে পারে? জ্ঞাতসারেই হউক, আর অজ্ঞাতসারেই হউক, প্রজাপুঞ্জই রাজাকে রাজ্য-শাসনের ভার প্রদান করেন। রাজা প্রজা-সাধারণের নিকট হইতে রাজ্যশাসন-ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ রাজ্যশাসন করেন; তাহাদিগের ন্যাসধারিস্বরূপ তাহাদিগের ধনসম্পত্তির উপর অধিকার প্রাপ্ত হয়েন। প্রজা হইতে রাজা স্বীয় নিয়োগপত্র লাভ করেন। রাজা প্রজাসমষ্টির ভৃত্য। সুতরাং প্রজারঞ্জন ভিন্ন কেহ রাজপদ রক্ষা করিতে পারেন না।

ভারত-প্রজাগণের এখন আর মোগল সম্রাটদিগের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও বিশ্বাস নাই। প্রজাগণ মোগলদিগের প্রতি বীতানুরাগ হইয়াছে। সুতরাং ঐশ্বরিক অখণ্ডনীয় নিয়মানুসারে মোগল-সাম্রাজ্য যে অনতিবিলম্বে বিলয়-প্রাপ্ত হইবে তাহার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

তিন শত বৎসর পূর্বে সদাচারী, ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান-কুলতিলক আকবর শাহ

সুকোমল হস্তে রাজ্যশাসন-ক্ষমতা সঞ্চালন করিতেন, অপত্য-নির্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন, সুতরাং প্রজাগণ তাঁহার উপর অনায়াসে বিশ্বাস স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল ; এবং তন্নিবন্ধনই তাঁহার রাজ্য অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু এখন আর দিল্লীতে আকবর শাহ নাই। এখন আকবরের পরিবর্তে অর্থগৃধ্ন, নীচাশয় ইন্দ্রিয়াসক্ত নরপিশাচগণ শিরে রাজমুকুট ধারণ করিতেছে। ইহারা জনসাধারণের শ্রদ্ধা ভক্তি ও ভালবাসা আকর্ষণ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। ইহাদিগের নিষ্ঠুরাচরণ রাজবিপ্লবের সময় সমুপস্থিত করিয়াছে। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় সুবাদার এবং সৈন্যাধ্যক্ষগণ দিল্লীর অধীনতা-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আপন আপন প্রদেশে স্বাধীনতার ধ্বজা উত্তোলন করিতেছেন।

বঙ্গদেশে নবাব আলিবর্দী খাঁ, বারাণসীতে রাজা বলবন্ত সিংহ, অযোধ্যায় নবাব সবদর জঙ্গ, রোহিলখণ্ডে আলি মহম্মদ ; হায়দ্রাবাদে নিজাম, মহিশূরে হায়দর আলি—ইহারা প্রত্যেকেই আপনাদিগকে স্বাধীন রাজা বলিয়া মনে করেন ; দিল্লীর অধীনতা কার্যত কেহই স্বীকার করেন না।

কিন্তু এই সকল স্বাধীনতা-প্রয়াসী সুবাদার এবং সৈন্যাধ্যক্ষদিগের কার্যকলাপের মধ্যে কেবল রাজ্যবৃদ্ধির প্রয়াসই পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। পূর্বলব্ধ রাজ্য কিরূপে রক্ষা করিবেন তদ্বিষয়ে তাঁহারা কোনো চিন্তা করিতেন না। এই হীনবুদ্ধি সুবাদার এবং নবাবগণ বুঝিতেন না যে, রাজ্যলাভ অপেক্ষা রাজ্যরক্ষা করাই সমধিক কষ্টকর ব্যাপার।

এ সংসারে দুরাশাই মনুষ্যের বিনাশের কারণ ; উচ্চাভিলাষই মানুষকে সময়ে সময়ে বিপদের দিকে পরিচালিত করে। ভারতবর্ষের প্রাগুক্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় সুবাদার সৈন্যাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান লোক দিল্লীর সম্রাটের বিনাশকাল সমুপস্থিত দেখিয়া শুধু কেবল আপন আপন রাজ্য-বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রায় প্রত্যেকেই আপন প্রতিবেশীর রাজ্য আক্রমণ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ কখনও মুসলমানদিগের রাজ্য আক্রমণ করিতে লাগিলেন, কখনও বা আপনাদিগের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। অযোধ্যার নবাব স্বীয় প্রতিবেশী রোহিলাদিগের রাজ্যহরণ করিবার সুযোগ দেখিতে লাগিলেন ; আবার রোহিলাধিপতি আলি মহম্মদ দুর্বল প্রতিবেশীদিগের রাজ্য অপহরণ-পূর্বক রোহিলখণ্ডের আয়তন বৃদ্ধি করিলেন। মহীশূরের হায়দর আলি

নিজামের সুবিস্তীর্ণ রাজ্যের উপর সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। নিজাম স্বীয় রাজ্যের নিকটস্থিত বেরার প্রদেশ করতলস্থ করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান হইলেন। ঈদৃশ অবস্থা নিবন্ধনে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ এক মহাশ্মশান ক্ষেত্র হইয়া পড়িল। সমগ্র ভারতবর্ষ যেন ভূত প্রেত পিশাচে পরিপূর্ণ হইল। সর্বত্রই সংগ্রামানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কিন্তু আপন রাজ্যরক্ষণে অসমর্থ পররাজ্যলোলুপ এই সকল সুবাদার, রাজা এবং নবাব চরমে প্রত্যেককেই স্বীয় স্বীয় পূর্বাধিকৃত রাজ্যও হারাইলেন। সকলেরই এক প্রকার অবস্থা হইল। রাজ্যবৃদ্ধির তৃষ্ণা সকলকেই রাজ্যচ্যুত করিল।

দেশের স্থানে স্থানে এইরূপ সংগ্রামানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে প্রজাসাধারণের ঘোর কষ্ট যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। প্রজাগণ সর্বদাই এই সংগ্রামানল সম্ভূত দাবাগ্নিতে দগ্ধীভূত হয়। সংসারে আর তাহাদের কোনো সুখ শান্তি থাকে না।

কিন্তু মানব-প্রকৃতি বড়ই আশ্চর্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কষ্ট যন্ত্রণার নাম শুনিয়াই মানুষ ত্রাসিত হয়। এই কষ্ট যন্ত্রণার আশঙ্কাই কেবল মানুষকে কথঞ্চিৎ কষ্ট প্রদান করে। কিন্তু যখন কষ্ট যন্ত্রণা সমুপস্থিত হয়, তখন সে কষ্ট তত কষ্টকর বলিয়া বোধ হয় না, সে যন্ত্রণা তত দুঃখ প্রদান করিতে পারে না। এ সংসার যতই কষ্ট যন্ত্রণার স্থান হউক না কেন, মনুষ্য সকল প্রকার কষ্ট যন্ত্রণা, সকল প্রকার দুরবস্থার সহিত আপন প্রকৃতির সামঞ্জস্য সংস্থাপনে সমর্থ।

এখন শতবর্ষ পরে আমরা মনে করিতেছি অষ্টাদশ শতাব্দীর অরাজকতা নিবন্ধন আমাদিগের পূর্বপুরুষগণ ভয়ানক কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন; জীবন তাঁহাদিগের নিকট অসহনীয় বলিয়া বোধ হইয়াছিল; হয় তো তাঁহারা আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা কেবল মৃত্যুকামনা করিতেন।

কিন্তু এটি আমাদের স্পষ্ট ভ্রম। অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই সংগ্রামানলের মধ্যে অবস্থান করিয়াও আমাদিগের পূর্বপুরুষগণ আমাদিগের ন্যায়ই সচ্ছন্দে আহারবিহার হাস্যপরিহাসে দিনাতিপাত করিতেন। দেশ যেরূপ দুরবস্থাপন্ন হউক না কেন, জনসাধারণ তজ্জন্য কোন দিনও ভ্রূক্ষেপ করে না। সকল অবস্থাতেই তাহারা একভাবে হাঁটে, চলে, খায়। তবে যখন

একেবারে নিজের উপর কোনো বিপদ আসিয়া পড়ে, তখন কিছুকালের নিমিত্ত কষ্টানুভব করিতে থাকে।

কিন্তু সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই সকল দেশে এবং সকল যুগে এক একটি দেশের কোটি কোটি লোকের মধ্যে এমন দুই একজন লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা সংসারের উপর সর্বদাই অসন্তুষ্ট থাকেন। সংসারের সঙ্গে যেন ইঁহাদিগের চিরবিবাদ রহিয়াছে। এ সংসারে ইঁহারা পাপ তাপ দুঃখ কষ্ট অত্যাচার ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না। ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সংসারের সেই পাপ, তাপ, দুঃখ, কষ্ট, অত্যাচারের সঙ্গে আজীবন সংগ্রাম করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিবার পর ভাবী বংশাবলীর নিকট দেশ-সংস্কারক, কিম্বা সমাজ-সংস্কারক, অথবা ধর্ম-সংস্কারক বলিয়া পরিচিত হয়েন। আর কেহ কেহ সংসারের সঙ্গে একেবারে সংস্রব পরিত্যাগপূর্বক বানপ্রস্থ ধর্মাবলম্বন করিয়া, নির্জনে একাকী অরণ্যে বাস করেন। সংসারের লোকের সঙ্গে তাঁহাদিগের কোনো প্রকার সম্বন্ধ থাকে না।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে সংসারবিরাগী যে দুই চারিজন লোক ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই দেশ-সংস্কারক কিম্বা ধর্ম-সংস্কারকের পথাবলম্বন করেন নাই। তাঁহারা সংসারের সঙ্গে সর্বপ্রকার সম্বন্ধ পরিহার-পূর্বক নির্জন অরণ্যে কিম্বা পর্বতে বাস করিয়া, সর্বদা ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। হিমাচলের নিকটবর্তী সুরম্য অরণ্যই তাঁহা-দিগের একমাত্র আবাসভূমি ছিল। ইঁহারা সুদ্ধ কেবল শান্তি লাভাশায় সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতেন। হরিদ্বার প্রভৃতি হিমাচলের নিকটবর্তী তীর্থস্থান ভ্রমণ করিতেন।

হিমাচলের পাদপ্রদেশের যে স্থান হইতে বেগবতী পবিত্রসলিলা-গঙ্গা সমুত্থিত হইয়া ক্রমে পূর্ব-দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে, সেই স্থানটি প্রাচীনকাল হইতেই হরিদ্বার নামে পরিচিত। প্রাচীনকালের লোকেরা হরিদ্বারকে ভগবান কমলাপতির আবাসস্থান বৈকুণ্ঠের দ্বার বলিয়া মনে করিতেন। এই স্থানটি যেরূপ সুরম্য তাহাতে হরিদ্বার বৈকুণ্ঠের দ্বার বলিয়া পুরাতন কবিদিগের সহজেই সংস্কার হইতে পারে।

বিবিধ তরুরাজি-পরিশোভিত হরিদ্বারের উপত্যকা প্রকৃতি-দেবীর বিহার উদ্যান বলিয়া মনে হয়। এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রাচীন

আর্যদিগের হৃদয় কবিত্ব রসে পরিপূর্ণ করিত। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে এখানে গঙ্গার পার্শ্বে বসিয়া মহর্ষিগণ নানা ছন্দে সামবেদ গান করিতেন। সুতরাং হরিদ্বার এখন পরম পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া সর্বত্র পরিচিত রহিয়াছে। সাধু মহাত্মাগণ সর্বদাই এই স্থানে বসিয়া যোগ সাধনায়-নিরত থাকেন।

১৭৭৪ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে, একদিন অপরাহ্নে একটি লোক হরিদ্বারের একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর বসিয়া নিমীলিত নেত্রে ধ্যান করিতেছিলেন। তাঁহার সম্মুখে একটি প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড রহিয়াছে। তাঁহার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু নিপতিত হইতেছে। ইঁহার বয়ঃক্রম ষাট বৎসরের যে অধিক হইয়াছে, তাহার কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু শরীরে এখনও বিলক্ষণ তেজ আছে। সমুদয় শরীর ভস্মাবৃত। পরিধানে একখান কৌপীন। সময়ে সময়ে ইঁহার মুখ হইতে দুই একটি কথা বহির্গত হইতেছে। কিন্তু সে কি কথা তাহা নিকটে না দাঁড়াইলে কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। অনেকক্ষণ পরে তিনি একবার বলিয়া উঠিলেন—

হা পরমেশ্বর! এ জীবন বৃথা গেল।

কিছুকাল আবার নির্বাক থাকিয়া বলিলেন—

শাস্ত্রাধ্যয়ন কেবল অভিমান উৎপাদন করে। শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারাও মানুষ আপনাকে চিনিতে পারে না।

আবার নিমীলিত নেত্রে অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

মানুষমাত্রেই ঈশ্বরের সেনা। এ সংসারের প্রত্যেককেই সৈনিক পুরুষ হইতে হইবে। ঈশ্বর প্রদত্ত প্রকৃতি বিবর্জিত হইয়া বৃথা জীবন যাপন করিতেছি।

বৃথা জীবন যাপন করিতেছি এই কথা বলিবামাত্র পশ্চাৎ হইতে অকস্মাৎ একজন লোক বলিয়া উঠিলেন—

বৃথা জীবন বলিয়াই তো যাহাতে পৃথিবী লোকশূন্য হয় তাহারই উপায় দেখিতেছি।

প্রথমোক্ত ব্যক্তির কর্ণে এই নবাগত দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা প্রবেশ করিল না। তিনি নিমীলিত নেত্রে নিজের চিন্তাতেই নিমগ্ন ছিলেন। স্বপ্নাবস্থায় লোকের মুখ হইতে যদ্রূপ কথা বাহির হয়, সেই প্রকার ইঁহার মুখ হইতে উপরি উক্ত বাক্য সকল বাহির হইতেছিল।

এই দ্বিতীয় লোকটি গঙ্গার অপর পার হইতে নদীর উপর দিয়া হাঁটিয়া আসিয়াছেন। গঙ্গায় বড় অধিক জল ছিল না। পারে উঠিয়া প্রথমোক্ত ব্যক্তি যে পাহাড়ে বসিয়াছিলেন, ধীরে ধীরে সেই পাহাড়ে উঠিয়াছিলেন, এবং প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে 'বৃথা জীবন যাপন করিতেছি' এই কথা বলিতে শুনিয়া, পশ্চাৎ হইতে বিকট হাস্য করিয়া, 'বৃথা জীবন বলিয়াই তো যাহাতে পৃথিবী লোকশূন্য হয় তাহারই উপায় দেখিতেছি', এই কথা বলিয়াছিলেন।

এই নবাগত লোকটির শরীর একেবারে অস্থিচর্মসার হইয়া পড়িয়াছে। এ ব্যক্তিকে হাঁটিতে দেখিলে বোধ হয়, যেন বায়ুর দ্বারা ইহার সমুদয় শরীর পরিচালিত হইতেছে। ইহার আকৃতি মানুষের ন্যায় হইলেও ইহাকে মানুষ বলিয়া বোধ হয় না, মানুষের ছায়ার ন্যায় বোধ হয়। যাহারা ভূতপ্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন তাহারা ইহাকে দেখিবামাত্র নিশ্চয়ই অপদেবতা বলিয়া অবধারণ করিতেন। ক্রমে এই ব্যক্তি প্রথমোক্ত ধ্যানশীল লোকটির নিকট আসিয়া আবার বিকট হাস্য করিয়া বলিল—

ঠাকুর আবার কি চিন্তা করিতেছ? এবার বড় শুভ সংবাদ। যেরূপ যুদ্ধ বাধিয়াছে হয়তো এবার আমাদের বঙ্গদেশেও সংগ্রামানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিবে।

প্রথমোক্ত ব্যক্তির ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চমকিয়া উঠিয়া, এই দ্বিতীয় ব্যক্তির মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি আবার বলিল, ঠাকুর কি ভাবিতেছ? আমার কথাটা বুঝি এখনও তোমার কর্ণে প্রবেশ করে নাই? বড় শুভ সংবাদ। তুমুল সংগ্রাম হইবে। এ যুদ্ধেও কি পৃথিবী লোকশূন্য হইবে না?

প্রথমোক্ত ব্যক্তি এখনও অবাক হইয়া এক দৃষ্টে দ্বিতীয় লোকটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। কিছুকাল পরে অতি মৃদুস্বরে আপনা আপনি বলিলেন—

হা পরমেশ্বর! শোক দুঃখ প্রভৃতি সাংসারিক অবস্থার নিকট মানুষ চিরকালই পরাজিত। জ্ঞানলাভ, শাস্ত্রাধ্যয়ন, কিছুই মানুষকে দুঃখ দারিদ্র্যের বিষময় ফল হইতে নির্মুক্ত রাখিতে পারে না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। ঠাকুর তোমার ও সাংসারিক অবস্থার কথা অনেক

শুনিয়াছি। আমি নিজেও বাল্যকালে অনেক বিষয় অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। আমি বাণেশ্বর ভট্টাচার্য।—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, দ্রাবিড় সর্বত্র আমি পরিচিত ছিলাম। এখন আমার আসল কথা শোন।

এই দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম বাণেশ্বর ভট্টাচার্য, আর প্রথমোক্ত ধ্যানশীল মহাপুরুষের নাম পণ্ডিত শ্রীনিবাস। বাণেশ্বরের জন্মস্থান বঙ্গদেশের অন্তর্গত বিক্রমপুর। ইনি রাজা রাজবল্লভের গুরুবংশোদ্ভব। আর শ্রীনিবাস একজন সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত। প্রায় সাত আট বৎসর হইল কলিকাতায় ইহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রথম আলাপ পরিচয় হয়। পরে শ্রীনিবাস বাণেশ্বরকে সঙ্গে করিয়া উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আনিয়াছিলেন।

শ্রীনিবাস বাণেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কোথা হইতে আসিলে।

বাণেশ্বর। সে কথা পরে বলিব। একটা শুভ সংবাদ আছে তাই আগে শোন।

শ্রীনিবাস। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) কি শুভ সংবাদ।

বাণেশ্বর। বড় যুদ্ধ বাধিয়াছে। যদি মহারাষ্ট্রীয়গণ এ যুদ্ধে রোহিলাদিগের পক্ষাবলম্বন করেন, তবে শতবর্ষেও এ সংগ্রামানল নির্বাপিত হইবে না। এই যুদ্ধ উপলক্ষেই আমার আশা পূর্ণ হইবে। নিশ্চয়ই এবার পৃথিবী লোকশূন্য হইবে।

শ্রীনিবাস। হা হতভাগ্য, এখনও তোমার স্কন্ধে সেই ভূত রহিয়াছে। এত দীর্ঘকাল নানা দেশ এবং নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়াও মনের সাম্যাবস্থা লাভ করিতে সমর্থ হইলে না। বৃথা শাস্ত্রাধ্যয়ন! সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাই মানব-জীবন গঠন করিতেছে।

বাণেশ্বর। ঠাকুর আবার যদি তুমি 'সামাজিক অবস্থা' 'মানব জীবন' ও সকল পণ্ডিতি কথা বল, তবে আমি এখনই চলিয়া যাইব। মহারাষ্ট্রীয়গণ এই যুদ্ধে কোনো পক্ষাবলম্বন করিবেন কি না তাই বল।

শ্রীনিবাস। তাহা আমি কিরূপে বলিব? তুমি কি মহারাষ্ট্র দেশেও গিয়াছিলে?

বাণেশ্বর। আমি কি ঠাকুর আর তোমার মতো একস্থানে বসিয়া থাকি। কখনও মহারাষ্ট্র দেশে, কখনো মহীশূরে, কখনো হায়দ্রাবাদে, কখনো দিল্লীতে, কখনো অযোধ্যায়—এইরূপে নানাদেশ পর্যটন করিয়াছি।

শ্রীনিবাস। কি উদ্দেশ্যে এই পর্যটন? শরীরটা যে একেবারে ক্ষয় করিয়াছ।

বাণেশ্বর। আর কি উদ্দেশ্য আছে? যেখানেই যাই, সেই দেশের রাজপুরুষদিগকে যুদ্ধ করিতে অনুরোধ করি। তাহাদিগকে বলিয়া থাকি, বাছা! যুদ্ধ কর নিশ্চয়ই তোমার রাজ্য বৃদ্ধি হইবে। তাহারা তখন আমার কথা শুনিয়া হাস্য করে। আমাকে পাগল বলিয়া উপহাস করে। কিন্তু অবশেষে আবার আমার উপদেশানুসারেই কার্য করে। এই বারো, তেরো বৎসরের মধ্যে কত স্থানে কত যুদ্ধ হইল দেখিতেছ না?

শ্রীনিবাস। তুমি কি মনে কর, যে ভিন্ন ভিন্ন রাজগণ তোমার উপদেশানুসারেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছেন?

বাণেশ্বর। আমার উপদেশানুসারেই হউক, কি অন্য কোনো কারণেই হউক, তাহাতে আমার কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমার উদ্দেশ্য সাধন হইলেই হইল। পৃথিবী মনুষ্যশূন্য হইলেই আমার আশা পূর্ণ হয়।

শ্রীনিবাস। পৃথিবী মনুষ্যশূন্য হইলে তোমার কি লাভ হইবে?

বাণেশ্বর। তাহা হইলেই সংসারের সকলের দুঃখকষ্ট একেবারে দূর হইবে। একজন মরিবে আর একজন বাঁচিয়া থাকিবে সে ভাল নহে। সমস্ত পৃথিবী একেবারে বিনষ্ট হইলেই ভাল। তাহা হইলে কাহারও মনে কোনো দুঃখ থাকে না।

শ্রীনিবাস। সমস্ত পৃথিবীর লোক কি তোমার নিকট কোনো অপরাধ করিয়াছে, যে তুমি তাহাদিগের অমঙ্গল কামনা করিতেছে?

বাণেশ্বর। মানুষের মতো হিংস্র জন্তু তো আর নাই। বাঘ ভালুক কোনো জন্তুই মানুষের ন্যায় এত নিষ্ঠুর নহে। সর্পের মধ্যেও কৃতজ্ঞতা থাকিতে পারে, কিন্তু মানুষের মধ্যে তাহাও নাই।

শ্রীনিবাস। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) মানুষ ঈশ্বর প্রদত্ত প্রকৃতি সংরক্ষণ করিতে পারিলে দেব-জীবন লাভ করিতে পারে। বর্তমান সমাজ-প্রচলিত পাপ এবং কুসংস্কারই জনসাধারণকে এইরূপ জঘন্য করিয়া তুলিয়াছে।

বাণেশ্বর। মানুষ দেবতা হইতে পারে, একথা অনেক দিন হইতে শুনিতেছি। কিন্তু একটা মানুষকেও দেবতা হইতে দেখা গেল না। আমি এখন নিশ্চয় বুঝিয়াছি, মানুষের ন্যায় বদ্ জানোয়ার আর নাই।

ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তু অপেক্ষা মানুষ শতগুণে নিষ্ঠুর। তাই আমি ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজগণ মধ্যে বিরোধ বাধাইয়া দিয়া, পৃথিবী মনুষ্যশূন্য করিবার চেষ্টা করিতেছি।

শ্রীনিবাস। তুমি একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়াছ। এই যে রাজগণ পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে, ইহারা কি তোমার উপদেশানুসারে যুদ্ধ করে? কেন তুমি দেশে দেশে উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছ? তুমি কিছুকাল পর্যন্ত আমার নিকট থাক, আমি তোমার স্কন্ধের ভূত ছাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিব।

বাণেশ্বর। আমি একক্রমে একদণ্ডও একস্থানে তিষ্ঠিতে পারি না। দুই চারি মুহূর্ত একস্থানে বসিলেই আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠে। তৎক্ষণাৎ আবার স্থানান্তরে যাইতে ইচ্ছা হয়। এই জন্যই লোকে বলে যে আমার স্কন্ধে ভূত চাপিয়াছে।

শ্রীনিবাস। আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে তোমাকে ভূতে পাইয়াছে। ভূত আর কিছুই নহে। মানুষ যখন কোনো একটা বিশেষ মানসিক ভাব দ্বারাই কেবল পরিচালিত হয়, অন্য আর কোনো বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পাবে না, তখনই তাহাকে ভূতে পায়। পৃথিবী লোকশূন্য হউক, এই চিন্তাই তোমার অন্তর অধিকার করিয়া রহিয়াছে। অন্য কোনো বিষয়ে কি অন্য কোনো কথায় তুমি মনোযোগ প্রদান করিতে পার না। একস্থানে একদণ্ড বসিয়া বিশ্রাম করিতে পার না সুতরাং লোকে মনে করে যে, তোমাকে ভূতে পাইয়াছে।

বাণেশ্বর। তবে ঠাকুর এখন বিদায় হই। আমি আর অধিকক্ষণ বসিতে পারিতেছি না।

শ্রীনিবাস। আর একটু অপেক্ষা কর। আর দুই একটা কথা তোমার নিকট জিজ্ঞাসা করিব।

বাণেশ্বর। যাহা হয় ঠাকুর শীঘ্র শীঘ্র বল। আমি আর বিলম্ব করিতে পারি না।

শ্রীনিবাস—এখন কোথায় যাইবে?

বাণেশ্বর—রোহিলখণ্ডে।

শ্রীনিবাস—রোহিলখণ্ডে কি প্রয়োজন?

বাণেশ্বর—সেখানেই তো যুদ্ধ হইবে।

শ্রীনিবাস—কাহার সঙ্গে রোহিলাদের যুদ্ধ হইবে ?

বাণেশ্বর—উজীর সুজাউদ্দৌলা এবং ইংরাজগণ এক পক্ষ, আর রোহিলাগণ অপর পক্ষ।

বাণেশ্বরের এই কথা শুনিয়া শ্রীনিবাস অত্যন্ত আক্ষেপের সহিত বলিতে লাগিলেন—'হা পরমেশ্বর, দেশের কি দুরবস্থাই হইল! একটা নবাব কি রাজা আপন রাজ্য সুশাসন করিবার চেষ্টা করে না, বা প্রজার দুঃখ নিবারণ করিতে যত্ন করে না। সকলেই কেবল পররাজ্য অপহরণের চেষ্টা করিতেছে। ইহাদিগের প্রত্যেককেই চরমে আপন আপন কর্তব্য উল্লঙ্ঘনের বিষময় ফল ভোগ করিতে হইবে। ইহাদের কাহারও রাজ্যপদ চিরস্থায়ী হইবে না।'

শ্রীনিবাসের বাক্যাবসানে বাণেশ্বর বিকট হাস্য করিয়া উঠিলেন—

কি ঠাকুর এখন তো আমার মতেই আসিতে হইল। আমি তো পূর্ব হইতেই বলিতেছি যে, মানুষ বড় পাজি জানোয়ার। এমন বদ্‌ জানোয়ার আর কোথাও নাই। এক একটা নবাব কিম্বা এক একটা রাজার ঘরে দুই তিন শত পত্নী রহিয়াছে। কিন্তু তত্রাচ সুযোগ পাইলেই পরস্ত্রী হরণ করিতে ত্রুটি করে না। এক একটা নবাব কিম্বা রাজার ঘরে কোটি কোটি টাকা রহিয়াছে, তাহার সুবিস্তীর্ণ রাজ্য রহিয়াছে, কিন্তু তত্রাচ পররাজ্য এবং পরধন অপহরণ করিবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারে না। অন্যান্য কোনো হিংস্র জন্তু এইরূপ করে না। ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু সকল আপন আপন ক্ষুন্নিবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত জীব হত্যা করে। ব্যাঘ্র যখন একটা জীব হত্যা করিয়া তাহার মৃত শরীর সম্মুখে লইয়া বসে, তখন আর অপর কোনো জীবজন্তুকে আক্রমণ করে না। কিন্তু মানুষের প্রয়োজন না থাকিলেও সে অনায়াসে দশটা নরহত্যা করিতে পারে। শাস্ত্রে যাহাই লিখিত থাকুক না কেন, মানুষ যে সর্বাপেক্ষা অধিক নিষ্ঠুর জন্তু তাহার কোনো সন্দেহ নাই।

শ্রীনিবাস ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—কার অবস্থানুসারে তাহাই হইয়া পড়িয়াছে!

বাণেশ্বর। তাহা না হইলে এ দুর্দশা কিরূপে হইল?

শ্রীনিবাস। ভাই নিজের দুরবস্থার নিমিত্ত অপরকে কখনও দোষ দিবে না। তোমার আমার দুরবস্থা আমাদের কর্তব্য উল্লঙ্ঘনের অবশ্যম্ভাবী ফল।

এ সংসারে কর্তব্য উল্লঙ্ঘন না করিলে, ন্যায় ও সত্যের পথ হইতে ভ্রষ্ট না হইলে, কাহাকেও কখনও কোনো দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হয় না।

বাণেশ্বর। ঠাকুর ও সকল কর্তব্যের কথা শুনিতে আমার ইচ্ছা হয় না। এখন চলিলাম। আর তিষ্ঠিতে পারি না। (বিকট হাস্য করিয়া) কাঁধের ভূত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীনিবাস। রোহিলখণ্ডে যাইয়া তোমার কি লাভ হইবে?

বাণেশ্বর। এ যুদ্ধে কত জন লোক বিনষ্ট হয়, তাহার একটা হিসাব রাখিতে হইবে। তাহা না হইলে আর ঠিক করিতে পারি না, যে কত বৎসরে পৃথিবী লোকশূন্য হইবে। এদিকে আমারও পরমায়ু শেষ হইয়া আসিতেছে। কাঁধে এই ভূত আছে বলিয়া এখনও হাঁটিতে চলিতে পারি। কিন্তু এ ভূত না থাকিলে একেবারেই চলৎশক্তিহীন হইয়া পড়িতাম।

শ্রীনিবাস। তোমার শরীর যে একেবারে ক্ষয় হইয়াছে, তাহা যে তুমি নিজে বুঝিতে পার, তাহাই আমি মনে করিতাম না।

বাণেশ্বর। (বিকট হাস্য করিয়া) ঠাকুর আমি সকলই বুঝিতে পারি। আমি বাণেশ্বর তর্কপঞ্চানন। ন্যায়, দর্শন, সকল শাস্ত্রই অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন—

এই বলিয়াই বুকে করাঘাত পূর্বক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—হা স্ত্রী পুত্র কন্যা এ বুকের মধ্যে সর্বদাই আগুন জ্বলিতেছে।

ইহার পর বাণেশ্বর উঠিয়া দ্রুতপদসঞ্চারে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। শ্রীনিবাস গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিলেন,—

তুমি গমনোন্মুখ হইলে তোমাকে কেহ বাঁধিয়াও রাখিতে পারে না। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ রাখিবে।

বাণেশ্বর। কি অনুরোধ?

শ্রীনিবাস। দুই এক মাসের মধ্যে আমার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিবে।

রোহিলা যুদ্ধ শেষ হইলেই তোমার এই স্থানে প্রত্যাবর্তন করিব। এই বলিয়া বাণেশ্বর দুই চারি মিনিটের মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রোহিলখণ্ড

অযোধ্যা এবং কুমায়ুন পর্বতের মধ্যস্থিত গঙ্গানদীর পূর্ব পার্শ্ববর্তী যে সুবিস্তীর্ণ ভূমি খণ্ড পূর্বে কুতাহার নামে পরিচিত ছিল, তাহাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে রোহিলাশ্রেষ্ঠ আলি মহম্মদের প্রাধান্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে রোহিলখণ্ড নামে অভিহিত হইল। রোহিলখণ্ড অযোধ্যার সংলগ্ন রাজ্য। উজীর সবদর জঙ্গের সময় হইতেই অযোধ্যার নবাবদিগের রোহিলখণ্ড অধিকার করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু সংগ্রামপ্রিয় রোহিলাদিগকে পরাস্ত করিবার সাধ্য নাই। সুতরাং এ পর্যন্ত উজীর নির্বাক ছিলেন।

এই উপন্যাসের লিখিত ঘটনার সময় সবদর জঙ্গের পুত্র উজীর সুজাউদ্দৌলা অযোধ্যার নবাব ছিলেন। উজীর কামের উদ্দিনের মৃত্যুর পর অযোধ্যার নবাব সবদর জঙ্গ দিল্লীর বাদশাহের উজীরের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার সময় হইতে অযোধ্যার নবাবগণ পুরুষ পরম্পরায় উজীর উপাধি ধারণ করিতেন।

উজীর সুজাউদ্দৌলা রোহিলখণ্ড স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে ইংরাজদিগের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। ইংরাজগণ অর্থলোভে তাঁহাকে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। ১৭৭৪ খ্রীঃ অব্দের প্রারম্ভে ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল চ্যাম্পিয়ন সসৈন্যে অযোধ্যায় আসিয়া রোহিলখণ্ড আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

এদিকে অশীতিবর্ষ বয়স্ক রোহিলাশ্রেষ্ঠ হাফেজ রহমত খাঁ স্বদেশ রক্ষার্থ সৈন্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এবার রোহিলাদিগের ঘোর বিপদাশঙ্কা রহিয়াছে। অযোধ্যার সুবাদারের সমুদয় সৈন্য ইংরাজ-সৈন্যগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিবে। এই সম্মিলিত সৈন্যের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা সহজ ব্যাপার নহে। বিশেষতঃ ইতিপূর্বে রোহিলাদিগের পরস্পরের মধ্যে একটু গৃহবিচ্ছেদ হইয়াছিল বলিয়া, উপযুক্ত সময় থাকিতে সৈন্য সংগ্রহ করা হয় নাই। গৃহবিচ্ছেদই রাজ্যবিনাশের একমাত্র মূল কারণ। আবার ব্যক্তিবিশেষের একাধিপত্যের ইচ্ছাই সর্বদা গৃহবিচ্ছেদ আনয়ন করে।

যে কারণে রোহিলাদিগের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ হইয়াছিল, এবং যে পাপে রোহিলারাজ্য বিনষ্ট হইল, তৎসমুদয় সংক্ষেপে এই স্থানে বিবৃত না করিলে এই উপন্যাসের লিখিত ঘটনা পাঠকগণ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। অতএব এই অধ্যায়ে সেই সকল ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

১৬৭৩ খ্রীস্টাব্দে শাহ আলম এবং হোসেন খাঁ নামক দুই ভ্রাতা কুতাহারে (বর্তমান রোহিলখণ্ডে) বাস করিতেন। ইহারা আফগান দেশীয় লোক ছিলেন। সময়ে সময়ে ইহারা দুই ভাই মোগল সম্রাটদিগের অধীন সৈনিক পুরুষের কার্যে নিযুক্ত হইতেন। ইহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শাহ আলমের দুই পুত্র ছিল ; জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম দাউদ খাঁ ও কনিষ্ঠের নাম হাফেজ রহমত খাঁ। দাউদ খাঁ কুমায়ুনের রাজার সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়া স্বীয় প্রভুর অনেক উপকার সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রভু তাঁহাকে যথোপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিলেন না। সুতরাং তিনি পদ পরিত্যাগের সংকল্প করিলেন। রাজা তাঁহার পদত্যাগের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তাঁহার হস্তপদ কর্তন করিলেন। ইহাতে দাউদ খাঁর প্রাণ বিনষ্ট হইল। দাউদ খাঁর কনিষ্ঠ পুত্র আলি মহম্মদ পিতার ন্যায় সংগ্রামপ্রিয় ছিলেন। তিনি একদিন না একদিন পিতৃবৈর নির্যাতন করিবেন বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়া রাখিলেন।

পিতৃবিয়োগের পর আলি মহম্মদ মোরাদাবাদের ফৌজদার আজমৎউল্লা খাঁর অধীনে একজন সৈনিক পুরুষের কার্যে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু আজমৎউল্লার পদচ্যুতির পর আলি মহম্মদ অল্প সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মোরাদাবাদের নিকটবর্তী সমুদয় ভূমি অধিকার করিলেন। ক্রমে তাঁহার সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আপন অধিকারও বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

মোরাদাবাদের নিকট দিল্লীর বাদশাহের মীরবক্সী (Paymaster General) উমদাৎ মুলকের অনেক জায়গীর ছিল। উমদাৎ মুলক লোক পরম্পরায় শ্রবণ করিলেন যে আলি মহম্মদ তাঁহার জায়গীরের অন্তর্গত কতক ভূমি অধিকার করিয়াছেন। তিনি আলি মহম্মদকে দণ্ডপ্রদান করিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে একজন সেনাপতিকে মোরাদাবাদে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার প্রেরিত সেনাপতি মোরাদাবাদে পৌঁছিয়া

আলি মহম্মদের সহিত বিবাদ আরম্ভ করিল। আলি মহম্মদ যুদ্ধ করিয়া সসৈন্যে সেনাপতিকে একেবারে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন।

আপন প্রেরিত সেনাপতির মৃত্যু সংবাদে উমদাৎ মুলক যারপরনাই কোপাবিষ্ট হইয়া রাজবিদ্রোহীস্বরূপ আলি মহম্মদকে দণ্ডবিধান করিবার নিমিত্ত দিল্লীর বাদশাহকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু দিল্লীর বাদশাহের কর্মচারিগণের মধ্যে পরস্পরের সহিত বিশেষ শত্রুতা ছিল। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে হিংসা করিতেন, প্রত্যেকেই অপরের অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেন। বাদশাহের উজীর কামিরউদ্দীন আলি মহম্মদকে ধৃত করিবার নিমিত্ত সৈন্য প্রেরিণ করিতে উদ্যত দেখিয়া, অতি বিনীতভাবে বাদশাহকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—ধর্মাবতার এই গোলামের একটা কথা শুনিয়া যাহা হয় করুন। আলি মহম্মদ মন্দ লোক নহেন। মীর বক্সী উমদাৎ মূলকের প্রেরিত সেনাপতি তাঁহার উপর অত্যাচার করিয়াছিল। তাহাতে সে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাস্ত করিয়াছে। ন্যায়ানুসারে ইহাতে সে দণ্ডার্হ হইতে পারে না।

বাদশাহ উজীরের কথা শুনিয়া আর সৈন্য প্রেরণ করিলেন না। এদিকে আলি মহম্মদ মীরবক্সী উমদাৎ মূলকের সমুদয় জায়গীর অধিকার করিলেন।

ইহার পর সায়দউদ্দীন নামক একজন রাজবিদ্রোহীকে ধৃত করিবার নিমিত্ত দিল্লীর বাদাশাহ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। উজীর কামিরউদ্দীন আলি মহম্মদকে বাদশাহের প্রেরিত সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া এই রাজবিদ্রোহীকে ধৃত করিবার নিমিত্ত লিখিলেন।

আলি মহম্মদ এই পত্র পাইয়া বিশেষ আগ্রহের সহিত বাদশাহের প্রেরিত সৈন্যের সঙ্গে মিলিত হইয়া সায়দউদ্দীনকে ধৃত করিলেন। বাদশাহ আলি মহম্মদের রাজভক্তি দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নবাব উপাধি প্রদান করিলেন, এবং তৎসঙ্গে অনেক ভূমিও দান করিলেন।

কিন্তু দিন দিন আলি মহম্মদের ক্ষমতা ও যশ বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া, উজীর কামিরউদ্দীনের মনে নানা প্রকার আশঙ্কার উদয় হইতে লাগিল। তিনি তখন আপন বিশ্বাসী লোক রাজা হরানন্দকে মোরাদাবাদের ফৌজদারের পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন, এবং তাঁহাকে আলি মহম্মদের কার্যকলাপ সর্বদা পর্যবেক্ষণ করিতে বলিলেন।

রাজা হরানন্দ মোরাদাবাদে পৌঁছিয়াই আলি মহম্মদের নিকট দিল্লীর বাদশাহের প্রাপ্য রাজস্ব তলব করিতে লাগিলেন। ইহাতে ক্রমে ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল। অবশেষে আলি মহম্মদ সংগ্রামে হরানন্দকে পরাস্ত করিলেন। এই যুদ্ধে হরানন্দের প্রাণবিয়োগ হইল।

রাজা হরানন্দ উজ্জীর কামিরউদ্দীনের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইহার মৃত্যুর কথা শ্রবণ করিয়া তিনি অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইলেন এবং অনতিবিলম্বে স্বীয় পুত্র মীর মন্নুকে সৈন্য-সামন্ত সহ আলি মহম্মদকে ধৃত করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন।

মীর মন্নু সৈন্য-সামন্ত সহ মোরাদাবাদে আসিয়া পৌঁছিলেন। কিন্তু সহসা আলি মহম্মদকে আক্রমণ করিতে তাঁহার সাহস হইল না। আলি মহম্মদও তাঁহাকে সহসা আক্রমণ করিলেন না। উভয় পক্ষের সৈন্য পরস্পর হইতে কিছুদূরে অবস্থান করিতে লাগিল। অবশেষে আলি মহম্মদের যত্নে উভয়ের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপিত হইল। আলি মহম্মদ বিবিধ যৌতুকসহ নিজের একটি কন্যাকে উজ্জীর কামিরউদ্দীনের এক পুত্রের সহিত বিবাহ দিলেন।

উজ্জীর কামিরউদ্দীনের সহিত আলি মহম্মদের এই প্রকার আত্মীয়তা হইলে পর তাঁহার ক্ষমতা এবং অধিকার আরও দৃঢ়ীভূত হইল। আলি মহম্মদ আফগান প্রদেশস্থ রোহিলা সম্প্রদায়ের লোক। সুতরাং এখন তিনি তাঁহার এই নব উপার্জিত রাজ্য রোহিলখণ্ড নামে অভিহিত করিলেন, এবং রোহিল-খণ্ডের নবাব বলিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে রোহিলখণ্ডে আলি মহম্মদের রাজত্ব দৃঢ়ীভূত হইবার পর তিনি পিতৃবৈরী কুমায়ুনের রাজাকে দণ্ড বিধান করিবার নিমিত্ত সসৈন্যে কুমায়ুন প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। রাজা তাঁহার আগমন বার্তা শ্রবণ করিয়া সপরিবারে রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। আলি মহম্মদ বিনা যুদ্ধে রাজার প্রাসাদে প্রবেশপূর্ব্বক রাজার ধন সম্পত্তি লুণ্ঠন করিলেন।

কুমায়ুন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে আলি মহম্মদের সৈন্যদিগের সহিত অযোধ্যার নবাব সবদর জঙ্গের লোকের বিবাদ হইল। সবদর জঙ্গের লোকেরা কুমায়ুনের নিকটবর্ত্তী স্থানে শাল বৃক্ষ কর্ত্তন করিতেছিল। ইহাদিগের সহিত বিবাদ হইলে আলি মহম্মদের লোকেরা ইহাদিগকে তাড়া-ইয়া দিয়া ইহাদিগের সংগৃহীত সমুদয় শাল বৃক্ষ আত্মসাৎ করিল।

নবাব সবদর জঙ্গ আলি মহম্মদের এই অন্যায় ব্যবহারের কথা শ্রবণ

করিয়া দিল্লীর বাদশাহের নিকট অভিযোগ করিলেন, এবং রাজবিদ্রোহী স্বরূপ আলি মহম্মদের প্রাণদণ্ড করিবার নিমিত্ত বাদশাহকে অনুরোধ করিলেন। সবদর জঙ্গের প্রতি বাদশাহের বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। তিনি সবদরের অনুরোধে আলি মহম্মদের প্রাণদণ্ড করিবার অভিপ্রায়ে সবদরকে সঙ্গে করিয়া সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। উজীর কামিরউদ্দীন এবার আর আলি মহম্মদকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না।

কিন্তু আলি মহম্মদ অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক। তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন যে, দিল্লীর বাদশাহ এবং অযোধ্যার নবাব এতদুভয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভের আশা নাই। সুতরাং তিনি ইহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন না। দিল্লীর বাদশাহের শরণাগত হইলেন। বাদশাহ সন্তুষ্ট হইয়া, তাহার প্রাণবিনাশের অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু বন্দীস্বরূপ দিল্লীতে লইয়া গেলেন।

সবদর জঙ্গ মনে মনে আশা করিয়াছিলেন যে বাদশাহ আলি মহম্মদের প্রাণবিনাশ করিলেই রোহিলখণ্ড তিনি অধিকার করিবেন। কিন্তু তাহার সে আশা বিফল হইল।

বাদশাহ আলি মহম্মদকে ধৃত করিবার পর রোহিলখণ্ডের নিকট গঙ্গার পশ্চিম পার্শ্বে অনেক সৈন্য রাখিয়া গেলেন। রোহিলা সৈন্যগণ গঙ্গা পার হইয়া আলি মহম্মদের উদ্ধারার্থ দিল্লীতে না যাইতে পারে, সেই অভিপ্রায়েই সৈন্যগণ গঙ্গার পার্শ্বে ছাউনি করিয়া রহিল। কিন্তু আলি মহম্মদের প্রতি রোহিলা সৈন্যদিগের প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। তাহারা অনেকদূর দক্ষিণে সরিয়া যাইয়া গঙ্গা পার হইল; এবং আলি মহম্মদের উদ্ধারার্থ দিল্লীতে প্রবেশপূর্বক রাজপ্রাসাদের নিকটবর্তী কোনো এক উদ্যানে রাত্রি অবসান করিল। পরদিন প্রাতে রাজপ্রাসাদের দ্বারে যাইয়া বলিল, যে আলি মহম্মদকে কারামুক্ত করিয়া না দিলে তাহারা রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠন করিবে।

ইহাদিগের ঈদৃশ বীরত্ব দর্শনে উজীর কামিরউদ্দীন এবং স্বয়ং বাদশাহ অত্যন্ত ভীত হইলেন। অনেক বাদানুবাদের পর ইহাদিগের সহিত এই রূপ বন্দোবস্ত হইল যে, আলি মহম্মদ স্বীয় পুত্র ফায়েজউল্লা খাঁ এবং আবদুল্লা খাঁকে প্রতিভূ স্বরূপ দিল্লীতে রাখিলে কারামুক্ত হইতে পারিবেন। কিন্তু কারামুক্ত হইলেও তিনি সম্প্রতি রোহিলখণ্ডে যাইতে পারিবেন না।

বাদশাহের অধীনে সারহিন্দের রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত হইয়া তথায় অবস্থান করিবেন। উভয় পক্ষ ইহাতে সম্মত হইলেন। আলি মহম্মদ স্বীয় পুত্র ফায়েজুল্লা খাঁ এবং আবদুল্লাকে দিল্লীতে প্রতিভূ স্বরূপ রাখিয়া সারহিন্দে গমন করিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ রোহিলখণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

আলি মহম্মদ সারহিন্দে পৌঁছিবার কিছুকাল পরেই অর্থাৎ ১৭৪৪ খৃঃ অব্দে আহম্মদ সা আবদালি কর্তৃক দেশ আক্রান্ত হইল। উজীর কামের-উদ্দীন স্বীয় পুত্র মীরমন্নু এবং আলি মহম্মদের পুত্র ফায়েজুল্লা এবং আবদুল্লাকে সঙ্গে করিয়া আবদালির সঙ্গে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত লাহোর যাত্রা করিলেন। লাহোর পৌঁছিবার অব্যবহিত পরে অকস্মাৎ কামেরউদ্দীনের মৃত্যু হইল। তাঁহার পুত্রগণ এবং ফায়েজুল্লা প্রভৃতি এই মৃত্যু ঘটনা গোপন করিয়া আবদালির সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এক ক্রমে তিনবার আবদালি পরাস্ত হইল। কিন্তু শেষবারে আবদালির জয়লাভ হইল। তখন মীরমন্নু এবং আলি মহম্মদ প্রভৃতি আবদালিকে অনেক ধনরত্ন দিয়া এই দেশ ছাড়িয়া যাইতে সম্মত করাইলেন। আবদালি অসংখ্য ধনরত্ন এবং আলি মহম্মদের পুত্র আবদুল্লা ও ফায়েজুল্লাকে প্রতিভূ স্বরূপ সঙ্গে লইয়া কান্দাহারে প্রত্যাবর্তন করেন।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরে আলি মহম্মদ সারহিন্দ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় রাজ্য রোহিলখণ্ডে প্রত্যাবর্তন পূর্বক রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রম নিবন্ধন তাঁহার শরীর রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি আপন মৃত্যু নিকট অনুভব করিয়া স্বীয় বাহুবলে-উপার্জ্জিত-রাজ্য কিরূপে রক্ষা হইবে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

আলি মহম্মদের যে কেবল সংগ্রামে পারদর্শিতা ছিল তাহা নহে। রাজনীতি সম্বন্ধেও তিনি বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা এবং দূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

তিনি মনে করিলেন যে তাঁহার পুত্রগণের হস্তে রাজ্য শাসনের সমুদয় ভার অর্পণ করিলে তাহাদের অদূরদর্শিতা নিবন্ধন রাজ্যের অন্যান্য প্রধান লোকেরা রাজবিদ্রোহী হইয়া উঠিতে পারে। কিম্বা রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকেরা কোনো এক পুত্রের পক্ষাবলম্বন পূর্বক অপর পুত্রদিগের সঙ্গে বিবাদ ঘটাইয়া দিতে পারে। অতএব ভবিষ্যতে ঈদৃশ কোনো দুর্ঘটনা না ঘটিতে পারে এই অভিপ্রায়ে তিনি এক প্রকার প্রতিনিধি-শাসন-তন্ত্র

(Representative Government) সংস্থাপনের অভিপ্রায় করিলেন। রাজ্যের প্রত্যেক প্রধান লোক এবং সৈন্যাধ্যক্ষের হাতে রাজ্যশাসন সম্বন্ধীয় একটা না একটা কার্যের ভার অর্পণ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। তিনি মনে করিলেন, যে, রাজ্যের প্রত্যেক লোকের হাতে শাসনসম্বন্ধীয় একটা না একটা কার্যের ভার থাকিলে রাজবিপ্লব হইবার কোনো সম্ভাবনা থাকিবে না। যদি ইহাদের পরস্পরের মধ্যে দ্বেষ হিংসার ভাব উপস্থিত হয়, তবে একজন অপরের পদলাভ করিবার চেষ্টা করিবে; কিন্তু সমূলে রাজ্য নষ্ট করিবার চেষ্টা কেহই করিবে না।

এইরূপ চিন্তা করিয়া, আপন পুত্রদিগের মধ্যে সমুদয় রাজ্য বিভাগ করিলেন। তাঁহার পুত্রদিগের মধ্যে আবদুল্লা এবং ফায়েজুল্লা প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা এখনও কান্দাহারে প্রতিভূ স্বরূপ অবস্থান করিতেছেন। সাদুল্লা খাঁ, মহম্মদ ইয়ার খাঁ, মূর্তজ খাঁ, এবং আল্লা ইয়ার খাঁ, ইহারা চারিজন নাবালক। আলি মহম্মদ স্বীয় পিতৃব্য হাফেজ রহমত খাঁকে এই নাবালক চারি পুত্রের অভিভাবক নিযুক্ত করিলেন, এবং মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে দেশের সমুদয় প্রধান প্রধান লোকদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া, প্রত্যেকের হস্তে রাজ্যশাসনের একটা না একটা ভার প্রদান করিলেন।

হাফেজ রহমত খাঁর সঙ্গে একত্রে দুন্দি খাঁকেও পুত্রদিগের অভিভাবক স্বরূপ নিযুক্ত করিলেন এবং এতদ্ভিন্ন সৈন্যাধ্যক্ষের কার্যের ভারও তাঁহারই হস্তে অর্পণ করিলেন। নিয়ামত খাঁ এবং শিলাবৎ খাঁর হস্তে আয়ব্যয় পর্যবেক্ষণের ভার এবং ফতে খাঁর হস্তে গৃহ রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করিলেন। সবদর খাঁকে বক্শীর পদে নিযুক্ত করিলেন।

কিন্তু এই বন্দোবস্ত অনুসারে হাফেজ রহমত খাঁই সর্বপ্রধান রাজ প্রতিনিধির পদ প্রাপ্ত হইলেন। হাফেজ ধার্মিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। দেশের সকলেই তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন।

আলি মহম্মদের মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর বিশেষ সুশৃঙ্খলার সহিত রোহিলখণ্ড শাসিত হইতে লাগিল। প্রজাগণ পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিল। কৃষি বাণিজ্যাদিরও বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইল।

কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থপরতা, বিশ্বাসঘাতকতা, এবং একাধিপত্য করিবার ইচ্ছা সর্বদাই সংসারে দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা আনয়ন করিতেছে। মানুষ স্বার্থপরতা বিবর্জিত না হইলে এ সংসারের দুঃখ যন্ত্রণা কখনও নিরাকৃত

হইবে না। হাফেজ রহমত খাঁর স্বার্থপরতাই সুখশান্তি পরিপূর্ণ রোহিলা রাজ্য বিনাশের বীজ বপন করিল। হাফেজ রহমত খাঁ সময়ে সময়ে অবৈধ রূপে শাসন কার্য সম্বন্ধীয় সর্বপ্রকার ক্ষমতা সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। দেশীয় অন্যান্য প্রধান প্রধান লোক ইহাতে হাফেজের প্রতি ক্রমেঅসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন।

কয়েক বৎসর পরে আলি মহম্মদের জ্যেষ্ঠপুত্রদ্বয় আবদুল্লা খাঁ এবং ফায়েজউল্লা খাঁ কান্দাহার হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু হাফেজ ইহাদিগকেও রাজ্যশাসনের সম্পূর্ণ অধিকার প্রদান করিলেন না। অধিকন্তু আলি মহম্মদের উইলানুসারে ইহাদিগের প্রাপ্য সম্পত্তি বণ্টন করিয়া দিবার সময় হাফেজ ইহাদিগের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগের প্রতি পক্ষপাত করিলেন।

হাফেজ রহমত খাঁর প্রতি দিন দিন রোহিলাগণের বিশ্বাস ও ভক্তি হ্রাস হইতে লাগিল। সুতরাং হাফেজের অবিমৃষ্যকারিতাই রোহিলাদিগের জাতীয় একতার মূলে কুঠারাঘাত করিল।

এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণ কর্তৃক ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ আক্রান্ত হইতেছিল। হাফেজ রহমত খাঁ শুনিতে পাইলেন, যে অনতিবিলম্বে মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি রোহিলখণ্ড আক্রমণ করিবেন। এ সংবাদ শ্রবণে তিনি অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন। আপনাকে অনন্যোপায় মনে করিয়া স্বদেশ রক্ষার্থ অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে এইরূপ সন্ধি হইল—রোহিলাদেশ মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা স্বীয় সৈন্য প্রদান করিয়া তাহাদের সাহায্য করিবেন। রোহিলাগণ এই সাহায্যের বিনিময়ে তাঁহাকে চল্লিশ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন। এই সন্ধি সংস্থাপনই রোহিলারাজ্য বিনাশের দ্বিতীয় কারণ। শত্রুর হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করিতে হইলে, কিম্বা দেশের অত্যাচারী রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে হইলে দেশীয় লোকের বলবীর্য্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে। বিদেশীয় রাজার সাহায্য গ্রহণ করিয়া কেবল স্বীয় দুর্বলতার পরিচয়ই প্রদান করা হয়।

এই সন্ধি সংস্থাপনের পর মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি রোহিলাপ্রদেশ আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার রোহিলা প্রদেশে প্রবেশ করিবার পূর্বেই বর্ষাকাল সমুপস্থিত হইল। মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণ গঙ্গা পার হইয়া রোহিলখণ্ড আক্রমণ করিতে অসমর্থ হইলেন। সুতরাং সে বৎসর

তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সুজাউদ্দৌলাকে আর সৈন্য দ্বারা রোহিলাদিগের সাহায্য করিতে হইল না।

কিন্তু সুজাউদ্দোলা অত্রাচ হাফেজ রহমতের অঙ্গীকৃত চল্লিশ লক্ষ টাকা দাবী করিলেন। হাফেজ টাকা দিতে একেবারে অসম্মত হইলেন না; সময়ান্তরে টাকা দিবার ভান করিয়া কালবিলম্ব করিতে লাগিলেন। এদিকে রোহিলখণ্ডের অন্যান্য প্রধান প্রধান লোক এই টাকার অংশ দিতে একবারে অস্বীকার করিলেন।

সুজাউদ্দৌলা দুই বৎসরের মধ্যেও তাহার দাবীকৃত টাকা পাইলেন না— তখন তিনি মনে মনে দুরভিসন্ধি করিলেন যে, রোহিলাগণ তাহাদের অঙ্গীকৃত টাকা প্রদান করিয়া, সন্ধির নিয়ম প্রতিপালন করেন নাই বলিয়া তাহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন; যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া, তাহাদের রাজ্য একবারে আত্মসাৎ করিবেন।

সুজাউদ্দৌলা রোহিলারাজ্য অধিকার করিবার নিমিত্ত পূর্ব হইতেই সচেষ্ট ছিলেন। বর্তমান ঘটনা তাঁহার সেই পূর্বাভিপ্রায় সাধনে উৎকৃষ্ট সুযোগ প্রদান করিল। কিন্তু অপরের সাহায্য ভিন্ন নিজের বাহুবলে রোহিলারাজ্য অধিকার করিবার সাধ্য তাঁহার ছিল না। সুতরাং তিনি কলিকাতাস্থ ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি ইংরাজদিগের তদানীন্তন গবর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে ইংরাজগণ তাঁহাদের সৈন্য প্রেরণ করিয়া রোহিলারাজ্য বিনাশার্থ তাঁহার সাহায্য করিলে তিনি সৈন্যদিগের ব্যয়নির্বাহার্থ মাসিক দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা দিবেন; আর যুদ্ধে জয়লাভ হইলে পর পুরস্কার স্বরূপ ইংরাজদিগকে চল্লিশ লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন।

ইংরাজগণ স্বভাবতঃ কিছু অর্থলোভী। তাঁহারা এক পত্র পাইয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলেন। কিন্তু অবস্থানুসারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

মাসিক দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা এবং পুরস্কার চল্লিশ লক্ষ—এত অধিক টাকার লোভ সম্বরণ করা অর্থগৃধ্নু ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়িল। কিন্তু এ দিকে আবার রোহিলাগণ ইহাদিগের নিকট কখনও কোনো অপরাধ করেন নাই। কি ছলনা করিয়া তাহাদিগের বিনাশার্থ সৈন্য প্রেরণ করিবেন, তাহা আর ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। কলিকাতা কৌন্সিলে এই বিষয় লইয়া বাদানুবাদ হইতে লাগিল।

কিন্তু দুই তিন মাসের মধ্যেও ইহারা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। দস্যুবৃত্তি অবলম্বন ভিন্ন আর এ টাকা গ্রহণ করিবার উপায়ান্তর নাই।

সুজাউদ্দৌলা ইংরাজদিগকে এই বিষয় উত্তর প্রদানে বিলম্ব করিতে দেখিয়া গবর্নর জেনারেল হেস্টিংস সাহেবকে তাঁহার রাজধানীতে আসিতে অনুরোধ করিলেন। ১৭৭৩ খৃঃ অব্দের আগস্ট মাসে হেস্টিংস সুজাউদ্দৌলার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন।

বারাণসীতে হেস্টিংসের সহিত সুজাউদ্দৌলার সাক্ষাৎ হইল। রোহিলাদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত হেস্টিংস সুজাউদ্দৌলাকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন*। বারাণসীতে হেস্টিংস এবং সুজাউদ্দৌলার মধ্যে একখানি সন্ধিপত্র লিখিত হইল। ইতিহাসে এই সন্ধিপত্রখানি বারাণসী-সন্ধিপত্র নামে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু হেস্টিংস বড় সুচতুর এবং ধূর্ত লোক ছিলেন। এই বারাণসী-সন্ধিপত্রে রোহিলাযুদ্ধের কথা বিন্দুবিসর্গও উল্লিখিত হইল না। কেবলমাত্র এই কথা লিখিত রহিল যে, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা একদল ইংরাজ সৈন্য আপন রাজ্যে রাখিবার প্রার্থনা করিয়াছেন; এবং সেই সৈন্যের ব্যয় নির্বাহার্থ মাসিক দুইলক্ষ দশ হাজার টাকা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন; অতএব ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এক দল সৈন্য তাঁহার কার্যে নিযুক্ত থাকিবে।

রোহিলা যুদ্ধের কথা কোর্ট অব ডিরেক্টরদিগের নিকট লিখিতেও হেস্টিংসের সাহস হইল না। কোন্ সাহসেই বা লিখিবেন? রোহিলাদিগের সহিত ইংরাজদিগের কখনো কোনো বিবাদ ঘটে নাই! অনর্থক সেই নিরপরাধী লোকদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত সৈন্য প্রেরণ করা দস্যুতা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

কিন্তু এই বারাণসী-সন্ধিপত্রে আর যে কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে বন্দোবস্ত হইয়াছিল, তাহা এই স্থানে উল্লেখ না করিলে উপন্যাসের পরবর্তী অধ্যায়ের লিখিত বিষয় পাঠকগণ সহজে বুঝিতে পারিবেন না। বারাণসী সন্ধিপত্র

* 'I found him (says Warren Hastings in his appeal to the Directors dated 3rd December 1774) still equally bent on the design of reducing the Rohillas which I encouraged, as I had done before, by dwelling on the advantages which he would derive from its success.

দ্বারা হেস্টিংস এলাহাবাদ এবং কোরা এই দুইটি জিলা পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মূল্যে সুজাউদ্দৌলার নিকট বিক্রয় করিলেন। সুজাউদ্দৌলা বারাণসীর বর্তমান রাজা চৈৎ সিংহের রাজ্য ক্রয় করিবার নিমিত্তও বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু হেস্টিংস এবার চৈৎ সিংহকে তাঁহার পৈত্রিক রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিতে সম্মত হইলেন না। চৈৎ সিংহের রাজ্য সম্বন্ধে পূর্বে যেরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল তাহাই বলবৎ রাখিলেন।

এলাহাবাদ এবং কোরা এই দুইটি জিলা চৈৎ সিংহের রাজ্যের অন্তর্গত। ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইহাতে কখনও কোন সত্বাধিকার ছিল না। কিন্তু এখন দেশের প্রকৃত রাজা মোগল সম্রাটদিগের ক্ষমতা একেবারে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে। সমুদয় ভারতবর্ষ এখন বেওয়ারিশ মাল। ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির গবর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস সমুদয় ভারতবর্ষ বিক্রয় করিলেও তাঁহাকে বাধা দিতে পারে, এমন কোনো লোক তখন এদেশে ছিল না।

দিল্লীর বর্তমান সম্রাট শাহ আলম এলাহাবাদ এবং কোরা এই দুই জিলার প্রকৃত অধিকারী ছিলেন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে যখন তিনি ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বঙ্গ বিহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানি প্রদান করেন, তখন এলাহাবাদ-সন্ধিপত্র দ্বারা এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছিল, যে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি বৎসর বৎসর শাহ আলমকে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদান করিবেন, আর এলাহাবাদ এবং কোরা এই দুই জিলা হইতে শাহ আলমকে কেহ বেদখল করিতে উদ্যত হইলে, ইংরাজেরা সম্রাটের সাহায্য করিবেন।

এই সন্ধিপত্রের পূর্ব হইতে এ যাবৎ বরাবর সম্রাট এলাহাবাদ এবং কোরার রাজস্ব ভোগ করিতেছিলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা সম্রাটকে তাঁহাদিগের পক্ষাবলম্বন করিতে বাধ্য করিলেন। সম্রাটের নিজের কোনো ক্ষমতা নাই, তিনি বাধ্য হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের করতলস্থ হইয়া পড়িলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ তাঁহাকে দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া এলাহাবাদ কোরা এবং অন্যান্য অনেকানেক প্রদেশের রাজস্ব তাঁহার নিকট হইতে লিখাইয়া লইলেন।

ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি এই উপলক্ষে সম্রাটকে এলাহাবাদ এবং কোরা হইতে বঞ্চিত করিবার বিলক্ষণ সুযোগ পাইলেন। সম্রাট মহারাষ্ট্রীয়দিগের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন, এই ছলনা করিয়া ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি সম্রাটের প্রাপ্য বঙ্গ বিহার এবং উড়িষ্যার রাজস্ব ছাব্বিশ লক্ষ টাকা হইতে তাঁহাকে

বঞ্চিত করিলেন। এলাহাবাদ এবং কোরা ওয়ারেন হেস্টিংস পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মূল্যে সুজাউদ্দৌলার নিকট বিক্রয় করিলেন।

হেস্টিংস এইরূপে সুজাউদ্দৌলার সহিত সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত সম্পন্ন করিয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করিলেন। এখানে পৌঁছিয়া তিনি রোহিলাদিগের বিনাশার্থ জেনারেল চ্যাম্পিয়নকে সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিয়া সসৈন্যে তাঁহাকে সুজাউদ্দৌলার নিকট প্রেরণ করিলেন। এবং বিশেষ চাতুরী প্রকাশ পূর্বক কলিকাতা কৌন্সিলের অপরাপর মেম্বারদিগের নিকট বলিলেন, যে সুজাউদ্দৌলার সহিত অনেক বিষয় সম্বন্ধে গোপনে কথাবার্তা চালাইতে হইবে অতএব তাঁহার নিজের একজন বিশ্বাসী লোক অযোধ্যার রেসিডেন্ট স্বরূপ নিযুক্ত করা আবশ্যক। কৌন্সিলের মেম্বারগণ তাঁহার এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে, তিনি মিডল্টন সাহেবকে অযোধ্যার রেসিডেন্টের পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। এই সময় কলিকাতা কৌন্সিলে অপর বারোজন মেম্বার ছিলেন। রেগুলেটিং আইন (Regulating Act) অনুসারে জেনারেল ক্লেবারিং, কর্নেল মন্সন এবং ফিলিপ ফ্রান্সিস প্রভৃতি যে তিনজন মেম্বার নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা তখন পর্যন্তও কলিকাতায় পৌঁছেন নাই। ইঁহারা তখন পৌঁছিলে বোধ হয় হেস্টিংস রোহিলাদিগের বিনাশার্থ ইংরাজ সৈন্য প্রেরণ করিতে সমর্থ হইতেন না।

তৃতীয় অধ্যায়

যুদ্ধ

সংগ্রামের নাম শ্রবণমাত্রেই অনেকের অন্তরে সাধু-সুলভ-ঘৃণার উদয় হয়। তাঁহাদিগের মতানুসারে শান্তিলাভই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য; সুতরাং যদ্দ্বারা সংসার অশান্তিতে পরিপূর্ণ হয়, তাহা হইতে তাঁহারা মানুষকে সর্বদা বিরত থাকিতে উপদেশ প্রদান করেন।

কিন্তু যুদ্ধ কি সর্বদাই সংসারে অশান্তির বীজ বপন করে? সংগ্রামানল সমুত্থিত সেই দৃষ্টতঃ অশান্তি হইতে কি কখনো শান্তি সমুৎপন্ন হয় না? সমরানল সর্বদাই জগতে অশান্তি, দুর্নীতি, অত্যাচার এবং স্বার্থপরতা ভস্মীভূত করিয়া সংসারের নৈতিক বায়ু পরিশুদ্ধ করিতেছে। যদি সময়ে

সময়ে এ জগতে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জলিত না হইত, তবে মানবমণ্ডলীকে চিরকালই সর্বজনঘৃণিত সেই রোমীয় সম্রাট নিরো কিম্বা তৎসদৃশ নরপিশাচগণ কর্তৃক নিষ্পেষিত হইতে হইত।

এ সংসার যখনই দুর্নীতি এবং অত্যাচারে পরিপূর্ণ হয়, তখনই সমরানল প্রজ্জলিত হইয়া তৎসমুদয় ভস্মীভূত করে। সমগ্র মানবমণ্ডলীর স্বাধীনতা রক্ষার্থ, জগতের দাসত্বশৃঙ্খল উন্মোচনার্থ সংসারে যে সকল সংগ্রাম হইয়াছে, তদ্দ্বারা মানবমণ্ডলীর উপকার ভিন্ন কখনো কোনো অপকার সাধিত হয় নাই।

কিন্তু অর্থ কিম্বা পদ-প্রভুত্বের লোভে যাহারা যুদ্ধ করে, মানবমণ্ডলীর স্বাধীনতা হরণার্থ যাহারা জগতে সংগ্রামানল প্রজ্জলিত করে, তাহারা সত্য সত্যই দস্যু। এইরূপ সংগ্রামের প্রতি স্বভাবতই লোকের ঘৃণার উদয় হইতে পারে।

প্রকৃত বীরগণ সংগ্রামক্ষেত্রে ন্যায়ের পথ পরিত্যাগ করেন না। পুরাকালে ভারতের যোদ্ধাগণ শত্রুকে কখনো অস্ত্রহীনাবস্থায় আক্রমণ করিতেন না। শত্রু শরণাগত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে কখনো তাহার উপর অস্ত্রক্ষেপ করিতেন না। কিন্তু রোহিলা যুদ্ধে দেশীয় এবং বিলাতি বীরগণ পরাজিত এবং পলায়মান শত্রুর স্ত্রী-কন্যাদিগকে পর্যন্ত দণ্ড প্রদান করিতে ত্রুটি করেন নাই। ইহারা বীররসে প্রমত্ত হইয়া কি বৃদ্ধা, কি যুবতী, কি বালিকা, কি কুলবধূ, সকলের নিকট স্বীয় স্বীয় রণকৌশলের পরিচয় প্রদান করিলেন। বোধ হয় ইহাদের বীরত্ব কিছু অধিক ছিল; নহিলে সংগ্রাম তৃষ্ণা এত প্রবল হইবে কেন?

পুরাকালে ভারতবর্ষে প্রকৃত বীরদিগের মধ্যে পরস্পরের যে যে স্থানে সংগ্রাম হইয়াছিল, এখন সেই সকল স্থান পুণ্যক্ষেত্র নামে পরিচিত। সংগ্রামক্ষেত্রে প্রত্যেক যোদ্ধা আপন আপন হৃদয়ের স্বার্থপরতা এবং বিষয়াসক্তি পরিহারপূর্বক কেবল অত্যাচার এবং অন্যায় ব্যবহারের অবরোধার্থ প্রাণ বিসর্জন করিতে প্রস্তুত হইতেন। তাঁহাদিগের তৎসাময়িক মানবিক অবস্থা—তাঁহাদিগকে দেবতায় পরিণত করিত। সুতরাং সেই দেব-সদৃশ যুদ্ধার্থীদিগের সম্মিলন স্থান পরম পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এ সংসারে মানব প্রকৃতির দেবত্ব সংগ্রামক্ষেত্রেই বিকশিত হয়। সংগ্রামক্ষেত্রে মানুষ আত্মবিস্মৃত হইয়া প্রকৃত কর্মযোগীর পবিত্র জীবন লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।

কিন্তু রোহিলাযুদ্ধের ইতিহাসের মধ্যে কি মানব প্রকৃতির সেই দেবভাব পরিলক্ষিত হয়? নবাব সুজাউদ্দৌলা ইংরাজ সৈন্যের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ইংরাজদিগের সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল চাম্পিয়ন অযোধ্যায় পৌঁছিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া রোহিলাগণ ভীত হইল। ইতিপূর্বে তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে যে গৃহবিচ্ছেদ ছিল, আসন্ন বিপদ দর্শনে তাহা বিস্মৃত হইল। সকলের মধ্যে তখন একতার সঞ্চার হইল। তাহারা সকলেই নবাবের দাবিকৃত চল্লিশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া হাফেজ রহমতের হস্তে দিল। হাফেজ নবাবের শরণাগত হইয়া তাঁহার দাবিকৃত টাকা গ্রহণ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। নবাব সুজাউদ্দৌলা এখন আর টাকা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। টাকার দাবি একটা ছলনা মাত্র। রোহিলাদিগকে বিনাশ করিয়া রোহিলখণ্ড স্বীয় রাজ্যভুক্ত করাই সুজাউদ্দৌলার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

হাফেজ রহমত খাঁ দেখিলেন, নবাব সুজাউদ্দৌলা কিছুতেই যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইলেন না। তখন তিনি অনেক যত্ন এবং পরিশ্রমে চারি সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। আবালবৃদ্ধ সমুদয় রোহিলা স্বদেশ রক্ষার্থ প্রাণ বিসর্জন করিতে প্রস্তুত হইল।

১৭৭৪ খৃঃ অব্দের ১৭ই এপ্রিল হাফেজ রহমত খাঁ এবং ফায়েজউল্লা খাঁ সসৈন্যে যাত্রা করিয়া, গর্গানদীর পার্শ্বে কটার গ্রামে সৈন্য সন্নিবেশ করিলেন। ২০শে এপ্রিল ইংরাজদিগের সৈন্যাধ্যক্ষ সসৈন্যে সাজাহানপুর পর্যন্ত পৌঁছিলেন; কিন্তু ২৩ এপ্রিলের পূর্বে যুদ্ধারম্ভ হইল না।

২৩শে এপ্রিল উভয় পক্ষের সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধারম্ভ করিল। হাফেজ রহমত এবং ফায়েজউল্লা এই যুদ্ধে অলৌকিক বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিলেন। রোহিলাদিগের সৈন্য সংখ্যা চারি সহস্রের অধিক নহে, কিন্তু বিপক্ষদিগের সৈন্য-সংখ্যা ইহার চতুর্গুণ ছিল। সৈন্য সংখ্যার ন্যূনতা প্রযুক্ত রোহিলাগণ ভগ্নোৎসাহ না হয়, তজ্জন্য হাফেজ রহমত এবং ফায়েজউল্লা স্বীয় স্বীয় হস্তী পৃষ্ঠ হইতে ভূমে অবতরণ পূর্বক তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণে উভয়েই সমগ্র সৈন্যের অগ্রবর্তী হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ ইহাদিগের বীরত্বে যারপরনাই উৎসাহিত হইল, এবং কালান্তক যমের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া শত শত ইংরাজ সৈন্যের প্রাণ বিনাশ করিল।

জেনারেল চ্যাম্পিয়ন ইহাদিগের বীরত্ব দর্শনে বিস্মিত এবং চমৎকৃত হইলেন। তিনি তখন মনে মনে ঘোর বিপদাশঙ্কা করিয়া অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু অত্যল্প কাল মধ্যে রোহিলাদিগের বারুদ গোলা প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল। শূল যুদ্ধে রোহিলাগণ বিশেষ পারদর্শী ছিল। ইহাদিগের কামান, বন্দুক প্রভৃতি আগ্নের অস্ত্র বড় অধিক ছিল না। বিশেষতঃ উপযুক্ত সময় থাকিতে যথেষ্ট বারুদ ও গোলা সংগ্রহ করিতে পারে নাই। এদিকে ইংরাজদিগের কামান-যুদ্ধের আয়োজনের কোনো ত্রুটি ছিল না।

হাফেজ রহমত খাঁ দেখিলেন ঘোর বিপদ উপস্থিত। তিনি ফায়েজউল্লার সহিত পরামর্শ করিয়া ইংরাজ সৈন্যের দক্ষিণ পার্শ্বে যাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার কৌশল করিলেন। এ পর্যন্ত ইংরাজদিগের সৈন্য পশ্চিম বাহিনী হইয়া যুদ্ধ করিতেছে। রোহিলা সৈন্য পূর্ব মুখ হইয়া রহিয়াছে। হাফেজ রহমত অর্দ্ধ মিনিটের মধ্যে স্বীয় সৈন্যগণকে দক্ষিণে কিঞ্চিৎ সরাইয়া উত্তর মুখ করিলেন। তখন রোহিলা সৈন্যগণ ইংরাজদিগের বাম পার্শ্ব হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার সুযোগ পাইল। এদিকে বিপক্ষ আর্টিলারি মেন (Artillery-men) পশ্চিম মুখী হইয়া রহিল। এই সুযোগে রোহিলা সৈন্য একেবারে ইংরাজ সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শূলাঘাতে তাহাদিগের প্রাণ বিনাশ করিতে লাগিল। ইংরাজদিগের কামান ব্যবহার করিবার সুবিধা রহিল না।

প্রায় পাঁচ মিনিটের মধ্যেও জেনারেল চ্যাম্পিয়ন তাঁহার কামান-যোদ্ধাগণকে দক্ষিণমুখী করিতে সমর্থ হইলেন না। ইত্যবসরে হাফেজ রহমত ও ফায়েজউল্লা মত্ত-হস্তীর ন্যায় ইংরাজ সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে দলন করিতে লাগিলেন। হাফেজ রহমত মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, যে ইংরাজ সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলে আর তাঁহাদিগের কামান দ্বারা যুদ্ধ করিবার সুযোগ থাকিবে না। সুতরাং তাহারা বাধ্য হইয়া শূল যুদ্ধ আরম্ভ করিবে।

কিন্তু নবাব সুজাউদ্দৌলার কতক সৈন্য কিঞ্চিৎ দূরে ছিল। ইংরাজ সৈন্যদিগকে একবারে পরাস্ত হইতে দেখিয়া তাহারা রোহিলাদিগের পশ্চাতে আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তখন ফায়েজউল্লা এবং মহব্বত খাঁ কতক সৈন্য দক্ষিণমুখ করিয়া নবাবের সৈন্যদিগকে আক্রমণ

করিলেন। কিন্তু এই অবসরে এদিকে জেনারেল চ্যাম্পিয়ন তাঁহার কামান-যোদ্ধাদিগকে আবার যথোপযুক্তরূপে দক্ষিণমুখ করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিলেন।

রোহিলাগণ এখনও আল্লা আল্লা বলিয়া দুইদিকের সৈন্যসহ তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিল। রোহিলা-যুবক মহবত খাঁ অশ্বারোহণে নবাব সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, একাকী অন্যূন দুই শত লোকের শিরশ্ছেদন করিলেন। কিন্তু এদিকে ভয়ানক দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল। অকস্মাৎ হাফেজ রহমতের বুকের উপর একটা কামানের গোলা আসিয়া পড়িল। তিনি তৎক্ষণাৎ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। সৈন্যাধ্যক্ষের পতন দেখিয়া সৈন্যগণ ভীত হইয়া পড়িল। ফায়েজউল্লা তদ্দর্শনে আবার সৈন্যগণকে আশ্বস্ত করিবার নিমিত্ত আল্লা আল্লা বলিয়া ইংরাজ সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

হাফেজের এখন পর্যন্তও মৃত্যু হয় নাই। তিনি ফায়েজউল্লাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন 'আর আশা নাই সংগ্রাম ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া, স্ত্রীলোকের ইজ্জৎ রক্ষা করিবার চেষ্টা কর।'

এই কথা বলিবার পরেই হাফেজের কণ্ঠাবরোধ হইল। ধরাতলশায়ী স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রের পার্শ্বে রোহিলাকুলতিলক হাফেজ রহমত খা ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ কুরু-কুল-দেবতা মহাবীর ভীষ্মদেবের ন্যায় শরশয্যায় পড়িয়া রহিলেন। তাঁহার বক্ষ হইতে অবিশ্রান্ত শোণিত নির্গত হইতে লাগিল।

আলি মহম্মদ-নন্দন বীর-চূড়ামণি ফায়েজউল্লা খাঁ এখনও নিরাশ হয়েন নাই। হাফেজের কথায় কর্ণপাত না করিয়া, আবার আল্লা আল্লা বলিয়া হাফেজের দ্বিতীয়, তৃতীয় পুত্র এবং মহবতের সঙ্গে একত্রে শূল হস্তে ইংরাজ সৈন্যদিগের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

প্রায় পঞ্চাশজন ইংরাজ একত্র হইয়া হাফেজের দ্বিতীয় পুত্রকে ধৃত করিল। এদিকে একটা গোলা মহবত খাঁর বক্ষে আসিয়া পড়িল। তখনও ফায়েজউল্লা সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে আল্লা আল্লা বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্য সংখ্যা একবারে হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা পশ্চাৎ হইতে মাত্র দুই শত সৈন্য আল্লা আল্লা বলিয়া উঠিল। ফায়েজউল্লা এখন নিরাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পার্শ্বস্থিত হাফেজের কনিষ্ঠ পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'চল এখন যাহাতে স্ত্রীলোকদিগের ইজ্জৎ বজায় থাকে তাহারই চেষ্টা করি।'

এই বলিয়া, তিনি প্রথমতঃ আপন পক্ষের আহত সৈন্যদিগকে পলায়নের পথ করিয়া দিলেন, পরে হাফেজের পুত্রকে সঙ্গে করিয়া, অশ্বারোহণে সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন।

ইংরাজ এবং সুজাউদ্দৌলার সৈন্যগণের জয়লাভ হইল। তাহারা তখন উচ্চৈঃস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

চতুর্থ অধ্যায়

রমণীর বীরত্ব

রোহিলা-রমণীগণ জানিতেন যে রোহিলাদিগকে কেহ কখনও যুদ্ধে পরাভব করিতে পারে না। রোহিলাগণ বিশ্ববিজয়ী, এটি তাহাদিগের বদ্ধমূল সংস্কার হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদিগের প্রত্যেক কথা এবং কার্য অন্তরস্থিত প্রগাঢ় জাতীয় গর্ব এবং জাতীয় গৌরব প্রকাশ করিত। ইহারা আপনাদিগকে বীরবালা, বীরপত্নী, বীরজননী বলিয়া জানিতেন।

ইহাদিগের স্বামী পুত্র সংগ্রামে চলিয়া গেলে পর, ইহারা নিঃশঙ্ক হৃদয়ে গৃহে বসিয়া আমোদপ্রমোদে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। ইহাদিগের কোন ভাবনাচিন্তা নাই। কেনই বা থাকিবে। ইহাদের দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে যে স্বামী পুত্র সংগ্রামে ইংরাজদিগকে পরাস্ত করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবেন।

বাঙালী রমণীর স্বামীপুত্র এইরূপ যুদ্ধে চলিয়া গেলে তাঁহাদিগের আহারনিদ্রা একেবারে রহিত হইত। তাঁহারা স্বামীপুত্রের বিপদাশঙ্কা মনে করিয়া অহর্নিশি কেবল অশ্রু বিসর্জন করিতেন। কিন্তু তাহা হইলেও বঙ্গ রমণীর মধ্যে যে একবারে বীরত্ব নাই তাহা আমরা বলি না। আসল কথা সকলের বীরত্ব একবিধ নহে। রোহিলা-রমণীর বীরত্ব যেরূপ বাক্যে এবং কার্যে প্রকাশিত হয়, বঙ্গমহিলার বীরত্ব ঠিক সেইরূপ কার্যে এবং বাক্যে প্রকাশিত না হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা বঙ্গমহিলাদিগের যে বিষয়ে বীরত্ব আছে তাহাও কি অস্বীকার করিব? তাহা হইলে আর ন্যায়ানুগত বিচার হইল না।

সকল দেশীয় বীরগণই একপ্রকার অস্ত্রধারণ করেন না, বা এক প্রণালীতে

যুদ্ধ করেন না। সকলের সংগ্রামক্ষেত্র একরূপ নহে। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সময়ে এক এক জন বীর এক এক প্রকার ব্যূহ রচনা করিতেন। রোহিলাগণ শূল-যুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী; ইংরাজগণ কামান-যুদ্ধে সর্বদাই দক্ষতা প্রকাশ করেন।

বঙ্গমহিলার অস্ত্র অশ্রুজল, বর্ম অভিমান। সেই অভিমান-বর্ম পরিধান করিয়া যখন তিনি মান করিয়া বসেন, তখন শত শত ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণও তাঁহার মান ভঙ্গ করিতে পারেন না। তখন পাণ্ডবকুলতিলক স্বয়ং মহাবীর ধনঞ্জয় গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে করিয়া আসিলেও তাঁহাকে কথা বলাইতে সমর্থ হইবেন না। এ কি কম বীরত্ব!

* * * *

বীরবালা বীরপত্নী রোহিলা-রমণীগণ পরমানন্দে দিনপাত করিতেছেন। রোহিলা-জননী ক্রোড়স্থিত রোরুদ্যমান শিশু সন্তানকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন, 'আজ অপরাহ্ণে তোমার বাবা সংগ্রামক্ষেত্র হইতে একটা ইংরাজ ধরিয়া আনিবেন। আমরা তাহাকে খাঁচার মধ্যে পুরিয়া রাখিব।' কোথাও চার পাঁচ জন রোহিলা-রমণী একত্র হইয়া নানা গল্প করিতেছেন। তাহাদিগের মধ্যে কোন প্রবীণা-রমণী বলিতেছেন, 'যখন দিল্লীর সম্রাট্‌ আলি মহম্মদকে ধৃত করিয়া কয়েদ রাখিয়াছিলেন, তখন আমার পিতা সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দিল্লীতে যাইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন।'

মহবত খাঁর জননী বড় আস্ফালন পূর্বক বলিতেছেন 'এবার হাফেজ জানিতে পারিবেন, আমার মহবত কেমন যোদ্ধা।'

এই মহবত খাঁর সঙ্গে হাফেজ-নন্দিনীর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। এই ঘটনার ছয় সাত মাস পূর্বে ইহাদিগের বিবাহ হইত। কিন্তু বর্তমান যুদ্ধ সমুপস্থিত হইয়াছিল বলিয়াই এপর্যন্ত বিবাহ হয় নাই।

হাফেজের গৃহে তাঁহার স্ত্রী এবং ষোড়শবর্ষীয়া কন্যা যুদ্ধার্থীদিগের মঙ্গল কামনা করিয়া আহারের পূর্বে বেলা নয় ঘটিকার সময় কোরাণ পাঠ করিতেছেন। কোরাণের মধ্যে এক স্থান হইতে হাফেজ-নন্দিনী পাঠ করিলেন—'বিশ্বাসীদিগের পরিচালক ও নেতা একমাত্র পরমেশ্বর। সুতরাং পরমেশ্বর যাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন এ সংসারে কোটি কোটি মানুষও তাহার কিছু করিতে পারে না।'

হাফেজ-নন্দিনী এই কথা পাঠ করিলে পর হাফেজের স্ত্রীর হৃদয় বড় প্রফুল্ল হইল। তিনি সহাস্যবদনে কন্যাকে বলিলেন—

'তোমার পিতা বিশ্বাসী লোক। স্বয়ং পরমেশ্বর নিশ্চয়ই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আছেন। এ যুদ্ধে ঈশ্বর তাঁহার সহায়।'

হাফেজ-নন্দিনী মাতাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবেন বলিয়া মনে করিলেন। কিন্তু লজ্জায় সে কথা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল না। তিনি কিছুকাল নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন।

কিন্তু কথাটি জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত প্রগাঢ় ইচ্ছা হইয়াছে। তখন প্রকারান্তরে আপন উদ্দেশ্য সাধনার্থ মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মা, যত লোক যুদ্ধে গিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বোধ হয় বিশ্বাসী লোক। ফায়েজ-উল্লা কি বিশ্বাসী নহেন ?'

মাতা বলিলেন—'সকলেরই ঈশ্বরের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে। কিন্তু তোমার পিতার জীবন্ত বিশ্বাস। ফায়েজউল্লা উজীরকে আশি লক্ষ টাকা দিয়াও বিবাদ মিটাইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু তোমার পিতা সে পথ অবলম্বন করিলেন না। তিনি বলিলেন, "ভয় নাই ফায়েজউল্লা, ঈশ্বর আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না"।'

কন্যা মাতার নিকট হইতে আপন অভিলষিত উত্তর প্রাপ্ত হইলেন না। সুতরাং লজ্জাবনত মুখে অগত্যা অভিপ্রেত প্রশ্ন স্পষ্টাক্ষরে জিজ্ঞাসা করিতে হইল।

তিনি অধোবদনে মাতার নিকট তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা, মহব্বৎ খাঁ বিশ্বাসী লোক নহেন ?'

মাতা কন্যার প্রশ্ন শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। কন্যা যে উদ্দেশ্যে এই সকল প্রশ্ন করিতেছেন, তাহা এখন বুঝিতে পারিলেন। কন্যার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন,—'মহবতের অন্তর মহবতে * পরিপূর্ণ। যাহার অন্তরে মহবত আছে পরমেশ্বর সর্বদাই তাহার সঙ্গে থাকেন।'

এইরূপে রোহিলা রমণীদিগের ঘরে ঘরে নানা প্রকার কথাবার্তা হইতেছে। এদিকে বেলা প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে। সায়াহ্নকালে আহত সৈন্যগণ সহ ফায়েজউল্লা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রোহিলাশ্রেষ্ঠ অশীতিবর্ষ বয়স্ক হাফেজ রহমত খাঁ স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র সহ সংগ্রামে নিহত হইয়াছেন—রোহিলা সৈন্যগণ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছে—এই

* মহবত শব্দের অর্থ—দয়া।

দারুণ সংবাদ পৌঁছিবামাত্র ঘরে ঘরে হাহাকার ধ্বনি উথিত হইতে লাগিল। অকস্মাৎ যেন বিনা মেঘে সকলের মস্তকে বজ্রপাত হইল।

হাফেজ রহমতের স্ত্রী স্বামী-পুত্রশোকে বিহ্বলা হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কন্যাকে অপেক্ষাকৃত সমধিক শোকাতুরা দেখিয়া নিজের উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ সম্বরণ পূর্বক কন্যাকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

ফায়েজউল্লা এখন হাফেজের গৃহে আসিয়া পৌঁছেন নাই। হাফেজের স্ত্রী মনে করিয়াছিলেন, যে হয়ত ফায়েজউল্লা তাঁহার স্বামী পুত্রের মৃতদেহ সঙ্গে করিয়া আসিতেছেন। এই প্রকার চিন্তা করিয়া, তিনি হাফেজের শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্বক স্বামীর বিবিধ উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি বাহির করিতে লাগিলেন। স্বামীর প্রিয় তরবারিখানি বাহির করিলেন। এই সকল মূল্যবান বসনে সুসজ্জিত করিয়া এবং তরবারিখানি হাতে দিয়া স্বামীর মৃতদেহ ভূগর্ভে রাখিবেন বলিয়া মনে মনে স্থির করিলেন।

এই সময়ে হাফেজের কনিষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে করিয়া ফায়েজউল্লা হাফেজের গৃহে পৌঁছিলেন। হাফেজের স্ত্রী স্বামীর মৃতদেহ আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত দ্রুতপদে বাহিরে আসিলেন। স্বামীর প্রিয় তরবারিখানি এখনও তাঁহার হস্তে রহিয়াছে।

কিন্তু স্বামীর মৃতদেহ না দেখিয়া সক্রোধে ফায়েজউল্লাকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন, 'হতভাগ্য তোর পিতৃসদৃশ খুল্ল-পিতামহের মৃতদেহ সমর ক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিস? অদৃষ্টে এই ছিল যে, হাফেজের মৃতদেহ পশু পক্ষীর আহার হইল।'

ফায়েজউল্লা লজ্জা এবং অপমানে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রু বিসর্জিত হইতে লাগিল। তিনি তখন বাষ্পাকুল—কণ্ঠে বলিলেন, 'মা, এ গোলামের কোন অপরাধ নাই। পিতামহের আদেশানুসারেই সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছি। ইচ্ছা ছিল যে পিতামহের পদানুসরণ করি। কিন্তু কেবল তোমাদিগের ইজ্জৎ রক্ষার্থ এই ঘৃণিত জীবন ধারণ করিতেছি।'

ফায়েজউল্লার এই কথা শুনিয়া হাফেজের স্ত্রী আবার কোপাবিষ্ট হইয়া বলিলেন,—'রোহিলারমণী কি এখন পলায়ন করিয়া ইজ্জৎ রক্ষা করিবে? রোহিলাগণ সমরশায়ী হইয়াছেন কিন্তু তাঁহাদিগের তরবারি এখনও গৃহে পড়িয়া রহিয়াছে। দেখ,—এই তরবারি কি রমণীগণের ইজ্জৎ রক্ষা করিতে

অসমর্থ? যে তরবারি রোহিলাবীরের হস্তে থাকিয়া শত্রুর শিরশ্ছেদন পূর্বক এতকাল আমাদিগের ইজ্জৎ রক্ষা করিয়াছে, আজ নিরাশ্রয়া অবলা রোহিলা রমণীগণ নরপিশাচের আক্রমণ হইতে ধর্ম রক্ষার্থ ইহারই আশ্রয় গ্রহণ করিতে কি অসমর্থা? পলায়নের প্রয়োজন কি? সুতীক্ষ্ণ তরবারের সাহায্যে এখনই স্বামীপুত্রের সহিত সম্মিলিত হইব। তোর মনুষ্যাত্মা নাই। তুই সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া রোহিলাশ্রেষ্ঠ আলি মহম্মদের নাম কলঙ্কিত করিয়াছিস্। এখনই পুনর্বার সমরক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করিয়া নরপিশাচ উজীরের শিরশ্ছেদন পূর্বক রোহিলা কলঙ্ক দূর কর।'

'আলি মহম্মদের নাম কলঙ্কিত করিয়াছিস্' এই কথা হাফেজ-পত্নীর মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র ফায়েজউল্লা তৎক্ষণাৎ কটিদেশ হইতে তরবারি বাহির করিয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। পশ্চাৎ হইতে হাফেজের কনিষ্ঠ পুত্র এবং সম্মুখ হইতে হাফেজের স্ত্রী ফায়েজউল্লার দুই হস্ত সজোরে ধরিয়া রাখিলেন।

ফায়েজউল্লাকে অভিমানে এইরূপ আত্মহত্যা করিতে উদ্যত দেখিয়া, হাফেজ-পত্নীর হৃদয়ে মাতৃস্নেহের উদয় হইল। আর তাঁহাকে কোন তিরস্কার করিলেন না। আপন ক্রোড়ে বসাইলেন। উভয়ের চক্ষু হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল।

সমস্ত দিবস সংগ্রামক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়া ফায়েজউল্লা মুখমণ্ডল শুষ্ক ও বিবর্ণ হইয়াছে। হাফেজ-নন্দিনী স্বীয় ভ্রাতা এবং ভ্রাতষ্পুত্র ফায়েজউল্লাকে গ্লাসে করিয়া উৎকৃষ্ট সরবত প্রদান করিয়া, স্বহস্তে ইহাদিগের শোণিতাক্ত শরীর ধৌত করিতে লাগিলেন।

সংগ্রামক্ষেত্রে যে সকল রোহিলা বীর নিহত হইয়াছেন, তাহাদিগের নাম উল্লেখ করিবার সময় হাফেজের পুত্র মহবত খাঁর নাম উল্লেখ করিলেন। মহবতের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে স্বর্ণ-প্রতিমা হাফেজ-নন্দিনীর মুখ বিষাদের ছায়ায় সমাবৃত হইল।

কিছুকাল পরে ফায়েজউল্লা সমুদয় স্ত্রীলোকদিগকে পলায়নের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে বলিলেন। অন্যান্য অনেকানেক রমণী পলায়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হাফেজের স্ত্রী স্বামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত না করিয়া রোহিলখণ্ড পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। তখন ফায়েজউল্লা অনন্যোপায় হইয়া অন্যান্য সহস্র সহস্র স্ত্রীলোকসহ পলায়ন

পূর্বক পাহাড়ে উঠিলেন। হাফেজের স্ত্রীকে পাহাড়ে লইয়া যাইবার নিমিত্ত তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে এখানে রাখিয়া গেলেন। হাফেজের কনিষ্ঠ পুত্র জননীর আদেশানুসারে পিতা এবং ভ্রাতার মৃত দেহ আনয়নার্থ যুদ্ধ ক্ষেত্রাভিমুখে চলিলেন। কিন্তু পথে সুজাউদ্দৌলার সৈন্যগণ তাঁহাকে ধৃত করিল। সুতরাং হাফেজের মৃতদেহ সেই সংগ্রাম ক্ষেত্রেই পড়িয়া রহিল।

পঞ্চম অধ্যায়

দস্যুতা

যুদ্ধাবসানে নবাব সুজাউদ্দৌলা ইংরাজ সৈন্যদিগকে রোহিলখণ্ডের সমুদয় গ্রাম লুট করিতে আদেশ করিলেন। এক এক দল সৈন্য এক এক গ্রামে প্রবেশ করিয়া কি বণিক, কি কৃষক, কি ভূম্যধিকারী, কি ব্যবসায়ী লোক সকলের বাড়ি লুট করিতে লাগিল। গ্রাম্যবাসিনী রমণীদিগের নাসিকা কর্ণ ছিন্ন করিয়া, তাহাদিগের গাত্রাভরণ হরণ করিতে লাগিল। অনেকানেক স্ত্রীলোকের পরিধেয় বস্ত্রখানি পর্যন্ত কাড়িয়া লইয়া বিবস্ত্রাবস্থায় তাহাদিগকে নবাবের তাঁবুতে লইয়া চলিল। জগতের ইতিহাসে ঈদৃশ নৃশংস আচরণ অত্যল্পই পরিলক্ষিত হয়। চারি পাঁচ দিবস পর্যন্ত সৈন্যদিগকে এইরূপ দুর্ব্যবহার করিতে দেখিয়া জেনারেল চ্যাম্পিয়নের হৃদয়ও বিগলিত হইল। তিনি সৈন্যগণের এই পৈশাচিক আচরণ নিবারণার্থ ওয়ারেন হেস্টিংসের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া তাঁহার নিকট পত্র লিখিলেন। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস জেনারেল চ্যাম্পিয়নের পত্রের প্রত্যুত্তরে লিখিলেন, 'ইংরাজ সৈন্যদিগকে নবাব সুজাউদ্দৌলার আদেশানুসারে কার্য করিতে হইবে। সুজাউদ্দৌলা যেরূপ কার্য করিতে বলেন, তাহাদিগকে তাহাই করিতে হইবে। তোমার এ বিষয়ে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই।'

জেনারেল চ্যাম্পিয়ন হেস্টিংসের এই পত্র পাইয়া নির্বাক্ রহিলেন। এদিকে ইংরাজ সৈন্যগণ যুদ্ধের পর প্রায় একমাস পর্যন্ত গ্রাম লুট করিতে লাগিল। শত শত স্ত্রীলোকের ধর্ম নষ্ট করিল। অসংখ্য রোহিলা-রমণী আত্মঘাতিনী হইলেন।

লোক পরম্পরায় সুজাউদ্দৌলা শুনিলেন, যে, হাফেজ রহমতের স্ত্রী এবং কন্যা এখনও হাফেজের বাড়িতে অবস্থান করিতেছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে ধৃত করিবার নিমিত্ত কয়েকজন সৈন্য প্রেরণ করিলেন।

যে সকল ইংরাজ এবং দেশীয় সিপাহী গ্রাম লুট করিবার নিমিত্ত দলে দলে প্রেরিত হইতেছিল, তাহাদিগের মধ্যে অমরসিংহ নামে একজন দেশীয় সিপাহী ছিল। অমরসিংহ সুবেদার নেহালসিংহের পুত্র বলিয়া পরিচিত। নেহালসিংহ দীর্ঘকাল ইংরাজদিগের অধীনে সুবেদারী কার্য করিয়া বক্সারের (Buxer) যুদ্ধে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। নেহাল-সিংহ জীবিত থাকিতেই অমরসিংহ সিপাহীর কার্যে নিযুক্ত হইয়া বক্সারের যুদ্ধে বিশেষ কার্যদক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। রেজিমেণ্টের মধ্যে প্রায় সকলেই অমরসিংহকে বিশেষ শ্রদ্ধা করে।

গ্রাম লুট করিবার সময় যে যে গ্রামে অমরসিংহ উপস্থিত ছিল, সেই সমুদয় গ্রামের স্ত্রীলোকদিগকে সে পলায়নের সুবিধা করিয়া দিয়াছে। প্রাণান্তেও অমরসিংহ কোনো সিপাহীকে কোনো স্ত্রীলোকের গাত্রস্পর্শ করিতে দিত না। কিন্তু যে সকল গ্রাম লুট করিবার নিমিত্ত ইংরাজ এবং অন্যান্য দেশীয় সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারা স্ত্রীলোকদিগের উপর ভয়ানক অত্যাচার করিয়াছিল।

হাফেজ রহমতের স্ত্রী এবং কন্যাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত যে কয়েকজন সৈনিক পুরুষ প্রেরিত হইয়াছিল তন্মধ্যে লেফ্টেন্যাণ্ট টম্সন এবং এন্সাইন্ (Ensign) মেল্বিল্ প্রভৃতি চারি পাঁচজন ইংরাজ আর অমরসিংহ প্রভৃতি পঞ্চাশজন দেশীয় সিপাহী ছিল। অমরসিংহের এবার আর হাফেজের কন্যা ও স্ত্রীকে পলায়নের সুবিধা করিয়া দিবার সুযোগ রহিল না। একদিকে তাহাদিগকে ধৃত করিবার নিমিত্ত সুজাউদ্দৌলার স্পষ্ট হুকুম রহিয়াছে, পক্ষান্তরে এন্সাইন্ মেল্বিল্ এবং লেফ্টেন্যাণ্ট টমসন্ প্রভৃতির হস্তেই এ যাত্রার কর্তৃত্ব ভার রহিয়াছে। তাহারা যে অমরসিংহের অনুরোধে কার্য করিবেন, এইরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।

সৈন্যগণ হাফেজের বাড়িতে পৌঁছিয়া দেখিল, যে, বাহির খণ্ডের সমুদয় গৃহ শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। হাফেজের স্ত্রীর যে দুই-চারিজন ভৃত্য ছিল, তাহারাও সৈন্যের আগমনের পূর্বেই পলায়ন করিয়াছে। সৈন্যগণ দ্বার ভাঙিয়া অন্দর মহলে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। হাফেজের স্ত্রী সৈন্য-

গণকে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই বুঝিলেন, যে, ইহারা তাঁহাকে এবং তাঁহার কন্যাকে ধৃত করিবার অভিপ্রায়ে আসিয়াছে। তিনি অন্দরের মধ্যে সম্মুখের দুই তিনটি প্রকোষ্ঠের দ্বার ক্রমে রুদ্ধ করিয়া সকলের পশ্চাতের প্রকোষ্ঠে কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন। জননী এবং কন্যা উভয়ের নয়নজলে উভয়ের পরিধেয় বসন সিক্ত হইয়া উঠিল। পরে জননী উঠিয়া অন্য এক প্রকোষ্ঠ হইতে দুইখানি সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা হস্তে করিয়া পুনর্বার কন্যার নিকট আসিলেন; ইহার একখানি ছুরিকা আপন কেশরাশির মধ্যে রাখিলেন। দ্বিতীয়খানি কন্যার আলুলায়িত কেশের মধ্যে রাখিয়া তাহার সেই সুদীর্ঘ কেশ বিনাইয়া বান্ধিতে লাগিলেন। কন্যা তাঁহার অভিপ্রায় কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি সজলনয়নে মাতার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—

'মা চুলের নিচে ছুরি রাখিলে কেন?'

জননী। বাছা, এই তোমার হতভাগিনী জননীর শেষ-দান।

হাফেজ-নন্দিনী ইহাতেও মাতার অভিপ্রায় কিছু বুঝিতে পারিলেন না। ষোড়শবর্ষীয়া যুবতী, এপর্যন্ত বিপদ কাহাকে বলে কখন জানেন না। সুতরাং অবাক হইয়া জননীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

জননী তখন উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ সম্বরণ পূর্বক বলিলেন—'বাছা এ সংসারে সকল সময়ের দান একপ্রকার নহে। এক সময়ে তোমার এই হতভাগিনী জননী তোমাকে বুকের উপর রাখিয়া স্তন্য পান করাইত, তোমার প্রফুল্ল মুখচন্দ্রমা দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত করিত, এই বক্ষের উপর তোমার শয্যা পাতিয়া রাখিত, কিন্তু আজ আবার তোমার সেই জননীই তোমাকে আত্মহত্যা করিবার নিমিত্ত অস্ত্র প্রদান করিতেছে। এই বিষমণ্ডিত মারাত্মক অস্ত্র তোমার ইজ্জৎ রক্ষার একমাত্র উপায়। এই তোমার জননীর শেষ-দান, শেষ আশীর্বাদ।'

কন্যা বলিলেন, 'মা তবে এইখানে বসিয়া এখনই কেন আত্মহত্যা করি না? ছুরিকা কেশের মধ্যে লুকাইয়া রাখিবার প্রয়োজন কি?'

জননী। (বীরদর্পে) 'এখানে আত্মহত্যা করিবে কেন? আমরা মনুষ্য জীবন ধারণ করি না? মানুষের ন্যায় প্রাণ বিসর্জন করিব। হাফেজের স্ত্রী, বিড়াল কুকুরের ন্যায় প্রাণ বিসর্জন করিবে?'

'এই বিষাক্ত মারাত্মক ছুরিকাদ্বারা অগ্রে শত্রুকে সমুচিত দণ্ড বিধান

করিব। তোমার পিতৃবৈরী বিনাশ না করিয়া এ সংসার পরিত্যাগ করিব না। হয় তোমার হাতে, না হয় আমার হাতে, সেই নরপিশাচ উজীরের মৃত্যু নিশ্চয়ই লিখিত রহিয়াছে। সাবধান, তাহাকে বিনাশ না করিয়া আত্মহত্যা করিবে না।'

কন্যা। আমরা শত্রুকে কিরূপে বিনাশ করিব?

জননী। নরপিশাচ যখন কামাশক্ত হইয়া হাফেজ-কন্যার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে উদ্যত হইবে, তখন এই ছুরিকা নিশ্চয়ই তাহার বক্ষে প্রবেশ করিবে। বাছা! স্মরণ রাখিবে যে, প্রাণ বিসর্জন করিয়াও ইজ্জৎ রক্ষা করিতে হইবে। ভুলিবে না, যে, তুমি হাফেজের কন্যা। হাফেজের পবিত্র শোণিতে তোমার শরীর গঠিত হইয়াছে।

জননী কন্যাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া আবার বারম্বার তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন; সতৃষ্ণ নয়নে কন্যারমুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কন্যা মাতার মুখের দিকে চাহিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিল। কিন্তু জননী আবার সগর্বে বলিয়া উঠিলেন।

'ভয় কি বাছা! তোমার পিতা আপন রাজ্য এবং প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন। তাঁহার নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ হইয়াছে। আমরাও আর দুই-চারি দিন পরে এ দুঃখের সংসার পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইব। তুমি নির্ভয়ে—'

হাফেজ-পত্নীর কথা শেষ হইতে-না-হইতে সৈন্যগণ দ্বার ভগ্ন করিয়া প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিল। তরবারি হস্তে হাফেজের স্ত্রী সৈন্যদিগকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন, 'আমাদিগকে কখনো স্পর্শ করিতে পারিবে না। যদি আমাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়া থাক, আমরা এখনই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইব।'

হাফেজ-পত্নী রোহিলা ভাষাতে এই সকল কথা বলিলেন। এনসাইন্ মেল্‌বিল্ এবং লেফ্‌টেন্যান্ট টম্‌সন্ ইহার এক কথাও বুঝিতে পারিলেন না।

সেখানে অমরসিংহ এবং জমাদার আবদালি খাঁ উপস্থিত ছিল। অমরসিংহ এইরূপ বিশুদ্ধ উর্দ্দু বড় বুঝিত না, কিন্তু তত্রাচ হাফেজ-পত্নীর মনোগত ভাব সে বুঝিতে সমর্থ হইল। আবেদালি খাঁ অযোধ্যার লোক, সে সহজেই তাঁহার কথা বুঝিল এবং সাহেবদ্বয়কে হাফেজ-পত্নীর সমুদয় কথা বুঝাইয়া বলিল।

লেফ্‌টেন্যান্ট টম্‌সন আবেদালির কথায় কোনো মনোযোগ প্রদান করিলেন না। তিনি মেল্‌বিল্‌কে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন—

'Dear Melville, this old woman is setting her cap for you. She is a pretty old girl. You may accept her offer if you please.

প্রিয় মেল্‌বিল্‌, তোমার প্রতি এই বৃদ্ধা রমণীর দৃষ্টি পড়িয়াছে। এ অতি সুন্দরী বৃদ্ধা বালিকা। তুমি ইচ্ছা করিলে ইহাকে গ্রহণ করিতে পার।'

মেল্‌বিল্‌ টমসনের কথা শুনিয়া মনে মনে বলিলেন, যে টম্‌সন বড় দুষ্ট। আমার ঘাড়ে এই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটা দিয়া নিজে বোধ হয় এই পরমাসুন্দরী যুবতীকে নিতে চাহেন। কিন্তু টম্‌সনের সে আশা বৃথা। নবাবের স্পষ্ট হুকুম রহিয়াছে যে হাফেজ রহমতের স্ত্রী ও কন্যাকে স্বয়ং নবাবের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। হাফেজের স্ত্রী এবং কন্যাকে পাল্কীতে করিয়া নিতে নবাব হুকুম করিয়াছেন। বোধ হয় নবাব স্বয়ং ইহাদিগকে রাখিবেন।

মেল্‌বিল্‌ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রকাশ্যে টম্‌সনকে বলিলেন—

'Dear Thompson, these prizes are not for us, they are intended for the Nawab himself.'

'প্রিয় টমসন এ পুরস্কার আমাদের প্রাপ্য নহে। নবাব স্বয়ং ইহাদিগকে রাখিবেন।'

টমসন। Nawab has already in his seraglio three thousands and three hundred women. Does he want more? 'নবাবের অন্দরে এখনও তিন হাজার তিনশত স্ত্রীলোক আছে। তিনি কি আরও চাহেন?'

মেল্‌বিল্‌। Thompson what a fool you must be. The Scriptures, the religious book of the Nawab, says that a man must have as many women as there are stars in the sky. 'টমসন তুমি কি নির্বোধ। নবাবের ধর্ম পুস্তকে লিখিত আছে যে, আকাশে যত তারা আছে পুরুষকে তত স্ত্রী বিবাহ করিতে হইবে।

টমসন। But the exact number of stars has not yet been ascertained. The best astronomer of our days have failed to ascertain it. How is the Nawab to know the exact number he requires according to his Scriptures. 'কিন্তু স্বর্গে কত তারকা আছে তাহা এখন পর্যন্তও অবধারিত হয় নাই। বর্তমান সময়ের প্রধান প্রধান জ্যোতির্বিদ্‌ পণ্ডিতগণ এই বিষয় অবধারণ করিতে পারেন নাই। তবে নবাব

কিরূপে ঠিক করিবেন যে তাঁহাদের ধর্ম্মপুস্তক অনুসারে তাহার কত স্ত্রীলোক রাখিতে হইবে।

মেলবিল। So the best Persian scholar, our Governor General Warren Hastings, has not yet been able to ascertain the exact number of women whom Nawab Meer Jaffer had kept in his seraglio. In both the cases the number must be without end. 'আমাদের গবর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস পারস্য ভাষায় অত্যন্ত পণ্ডিত। কিন্তু নবাব মীরজাফরের কতগুলি বেগম ছিল, তাহা আজ পর্যন্ত তিনি নির্ণয় করিতে পারেন নাই। স্বর্গের তারকার সংখ্যাও অনির্দিষ্ট। নবাবদের বেগমের সংখ্যাও চিরকাল অনির্দিষ্ট থাকিবে।'

টমসন। Dear Melville, I do not believe what you say is written in the scriptures. You have never read the book. Have you? 'প্রিয় মেলবিল আমার বিশ্বাস হয় না যে তুমি যাহা বলিলে তাহা ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে। তুমি কখনো সেসব পাঠ কর নাই। তুমি কি নিজে সেগুলি পাঠ করিয়াছ?'

মেলবিল। That drummer boy, Hossunali Khansama's son, told me it is written in the scriptures that a man must have as many women as there are stars in the sky. My khansama Hossunali must be a great Arabic scholar. He says his prayer six times a day, and his son, the drummer boy, must have given a very faithful account of the scriptures. 'আমার খানসামা হোসেন আলির পুত্র সেই দুন্দুভিওয়ালা বালক আমাকে বলিয়াছে যে, গ্রন্থে লিখিত আছে, আকাশে যত তারা আছে এক এক পুরুষের তত স্ত্রী বিবাহ করা উচিত। আমার হোসেন আলী খানসামা অবশ্যই আরব্য ভাষা ভাল জানে। সে দিনে ছয় বার প্রার্থনা করে। তাহার পুত্র অবশ্য প্রকৃত কথাই বলিয়াছে।'

টমসন। Does that drummer boy teach you the holy book? Do you often read it with him? 'সেই দুন্দুভিওয়ালা বালক কি তোমাকে সেগুলি পড়ায়? তুমি কি তাহার সঙ্গে একত্রে সেগুলি পাঠ কর।'

মেলবিল। I never bother my head with them. Yesterday when we captured nearly thirty Rohilla women and dragged them naked to the Nawab's camp the Nawab made them over

to the soldiers, saying that he has already kept one hundred women, and at present he wanted no more. Out of those thirty women three were brought to me by that drummer boy. I told him I would not keep more than one. The boy entreated me to keep all the three, and said, 'Hazoor keep them all. It is written in the scriptures that a man must have as many wives as there are stars in the sky. 'আমি কখনো কোনো গ্রন্থ পাঠ করি না। ওসব আমার ভালো লাগে না। গত কল্য আমরা প্রায় ত্রিশ জন রোহিলা স্ত্রীলোককে ধরিয়া একেবারে বিবস্ত্রাবস্থায় নবাবের তাম্বুতে লইয়া গিয়াছিলাম। নবাব বলিলেন যে, তিনি এই মাত্র একশত স্ত্রীলোক রাখিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার আর স্ত্রীলোকের প্রয়োজন নাই। তিনি তখন সে ত্রিশজন স্ত্রীলোক সৈন্যদিগকে দান করিলেন। তাহাদিগের মধ্য হইতে তিনজন স্ত্রীলোক সেই দুন্দুভিওয়ালা বালক আমার নিকট আনিয়াছিল। আমি বলিলাম যে একজনের অধিক আমি রাখিব না। তখন সে বালক বলিল, "হুজুর তিনজনই রাখুন। গ্রন্থে লিখিত আছে, আকাশে যত তারা আছে, এক এক পুরুষের তত স্ত্রী রাখা কর্তব্য।'

টমসন। Then that must be an excellent book, an extraordinary good book. Fling away our scriptures. Down with that one. In this hot climate we must all follow the book of this country. 'তবে এগুলি তো বড় ভালো পুস্তক। দূর হউক আমাদের নিজস্ব পুস্তক। চুলোয় যাউক ওসব। এ উষ্ণ দেশে আমরা সকলে এ দেশের লিখিত ধর্মাবলম্বন করিব।'

যখন টমসন এবং মেলবিল পরস্পরের সহিত এইরূপ কথাবার্তা বলিতেছিলেন, তখন স্থানান্তরে অন্যবিধ দৃশ্য সমুপস্থিত হইল। সেখানে অন্য প্রকারের কথাবার্তা হইতেছিল।

হাফেজের স্ত্রী এবং কন্যার প্রকোষ্ঠে লেফ্টেন্যান্ট টমসন, এনসাইন জর্জ, আবেদা আলি জমাদার এবং অমরসিংহ এই চারিজন প্রবেশ করিয়াছিল। লেফ্টেন্যান্ট টমসন, হজোৎ খাঁ এবং এরফান্ আলি প্রভৃতি দশ-বিশ জন গৃহের জিনিস-পত্র অপহরণ করিতেছিল। এতদ্ভিন্ন অপরাপর সিপাহীগণের মধ্যে কেহ বাহির খণ্ডে বসিয়া তাম্রকূট সেবন পূর্বক পথশ্রান্তি দূর করিতে লাগিল, কেহ বা এদিক ওদিক গমনাগমন করিতে লাগিল।

নাদের আলী জমাদার হাফেজের স্ত্রীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া অনেকক্ষণ

সেখানে ছিল না। লেফ্‌টেন্যাণ্ট টমসনের আদেশানুসারে সে পালকি বেহারা সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত বাহিরে চলিয়া গেল। কেবল লেফ্‌টেন্যাণ্ট টমসন, মেলবিল এবং অমরসিংহই প্রকোষ্ঠ মধ্যে বসিয়া রহিলেন।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি কাহাকেও অত্যাচার করিতে দেখিলে অমরসিংহের হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইত। অমরসিংহ প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিয়া হাফেজ-নন্দিনীর লাবণ্যময়ী সরলতা-পরিপূর্ণ পবিত্র মুখকমল দর্শনে একেবারে বিস্মিত হইল। সে অনিমেষ নেত্রে স্পন্দহীন পুত্তলিকার ন্যায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, জগন্মোহিনী মূর্তি এই স্বর্গীয় প্রতিমা বোধ হয় পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। কিন্তু ইহার ভাবী দুরবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া অমরসিংহের হৃদয় বড়ই ব্যথিত হইল। এইরূপ পবিত্র মূর্তি যে নর-পিশাচ কামাসক্ত নবাব সুজাউদৌল্লার হস্তে সমর্পিত হইবে, এ চিন্তা তাহার একেবারে অসহনীয় হইয়া উঠিল। অমরসিংহ তখন বারম্বার আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, 'সত্য সত্যই কি সংসারে পরমেশ্বর নাই? পরমেশ্বর আছেন ইহা বলি কি প্রকারে? তিনি থাকিলে ঈদৃশ দেববালাকে এই প্রকার বিপন্নাবস্থায় কখনো পরিত্যাগ করিতেন না। ইহার পবিত্র মুখকমল দেখিলে মানুষের হৃদয়ে ইহার প্রতি স্নেহ এবং দয়ার সঞ্চার হয়; ইহাকে নরপিশাচদিগের অপবিত্র স্পর্শ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রাণ বিসর্জন করিতে ইচ্ছা হয়। তবে ঈশ্বর পরম দয়াবান হইয়া কি প্রকারে ইহাকে পরিত্যাগ করিলেন? বোধ হয়, যদি এ সংসারে কোনো ঈশ্বর থাকেন, তিনি দয়াময় নহেন। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি সর্বশক্তিমান না হইলে, ঈদৃশ অলৌকিক রূপলাবণ্য, ঈদৃশ পবিত্রভাব একাধারে সংঘটিত হইত না। সর্বশক্তিমান না হইলে, এই দেবীর ন্যায় রূপবতীকে কখনো সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইতেন না। কিন্তু তবে কি ঈশ্বর অত্যন্ত নিষ্ঠুর? শাস্ত্রকারেরা তো তাঁহাকে পরম দয়াল বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। তবে কি শাস্ত্র মিথ্যা? না—শাস্ত্র কখনো মিথ্যা নহে। শ্রীনিবাস পণ্ডিত যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সত্য। মানুষকে মানুষ রক্ষা করিবে, এই অভিপ্রায়ে ঈশ্বর প্রত্যেক মনুষ্যের মনে দয়া এবং স্নেহ প্রদান করিয়াছেন। বিপদ হইতে মনুষ্যকে রক্ষা করিবার উপায় তিনি পূর্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। তবে আর ঈশ্বরে দোষারোপ করি কেন? যে পরমেশ্বর শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে মাতৃস্তন্যে দুগ্ধ প্রদান

করিয়াছেন, তিনি নিষ্ঠুর ইহাও কি সম্ভবপর? মানুষ বিপদে পড়িলে অন্যান্য লোক তাহার উদ্ধার করিবে, ইহাই ঈশ্বরের উদ্দেশ্য। কিন্তু এ সংসারে মানুষ মনুষ্য-প্রকৃতি ভ্রষ্ট হইয়া, পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিতে বিরত থাকে। প্রত্যেকে আপন আপন কর্তব্য লঙ্ঘন করে; সুতরাং পরিণামে তাহাদিগকে আপন আপন কর্মফল ভোগ করিতে হয়।'

অমরসিংহ একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছে। লেফ্‌-টেন্যাণ্ট টম্‌সন এবং মেলবিল্‌ পূর্বোল্লিখিত ধর্মগ্রন্থের প্রণালীতে ব্যাখ্যা করিতেছেন। কখন কখন হস্ত-পদাদি সঞ্চালনপূর্বক বীররসে প্রমত্ত হইয়া কথা বলিতেছেন। হাফেজ-নন্দিনী টম্‌সন্‌ এবং মিলবিল্‌কে উচ্চৈঃস্বরে বাদানুবাদ করিতে দেখিয়া একটু ভীত হইলেন। ইহারা ইংরাজিতে কথা-বার্তা বলিতেছিলেন ইঁহাদের কোন কথা তাঁহার বুঝিবার সাধ্য ছিল না। কিন্তু ইঁহাদের ভাব ভঙ্গী দর্শনে তাঁহার সর্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। তিনি একটু সরিয়া যাইয়া আপন মাতার নিকটে দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধা হাফেজ-পত্নী নিঃশঙ্ক হৃদয়ে বসিয়া আছেন। ভীতি ভাবনাকে তিনি এজন্মের মতো বিদায় দিয়াছেন। কন্যাকে ভয়ে কাঁপিতে দেখিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 'ভয় কি বাছা! মৃত্যু সকল দুঃখ যন্ত্রণা শেষ করিবে। সত্বরই এই দুঃখ কষ্টের অবসান হইবে মৃত্যুর ঔষধ তো আমাদের সঙ্গেই রহিয়াছে।'

বৃদ্ধার এই কথা টম্‌সন কিম্বা মেল্‌বিল্‌ শুনিতে পাইলেন না। কিন্তু অমরসিংহের কর্ণে এই শব্দ কয়েকটি প্রবেশ করিল। অমরসিংহ রোহিলা-দিগের ভাষা বড় বুঝিত না। কিন্তু বৃদ্ধার এই কথা কয়েকটির অর্থ সহজেই তাহার উপলব্ধি হইল।

'মৃত্যু সকল দুঃখ কষ্ট শেষ করিবে' এই কথাটি যেন অমরসিংহের নিদ্রা ভঙ্গ করিল। অমরসিংহ ঘোর মোহ নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইল।

সে তখন আপন মনে মনে বলিল, 'এ তো ঠিক কথা। মৃত্যু সংসারের সকল কষ্ট, সকল যন্ত্রণা দূর করিতে পারে। কিন্তু তবে আমি মৃত্যুকে কেন আলিঙ্গন করি না? এই অনিত্য দেহে কেন আমি এই স্বর্গীয় বালা হাফেজ-নন্দিনীর উদ্ধারার্থে বিসর্জন করি না? তাহা হইলে একদিকে মৃত্যু আমার সকল কষ্ট, সকল যন্ত্রণা দূর করিবে। পক্ষান্তরে যে অকিঞ্চিৎকর অনিত্য দেহ রোগাক্রান্ত হইয়া এখনই পতিত হইতে পারে, যে অনিত্য দেহ মুহূর্তের নিমিত্তও আমার রক্ষা করিবার সাধ্য নাই, সেই অকিঞ্চিৎকর দেহের

বিনিময়ে এইরূপ মহদুদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইবে। আমি রাক্ষসের হস্ত হইতে রমণীদ্বয়কে রক্ষা করিবার নিমিত্ত নিশ্চয়ই জীবন বিসর্জন করিব। প্রতিজ্ঞা করিলাম এ জীবন বিসর্জন করিব।'

'আমার এ জীবন ধারণে কোনো ফল নাই। আমার হৃদয় তো অহর্নিশি শোকে দগ্ধ হইতেছে। এ সংসারে রাজ্যপদ প্রাপ্ত হইলেও তো আমি কখনো সুখী হইব না। পিতা-মাতার শোক, স্ত্রীর শোক, ভগ্নীর শোক সর্বদাই আমাকে অসহনীয় যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে। পরে যিনি পিতৃস্থানীয় হইয়া আমার জীবন রক্ষা করিলেন, সাধ্যানুসারে আমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, যাঁহার প্রসাদে এই অস্ত্র শিক্ষা লাভ করিয়াছি, তিনিও সে বৎসর বক্সারের যুদ্ধে আহত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। এ অবস্থায় আমার এই পাপ জীবন ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। কোনো এক সৎকার্যে এ জীবন উৎসর্গ করিতে পারিলেই চরমে সদ্গতি লাভ হইবে। বিশেষতঃ যদি পিতা মাতা, স্ত্রী এবং ভগ্নীর মৃত্যু হইয়া থাকে, তবে ইহলোক পরিত্যাগ মাত্রেই তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ লাভ করিব। হায়! হায়! এমন দিন কি আমার কখনো হইবে, যে, আবার সেই স্নেহময়ী জননীর মুখ দেখিতে পাইব? তখন মার পদতলে পড়িয়া বলিব, 'মা তোমার সেই হতভাগ্য সন্তান প্রাণের ভয়ে নরপিশাচের হস্ত হইতে তোমাকে রক্ষা করিবার চেষ্টাও করে নাই।" মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, অমরসিংহ ক্ষিপ্তের ন্যায়, অথবা স্বপ্নাবস্থাপন্ন লোকের ন্যায় মা মা বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল।

হাফেজের পত্নী আশ্চর্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ইহাদিগের চারি চক্ষু একত্র হইবামাত্র পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সদ্ভাব উপস্থিত হইল। মনুষ্যদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রেম ও ভালবাসা অস্পষ্টভাবে এবং অজ্ঞাতসারে পরস্পরের হৃদয় আকর্ষণ করে। হাফেজের স্ত্রীর মনে হইল, যে ইনি শত্রু নহেন, বন্ধু হইবেন।

অমরসিংহ আবার আত্মসংযম পূর্বক ভাবিতে লাগিল, 'ঠিক কথা, মৃত্যুই আমাকে কেবল সুখী করিতে সমর্থ। বিশেষতঃ এই নিরাশ্রয়া হাফেজ-নন্দিনী এবং হাফেজ-পত্নীর উদ্ধারার্থ জীবন বিসর্জন করিলেই মৃত্যু আমার নিমিত্ত স্বর্গের দ্বার উন্মোচন করিবে। ইহাতেই আমার পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।'

কিন্তু কি প্রকারে ইহাদিগের উদ্ধার করিব? আমরা প্রায় পঞ্চাশ জন

সৈনিক পুরুষ ইহাদিগকে ধৃত করিতে আসিয়াছি। ইহার মধ্যে আমি ভিন্ন আর সকলেই ইহাদিগকে নর পিশাচ সুজাউদ্দৌলার নিকট লইয়া যাইতে চেষ্টা করিবে। এই উনপঞ্চাশ জন লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া, কি ইহাদিগকে উদ্ধার করিতে পারিব? পারিব বই কি? পিতার নিকট যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে ইহার তিন-চারিটা ইংরাজকে এখনই আমি যুদ্ধে যমালয়ে প্রেরণ করিতে পারি। কিন্তু তাহা হইলেও তো ইহাদিগকে উদ্ধার করিতে পারিব না। ইহারা স্ত্রীলোক, বিশেষতঃ উচ্চকুলোদ্ভবা। আমার সঙ্গে পদব্রজে গমন করিয়া ইহারা পলায়নে সমর্থা হইবেন না। এখন দেশের স্থানে স্থানে নবাব-সৈন্য এবং ইংরাজ-সৈন্য বিচরণ করিতেছে। এই পঞ্চাশ জনকে পরাস্ত করিতে পারিলেও তাহাতে কোনো লাভ নাই। বন্দুক এবং কামান লইয়া, দশ-বারজন সৈন্য একত্র হইলেই, অনায়াসে আমার প্রাণ-বিনাশ করিয়া ইহাদিগকে ধৃত করিতে পারিবে। কামান, বন্দুকই ইংরাজ সৈন্যের একমাত্র বল ভরসা। অসি-যুদ্ধ কিম্বা শূল-যুদ্ধ হইলে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতাম।'

'কিন্তু এখানে এইরূপ চেষ্টা করা বৃথা। তাহাতে কেবল আমার প্রাণ বিনাশ হইবে, ইহাদিগের কোনো উপকার হইবে না। উনপঞ্চাশ জন লোকের হস্ত হইতে একাকী ইহাদিগকে উদ্ধার করা দুঃসাধ্য। তবে কি করিব? ইহাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া, কোনো একটা উপায় অবধারণ করিতে পারিতাম, তবেই কৃতকার্য হইবার কতক সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ইহারা আমার কথা বুঝিবেন না। আমিও ইহাদিগের সকল কথা বুঝিতে পারিব না। বিশেষতঃ আমি ইংরাজ সৈন্যের সঙ্গে ইহাদিগকে ধৃত করিতে আসিয়াছি। ইহারা আমাকেও শত্রু বলিয়া মনে করিতেছেন। আমি কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ইহারা কখনো আমার কথার উত্তর প্রদান করিবেন না। ইহারা নবাবের স্ত্রী, নবাবের কন্যা। দুরবস্থায় পড়িয়াছেন বলিয়া কি এখন আমার ন্যায় একজন ক্ষুদ্র সিপাহীর সহিত কথা বলিবেন? আমি একজন সাধারণ সিপাহী। আমার ন্যায় কত শত সিপাহী ইহাদিগের গোলাম ছিল। তবে কি করিব? ইহাদিগের সঙ্গে কথা বলিবার উপায় কি? অন্যান্য যে সকল সিপাহী ইহাদিগের কথা বুঝিতে পারিবে, যাহারা আমার মনের ভাব ইহাদিগকে বুঝাইয়া বলিতে পারিবে, তাহাদিগের নিকট আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে সমুদয় চেষ্টাই বিফল হইবে। এখনই আমার

হস্ত পদ বন্ধন নবাবের নিকট লইয়া যাইবে। হায় কি বিপদ! আমাদের সঙ্গে এমন কি একজন লোকও নাই যাহাকে বিশ্বাস করিয়া আমি আমার মনের কথা বলিতে পারি?'

'ধন্য পরমেশ্বর! আছে! আছে! বৃদ্ধ ছত্রসিংহ আমাদের সঙ্গে আসিয়াছে। ছত্রসিংহ এদেশের কথা বিলক্ষণ জানে। ছত্রসিংহের হৃদয় একেবারে পাষাণ মণ্ডিত নহে। বিশেষতঃ বক্সারের যুদ্ধে আমি তাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছি। সংগ্রাম ক্ষেত্রে সে আহত হইয়া পড়িলে, আমি দুই ক্রোশ পথ তাহাকে স্কন্ধে করিয়া নিয়া গিয়াছিলাম। সকলেই সংগ্রাম ক্ষেত্রে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। তবে ছত্রসিংহ কি এত অকৃতজ্ঞ হইবে? আমার অভিপ্রেত বিষয় ব্যক্ত করিয়া, সেও কি আমার প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করিবে? কখনো না। ছত্রসিংহ অর্থলোভী নহে। সে কখনো এত অকৃতজ্ঞ হইবে না।'

এইরূপ চিন্তা করিয়া, অমরসিংহ হাফেজের পত্নীর প্রকোষ্ঠ হইতে বাহিরে আসিয়া, ছত্রসিংহের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অন্যান্য সৈন্যগণ হাফেজের গৃহসামগ্রী অপহরণ করিতেছে। কিন্তু ছত্রসিংহ অর্থলোলুপ নহে। ছত্রসিংহের একটু গাঁজা খাওয়ার অভ্যাস ছিল। সে বাহির বাড়িতে অন্যান্য লোক হইতে একটু দূরে বসিয়া গাঁজায় দম দিতেছে। অনেকক্ষণ পরে গাঁজায় দম দিয়াছে, তাহার মন বড়ই প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

অমরসিংহ ছত্রসিংহের নিকট যাইয়া পশ্চাৎ হইতে তাহার স্কন্ধের উপর হস্ত স্থাপন করিল। ছত্রসিংহ গাঁজায় একেবারে নিমগ্ন ছিল। চমকিয়া উঠিয়া, চাহিয়া দেখে যে অমরসিংহ তাহার স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়াছে। অমরসিংহকে ছত্রসিংহ প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভালবাসে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া তাহাকে মনে করে। ছত্রসিংহ তখন গাঁজার কল্কী কাছে রাখিয়া, মনের আমোদে অমরসিংহের গলা জড়াইয়া ধরিয়া গান করিয়া উঠিল।

'ভাই বুঝলে নারে গাঁজার মজা,
কসে দম্ দিলে লোক হয় রাজা।'

অমরসিংহ বলিল, 'দাদা, তোমার নিকট একটা কথা বলিতে আসিয়াছি, কিন্তু ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ জানিয়া প্রতিজ্ঞা কর, একথা আহারও নিকট প্রকাশ করিবে না।'

ছত্রসিংহ। ভাই তোর কাছে আমার প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে? তুই একবার আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিস্। আমি তোর জন্য প্রাণ দিতে পারি।

অমরসিংহ। ভাই তুমি হাফেজ রহমত খাঁর কন্যাকে এবং স্ত্রীকে দেখিয়াছ? অন্দরের মধ্যে তাঁহারা ধৃত হইয়াছেন। লেফ্‌টেন্যান্ট টমসন এবং মেলবিল সাহেব সেখানে বসিয়া আছেন।

ছত্রসিংহ। দেড় প্রহরের মধ্যে একবারও গাঁজা খাই নাই। আমি এখন গাঁজা ফেলিয়া সেই স্ত্রীলোক দেখিতে যাইব? তুই এক মজার লোক, আমি কেন তা দেখিতে যাব?

অমরসিংহ। দাদা, হাফেজের কন্যার ন্যায় এমন পরমা সুন্দরী আর কোথাও দেখি নাই। মুখখানি যেন ধর্মভাবে পরিপূর্ণ। বোধ হয় ইহার চরিত্র এবং হৃদয় অত্যন্ত পবিত্র হইবে।

ছত্রসিংহ। নবাবের স্ত্রী, নবাবের মেয়ে, দুবেলা গরম জলে স্নান করে; ইহাতেও পবিত্র হইবে না?

অমরসিংহ। ভাই হাফেজের স্ত্রীকে দেখিলে তাঁহাকে আমার মা বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা হয়। ইহাদিগের মায়ে ঝিয়ের হৃদয় যেন দয়া ধর্মে পরিপূর্ণ।

ছত্রসিংহ। বড় মানুষের মেয়ে অনেক টাকা কড়ি আছে। কাজেই সকলকে দয়া করে।

অমরসিংহ। দাদা, হাফেজের কন্যাটিকে সত্য সত্যই দেববালা বলিয়া বোধ হয়। আমি ইহাকে দেখিবামাত্রই আমার মনে হইল যেন ইনি আমার কনিষ্ঠ সহোদরা। এই প্রকার দেববালাকে আমরা কামাসক্ত নরপিশাচ সুজাউদ্দৌলার হস্তে সমর্পণ করিব? ইহাদিগকে নবাবের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার কি কোনো উপায় নাই?

ছত্রসিংহ। ভাই ও কথা মুখেও আনিস্ না। তাহলে নিশ্চয়ই তোর মাথা কাটা যাবে। একেই তোর বড় বদনাম হইয়াছে। শালা এরফান আলি আর জোবান আলি সকলেই নবাবের নিকট বলিয়াছে, যে তুই টাকা খেয়ে অনেক রোহিলা স্ত্রীলোককে ছাড়িয়া দিয়াছিস, আর অনেক স্ত্রীলোকের পলায়নের সুবিধা করিয়া দিয়াছিস। নবাব তোমাকে চিনে না, তাই তোমার রক্ষা; কিন্তু নবাব জেনারেল চ্যাম্পিয়ন সাহেবকে তোমার বরখাস্তের নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছেন। তুমি নেহালসিংহের পুত্র। যেরূপ ক্ষমতা, এতদিনে সুবেদার হইতে পারিতে।

অমরসিংহ। ভাই আমি সুবেদারী চাই না, আমার নাম কাটিয়া দিলে এখনই চলিয়া যাইব। তোমাকে আমার একটা কাজ করিয়া দিতে হইবে।

এই সময়ে ছত্রসিংহ গাঁজায় আর-এক-দম দিয়া বলিল—'ভাই তোর একটা কাজ কেন? তোর পাঁচটা কাজ করিয়া দিব। এ প্রাণ তোর জন্য দিব। মরণকালে আমার যে দুই-চারিটা টাকা থাকিবে, তোকে সব দিয়া যাইব। তুই ভিন্ন আমার আর কে আছে?' আবার গানের স্বরে চীৎকার করিয়া বলিল,

'আমার কে আছে এ ত্রিভুবনে
গাঁজা আর ভাই অমর বিনে'

অমরসিংহ। দাদা, আমি হাফেজের স্ত্রী এবং কন্যার সঙ্গে কথা বলিতে চাই। কিন্তু আমি তো তাঁহাদের কথা বুঝি না, তাঁহারাও আমার কথা বুঝিতে পারিবেন না। আমি যাহা যাহা বলিব, তুমি তাঁহাদিগকে তাহা বুঝাইয়া বলিবে। আবার তাঁহারা যা বলেন, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিবে।

ছত্রসিংহ। তাঁহাদিগের সঙ্গে কি কথা বলিতে চাহ?

অমরসিংহ। এখানে তাঁহাদিগের পলায়নের সুবিধা করিয়া দিবার কোনো উপায় নাই। লক্ষ্ণৌ নবাবের নিকট ইঁহাদিগকে উপস্থিত করিলে পর নিশ্চয়ই ইঁহাদিগের পলায়নের একটা সুবিধা করিয়া দিতে পারিব। তোমাকে এই বিষয়ে ইঁহাদিগের সঙ্গে পরামর্শ করিতে হইবে।

ছত্রসিংহ। ভাই তুমি কম পাত্র নহ। এই সকল দুঃসাহসিক কার্যে প্রবেশ করিয়া, আপন প্রাণ হারাইবে। চুপ কর, ও সকল কাজে হাত দিতে নাই।

অমরসিংহ। ভাই আমি প্রাণ দিয়াও ইঁহাদিগের উপকার করিব। যাহাতে ইঁহাদিগের ধর্ম রক্ষা হয়, তাহার চেষ্টা করিব। সুজাউদ্দৌলা ইঁহাদিগের ধর্ম নষ্ট করিতে উদ্যত হইলে, আমি নিশ্চয়ই তাহার প্রাণ বিনাশ করিব।

ছত্রসিংহ। তুই পাগল, তাই কেবল ধর্ম ধর্ম করিতেছিস্। এদের আবার ধর্ম কি? এক এক জন সাত বার নিকা করে। তাদের আবার! ধর্ম এ দুই জন লক্ষ্ণৌ গেলেই নবাবের বেগম হইয়া পড়িবে। তবে মা ঝি দুইটাকে একত্রে নিকা না করিলেও পারে। বুড়ীটাকে

খোর্দ মহলে * রাখিবে। আর ঐ মেয়েটাকে কয়েক দিন বড় অন্দরে রাখিয়া পরে খোর্দ মহলে পাঠাইয়া দিবে।

অমরসিংহ। দাদা, সকল পরিবার এক রকম নহে। নবাবদের নাম শুনিলেই তোমার ঘৃণার উদয় হয়। আমি নিশ্চয় জানিতে পারিয়াছি, এই দুইটি স্ত্রীলোক মনে মনে স্থির করিয়াছেন, নবাব ইহাদিগের ধর্ম নষ্ট করিতে উদ্যত হইলে, ইহারা আত্মহত্যা করিয়া ধর্ম রক্ষা করিবেন।

ছত্রসিংহ। তাহা হইতেও পারে। রোহিলা স্ত্রীলোকগুলি বোধ হয় আমাদের নিজেদের ঘরের মেয়ের মতোন হইবে। সে দিন আমরা যে ত্রিশটা স্ত্রীলোককে ধৃত করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যের দশ-বারটা স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করিয়াছে। মেল্‌বিল্ সাহেবের ঘরে যে তিনটা ছিল, তাহারাও আত্মঘাতিনী হইয়াছে।

অমরসিংহ। তুমি আমার এই কাজটি করিবে কি না বল ?

ছত্রসিংহ। গোপনে কথা বলিবার সুযোগ হইলে, আমার কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু এরফান আলি কি জোবান আলি সিপাহী জানিতে পারিলে সর্বনাশ হইবে। ইহারা অন্যের বদনাম করিয়া, শীঘ্র শীঘ্র যাহাতে সুবেদারী পাইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা নাই, যে আপন ক্ষমতাবলে সুবেদারী পাইবে। কেবল লোকের বদনাম করিয়া জেনারেল সাহেবকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করে।

অমরসিংহ। গোপনে কথা বলিবার এক উপায় আছে। নবাব ইহাদিগকে পালকিতে করিয়া লইয়া যাইতে হুকুম দিয়াছেন। তুমি এবং আমি ইহাইদিগের পালকির কাছে থাকিব। বেহারাগণ পালকি রাখিয়া মাঝে মাঝে যখন বিশ্রাম করিবে, তখন অনায়াসে ইহাদের সহিত কথাবার্তা বলিতে পারিব।

ছত্রসিংহ। এ বেশ ফন্দি হইয়াছে। এ দেখ, নাদের আলি চারিখানা পালকি লইয়া আসিয়াছে।

এই সময় নাদের আলি সিপাহী চারিখানা পালকি এবং বেশ পঁচিশ জন বেহারা সহ আসিয়া উপস্থিত হইল। নবাব সুজাউদ্দৌলা হাফেজ রহমতের স্ত্রী ও কন্যাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত সৈন্য প্রেরণ কালে, তাহাদিগকে হুকুম

* নবাবদিগের উপপত্নী যে মহলে থাকে, তাহাকে খোর্দ মহল বলে।

করিয়াছিলেন, যে, হাফেজের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে পালকিতে করিয়া আনিতে হইবে। সৈন্যদিগকে আরও বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, যে, তাহাদিগকে কথনো বিবস্ত্রা করিয়া, তাহাদিগের প্রতি কেহ অত্যাচার করিলে, তিনি তাহার প্রাণদণ্ড করিবেন। সুজাউদ্দৌলার এইরূপ আদেশ করিবার বিশেষ কারণ ছিল। সুজাউদ্দৌলার মাতা সাদৎ উন্নিসা বেগম দিল্লীর অতি সম্ভ্রান্ত উমরা সাদত্ আলি খাঁর কন্যা। উক্ত সাদত্ আলির পরিবারের কোনো এক রমণীর সহিত হাফেজের কোনো এক পুত্র কি পৌত্রের বিবাহ হইয়াছিল। ইহাতে অযোধ্যার উজীর এবং কোন কোন রোহিলা মহিলার মধ্যে আত্মীয় কুটুম্বিতা ছিল।

নাদের আলি পালকিসহ উপস্থিত হইলে পর টমসন সাহেব হাফেজ রহমতের কন্যাকে নির্দেশ করিয়া বলিলেন,—'O! the young lady is crying. What a handsome girl she is. I wish the Nawab would make her over to me. 'এ যুবতী কাঁদিতেছে। কি পরমাসুন্দরী যুবতী। নবাব ইহাকে আমায় দেয়, তবে বড়ই ভালো হয়।'

এই বলিয়া দুর্বৃত্ত টমসন হাফেজের কন্যার গাত্রস্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে, হাফেজের স্ত্রী তৎক্ষণাৎ হস্তস্থিত তরবারি উত্তোলন করিলেন। এদিকে পশ্চাৎ হইতে মেলবিল টমসনকে ধরিয়া বলিল, 'What are you doing? What are you doing? The Nawab will certainly put us to death. He has given us strict order not to touch the body of any of these ladies. 'তুমি কি করিতেছ—তুমি কি করিতেছ? নবাব আমাদের প্রাণদণ্ড করিবেন। নবাব ইহাদিগের গাত্রস্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।'

ইহার পর নাদের আলি হাফেজের স্ত্রী কন্যা এবং অন্যান্য চারি-পাঁচজন স্ত্রীলোককে পালকিতে আরোহণ করিতে বলিল। কন্যার সহিত পথে কথা বার্তা বলিবেন এই অভিপ্রায়ে, হাফেজের স্ত্রী, কন্যার হাত ধরিয়া এক

* পক্ষপাতী ইংরাজ ইতিহাস লেখক বলেন রোহিলা যুদ্ধের পর রোহিলা রমণীদিগের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার হয় নাই। হাফেজের স্ত্রী এবং কন্যাকে পালকিতে করিয়া নিয়া ছিল। কিন্তু পরাজিত শত্রুর স্ত্রী কন্যাকে ধৃত করাও কি অত্যাচর নহে? আর রোহিলখণ্ডের অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগকে বিবস্ত্রাবস্থায় যে সুজাউদ্দৌলার নিকট ধৃত করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহা কি সত্য নহে?

পালকিতে উঠিলেন। সৈন্যগণ অনেকেই পালকির অগ্রে অগ্রে চলিল। কেবল অমরসিংহ এবং ছত্রসিংহকে পালকির পশ্চাতে যাইতে দেখিয়া, লেফ্‌টেন্যান্ট টমসন ইহাদিগকে পালকির পাহারায় নিযুক্ত করিলেন। অমরসিংহ যা আশা করিয়াছিল তাহাই হইল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পথে পথে

অমরসিংহ হিন্দি কিম্বা উর্দু ভাষাতে শুদ্ধরূপ কথাবার্তা বলিতে পারিত না, এবং লক্ষ্ণৌ প্রদেশের হিন্দি কি উর্দু সম্যকরূপে বুঝিতে পারিত না। অমরসিংহের পিতা নেহালসিংহের বাড়ি প্রয়াগে (এলাহাবাদে) ছিল। নেহালসিংহের পুত্র যে হিন্দি কি উর্দু বুঝিতে পারে না, এ বড় আশ্চর্যের বিষয়। সুতরাং এই বিষয় সম্বন্ধে রেজিমেণ্টের মধ্যে নানা প্রকার কথাবার্তা হইত। কেহ কেহ বলিত, মুর্শিদাবাদে নেহালসিংহের একটা বাঙালী মেয়ের সঙ্গে আসক্তি ছিল। সেই বাঙালী স্ত্রীলোকটার গর্ভে অমরসিংহের জন্ম হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলিত, নেহালসিংহ সেরূপ লোক ছিলেন না। তিনি বড় ধার্মিক লোক, বড় শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার কি এইরূপ কোনো চরিত্র দোষ ছিল? অমরসিংহ তাঁহার পালিত পুত্র হইবে। এরফান্ আলি প্রভৃতি বলিত,—'নেহালসিংহের জামাতা রণবীরসিংহ পলাশীর যুদ্ধে নিহত হইলে পর, নেহালসিংহ গোপনে তাঁহার কন্যাকে অমরসিংহের সঙ্গে নিকা দিয়াছে। এই কথা প্রকাশ হইলে তাহার জাতি নষ্ট হইবে, সেই জন্য অমরসিংহকে আপন পুত্র বলিয়া গৃহে রাখিয়াছিল। আসল কথা অমরসিংহ নেহালসিংহের জামাতা।'

এরফান্ আলির এইরূপ বলিবার আর কোনো কারণ ছিল না। অমরসিংহ নেহালসিংহের কন্যাকে অত্যন্ত ভালোবাসিত, সেই জন্য এরফান্ আলি এইরূপ বলিত। কিন্তু এ সংসারে যাহার যেরূপ চক্ষু সে অপরকে সেইভাবে দেখে। চোর মনে করে, যে জগতের সমুদয় লোকই চোর। সাধু মনে করেন, যে পৃথিবীর সকল লোকই সাধু। এরফান্ আলি যেরূপ লোক তাহার মনের ভাব তদনুরূপই হইবে। ইহাতে আমরা এরফান্ জানিবে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিতে পারি না।

অমরসিংহের পরিচয় পাঠকগণ পরে জানিতে পারিবেন। এই স্থানে সে সকল বিষয় উল্লেখ করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। হাফেজের পত্নীর সঙ্গে তাঁহার রাস্তায় যে সকল কথা হইয়াছিল, তাহাই কেবল এই অধ্যায়ে বিবৃত হইবে।

সিপাহীগণ অগ্রে অগ্রে চলিতেছে। হাফেজের পরিবারস্থ আট-নয় জন স্ত্রীলোক পালকি আরোহণে তাঁহাদিগের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিয়াছে। ছত্রসিংহ এবং অমরসিংহ পালকির সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে। অপরাহ্নে ইহারা হাফেজের গৃহ হইতে বাহির হইয়াছে। এখন প্রায় বেলাবসান হইয়া আসিয়াছে। রাত্রে ইহাদিগকে নিকটস্থ কোনো এক বাজারে অবস্থান করিতে হইবে। বেলা দুই দণ্ড থাকিতে ইহারা এক বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

লেফ্‌টেন্যান্ট টমসন বলিলেন,—'এখন অনেক বেলা আছে। এ বাজার ছাড়িয়া সম্মুখস্থ আড্ডায় যাইয়া রাত্রে অবস্থান করিব।

কিন্তু পালকি বেহারাগণ এই বাজারে পৌঁছিয়াই বৃক্ষতলে পালকি রাখিয়া বিশ্রাম করিতেছে। তাহারা বলিতেছে,—'হুজুর অন্ধকার রাত্রি, পালকি লইয়া আর চলিতে পারিব না।'

লেফ্‌টেন্যান্ট টমসন স্বীয় অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া, হি হি করিয়া হাসিতে হাসিতে, হাতের চাবুক দ্বারা দুই-তিনটা পালকি বেহারার পৃষ্ঠের উপর আঘাত করিলেন। এ চাবুকাঘাত প্রহার করিবার অভিপ্রায়ে প্রদত্ত হয় নাই। তবে ইংরাজের হাতের আঘাত, ইহাতে দুর্বল বেহারাদিগের পৃষ্ঠ হইতে শোণিত নির্গত হইতে লাগিল। বেহারা-গণ ভয়ে ও ত্রাসে এদিক-ওদিক দৌড়িয়া আত্মরক্ষা করিল। টমসন এবং টম্‌কিন খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বালক বালিকাগণ পশু-পক্ষীর গাত্রে যষ্টির দ্বারা আঘাত করিয়া যেরূপ খেলা করে, ইহারাও সেই প্রকার একটা খেলা করিলেন। কৃষ্ণবর্ণ পালকি-বেহারাগণ সাহেবদিগের নিকট এক প্রকার ক্রীড়ার সামগ্রী বই আর কি।

হাফেজের স্ত্রী এবং কন্যা যে পালকির মধ্যে বসিয়াছিলেন, অমরসিংহ এবং ছত্রসিংহ সেই পালকির নিকট দাঁড়াইয়া আছেন। পালকির দরজা রুদ্ধ। কি প্রকারে ইহাদিগের সঙ্গে কথা বলিবেন তাহাই ভাবিতেছেন।

কিছুকাল পরে অমরসিংহের শিক্ষানুসারে ছত্রসিংহ পালকির দরজার

নিকট মুখ রাখিয়া রোহিলাভাষায় বলিল,—'মা, আপনাদের কোনো বিষয়ের প্রয়োজন হইলে আমাদিগের নিকট বলিবেন। আমরা শত্রুপক্ষীয় লোক হইলেও আপনাদিগের কোনো অনিষ্ট করিব না। পথে যাহাতে আপনাদের কোনো অনিষ্ট না হয় তাহাই করিব।'

পালকির মধ্য হইতে ছত্রসিংহের কথায় কেহ কোনো উত্তর প্রদান করিলেন না। কেবল দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ শুনা গেল।

অমরসিংহের শিক্ষানুসারে ছত্রসিংহ আবার বলিল,—'মা, আমার সঙ্গে যে এই আর একটি সিপাহী আছেন, ইহার নাম অমরসিংহ। গ্রাম লুট করিবার সময় ইনি অনেকানেক রোহিলা-রমণীকে পলায়নের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। আপনাদিগকে কোনো প্রকার কষ্ট প্রদান করিতে আমরা ইচ্ছা করি না। তবে আমরা চাকর, মনিবের হুকুম আমাদিগকে মান্য করিতে হয়, তাই আপনাদিগকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি। আমাদের দ্বারা যদি আপনাদের কোনো বিষয়ের সাহায্য হয় তবে আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও তাহা করিব।'

ইংরাজদিগের সৈন্যের মধ্যে একজন সিপাহী গ্রাম লুট করিবার সময় যে অনেকানেক রোহিলা-রমণীকে পলায়নের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা ইতিপূর্বে হাফেজের পত্নী লোক-পরম্পরায় শুনিয়াছেন। সুতরাং তিনি অমরসিংহের নাম শুনিয়া পালকির দ্বার অল্প একটু খুলিবামাত্র সম্মুখে চাহিয়া দেখেন, যে তাঁহাদিকে ধৃত করিবার সময় যে সিপাহী তাঁহাদিগের প্রকোষ্ঠে বসিয়া অশ্রু বিসর্জন করিয়াছিল এবং স্বপ্নাবস্থাপন্ন লোকের ন্যায় একবার মা, মা, বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল, তাহাকেই ছত্রসিংহ অমরসিংহ বলিয়া নির্দেশ করিতেছে। এখন ইহাদিগের সঙ্গে কথা বলিতে হাফেজের স্ত্রীর সাহস হইল। তিনি ছত্রসিংহের কথার প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—'বিপন্নদিগকে যাঁহারা সাহায্য করেন, পরমেশ্বর তাঁহাদিগের মঙ্গল করিবেন।'

ছত্রসিংহ পূর্বের ন্যায় আবার অমরসিংহের শিক্ষানুসারে বলিল,—'মা তোমাকে আমরা আপন গর্ভধারিণীর ন্যায় মনে করি। নরপিশাচ সুজা-উদ্দৌলার হস্ত হইতে তোমাকে এবং তোমার কন্যাকে আমরা প্রাণ বিসর্জন করিয়াও রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব। কিরূপে আমরা তোমাদিগের পলায়নের সুবিধা করিয়া দিতে পারি, তাহা বল?'

ছত্রসিংহ এই কথা বলিলে পর, হাফেজের স্ত্রী এবার পালকির দরজা

একবারে খুলিলেন, এবং পরমাত্মীয় জ্ঞানে ইহাদিগের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। বেহারাগণ এবং অন্যান্য সিপাহী আপন আপন আহারের উদ্যোগ করিতেছে। পালকির নিকট ছত্রসিংহ এবং অমরসিংহ ভিন্ন আর কেহই উপস্থিত নাই।

হাফের স্ত্রী বলিলেন,—'আমাদের পলায়নের সাধ্য নাই। দেশের সর্বত্রই বিপক্ষ সৈন্যগণ বিচরণ করিতেছে। পলায়নের চেষ্টা করিলে সেই মুহূর্তেই ধরা পড়িব।'

ছত্রসিংহ। (অমরসিংহের শিক্ষানুসারে) তবে আপনাদিগের উদ্ধারের কি কোনো উপায় নাই? আপনাদিগের উদ্ধারার্থ আমাদিগকে যাহা-কিছু করিতে বলিবেন তাহাই করিব। প্রাণ বিসর্জন করিয়াও আপনাদের মান-সম্ভ্রম রক্ষা করিব।

হাফেজের পত্নী এই কথা শুনিয়া উর্ধ্বনেত্রে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্বক রোহিলাভাষায় বলিলেন,—'হে পরমেশ্বর তোমার সৃষ্ট মানুষ বিপদে পড়িয়া যখন একেবারে আশা শূন্য হয়, তখন তুমি আপন দূত প্রেরণ করিয়া বোধহয় তাহাদিগকে সান্ত্বনা কর। নহিলে বিপক্ষের সৈন্য কেন প্রাণ বিসর্জন করিয়া আমাদিগের উদ্ধারের চেষ্টা করিবে।'

তৎপরে তিনি ছত্রসিংকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন,—'বাছা! আমাদিগের এই ঘোর বিপদের সময় যে তোমরা এইরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করিলে ইহাতে পরমেশ্বর অবশ্য তোমাদিগের মঙ্গল করিবেন। কিন্তু এখন মৃত্যু ভিন্ন আর আমাদের উদ্ধারের কোনো উপায় দেখি না। তোমরা আমাদের উদ্ধারার্থ বৃথা চেষ্টা করিয়া কেন অনর্থক বিপদে পড়িবে। মৃত্যুর ঔষধ আমাদের সঙ্গেই আছে। যদি উজীর আমাদের ইজ্জৎ নষ্ট করিবার চেষ্টা করে, তবে তখন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া আপন আপন ইজ্জৎ এবং ধর্ম রক্ষা করিব।'

ছত্রসিংহ বলিলেন,—'আপনারা নিরাশ হইবেন না। আমার সঙ্গী এই অমরসিংহ বলিতেছেন, যে উজীর আপনাদিগের ধর্ম নষ্ট করিতে উদ্যত হইলে, তিনি নিশ্চয়ই উজীরের প্রাণবধ করিবেন। ইনি উজীরের অত্যাচার দর্শনে একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছেন। এখন সুযোগ পাইলেই উজীরকে যমালয়ে প্রেরণ করিবেন।'

হাফেজ-পত্নীর মুখ-কমল তখন একটু প্রফুল্ল হইল। তিনি ইচ্ছা করিলে

অনায়াসে যুদ্ধাবসানে ফায়েজউল্লার সহিত পলায়ন করিতে পারিতেন। কিন্তু স্বামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন না করিয়া রোহিলখণ্ড পরিত্যাগ করিবেন না বলিয়া সে দিন পলায়ন করেন নাই। পথে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র নবাব-সৈন্য কর্তৃক ধৃত হইল। সুতরাং পলায়নের আর সুবিধা হইল না। এখন মনে করিলে আত্মহত্যা করিয়া অনায়াসে সকল কষ্ট দূর করিতে পারেন। কিন্তু স্বামীর শত্রুকে বিনাশ না করিয়া আত্মহত্যা করিবেন না। স্বামীর শত্রুকে বিনাশ করিবেন বলিয়া স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। এ জীবনে স্বামীর শত্রু বিনাশ ভিন্ন আর তাঁহার কোনো কার্য নাই, কিন্তু এই দুঃসাধ্য ব্যাপার সাধনার্থ যে কাহারও সাহায্য পাইবেন, তাহার আশা ছিল না। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় এ বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিবার লোকও মিলিল। এখন তাঁহার আশা আরো দৃঢ়ীভূত হইল। তিনি সমুৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'বাছা! তুমি কিরূপে উজীরের প্রাণবিনাশ করিবে?'

ছত্রসিংহ। (অমরসিংহকে নির্দেশ করিয়া) ইনি বলিতেছেন যে, কিরূপে উজীরের প্রাণ বিনাশ করিবেন, তাহা এখন অবধারণ করিবার সাধ্য নাই। অবস্থানুসারে উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

হাফেজের স্ত্রী মনে মনে বলিলেন, আমিও তাহা ঠিক করিয়াছি। উজীরের গৃহে প্রবেশ করিবার পর অবস্থানুসারে তাহার বিনাশের চেষ্টা ভিন্ন পূর্বে কোনো নির্দিষ্ট উপায় অবধারণ করা যাইতে পারে না। কারণ আমরা এখনো কয়েদ অবস্থায় আছি। আমাদের কোনো স্বাধীনতা নাই। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন,—'যিনি ইচ্ছা করিলে মুহূর্তের মধ্যে সহস্র সহস্র লোক উৎপত্তি করিতে পারেন এবং সহস্র সহস্র লোক বিনাশ করিতে পারেন, তিনি এই দুষ্টকে দমন করিবার সুযোগ তোমাকে নিশ্চয়ই প্রদান করিবেন।'

ইহার পর ছত্রসিংহ বলিল,—'আপনারা এই অমরসিংহকে চিনিয়া রাখিবেন। ইহার চেহারা ভুলিবেন না। ইনি বলিতেছেন, গোপনে আপনাদের সঙ্গে থাকিয়া শত্রু বিনাশের কোনো উপায় করিবেন।'

এই সকল কথাবার্তার পর বেহারাগণ আসিয়া বাজারের একখানা ঘরের মধ্যে পালকি লইয়া গেল। লেফ্‌টেন্যান্ট টমসন স্ত্রীলোকদিগের রাত্রি বাসের জন্য সেই ঘর নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। হাফেজের পত্নীর সঙ্গিনী স্ত্রীলোকেরাও সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল।

সপ্তম অধ্যায়

পূর্ব কাপুরুষতা

ছত্রসিংহ এবং অমরসিংহ বাজারের মধ্যে অন্য একখানি গৃহে প্রবেশ করিয়া, আহারের আয়োজন করিতে লাগিল। ছত্রসিংহ ব্রাহ্মণ। নেহালসিংহও ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুতরাং নেহালসিংহের পুত্র অমরসিংহের সহিত ছত্রসিংহের একত্র আহারাদি করিবার কোনো বাধা ছিল না।

আহারান্তে ছত্রসিংহ অমরসিংহকে বলিল,—'ভাই তুমি কি সত্য সত্যই উজীরের প্রাণ বিনাশ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছ? তুমি পাগল হইলে নাকি '?

অমরসিংহ। উজীর শত শত রোহিলা রমণীর প্রতি ঘোর অত্যাচার করিতেছে। আমি পরমেশ্বরের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, উজীরের প্রাণবধ করিয়া আমার পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব—জগত অত্যাচারী শূন্য করিব।

ছত্রসিংহ। তুমি পূর্বে কি পাপ করিয়াছিলে? তুমি তো তোমার পিতার ন্যায় ধার্মিক। নেহালসিংহ কখনো কাহারো অনিষ্ট করেন নাই। তুমিও কখনো কাহারো অনিষ্ট কর না। তোমার আবার পাপ কি?

অমরসিংহ। ভাই মনুষ্যের পাপের অভাব নাই। আমরা সকলেই পাপী। কিন্তু সে সকল কথার প্রয়োজন নাই। তোমাকে যাহা বলিতেছি শুন। উজীরের প্রাণবিনাশ করিলে আমাকে নিশ্চয়ই মরিতে হইবে। আগামী কল্য কি তৎপর দিবস আমরা বিশুলি পৌঁছিব। হয়তো বিশুলি পৌঁছিবার অব্যবহিত পরেই আমার এই ব্রত পালন করিতে হইবে। সুতরাং আর অনেক দিন আমাকে এ সংসারে থাকিতে হইবে না। তোমাকে যাহা-কিছু বলিয়া যাইতে হইবে, তাহা এখনই বলিতেছি। তোমাকে আমার মৃত্যুর পর এই সকল কার্য করিতে হইবে।

ছত্রসিংহ। তুমি নিশ্চয়ই পাগল হইয়াছ। কেন তুমি এইরূপে আপন প্রাণটা দিবে। তুমি মরিয়া গেলে তোমার বিধবা ভগ্নীকে কে প্রতিপালন করিবে? নেহালসিংহ মৃত্যুকালে তাঁহাকে তোমার হাতে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন।

অমরসিংহ। সেই সম্বন্ধেই তোমার নিকট কয়েকটি কথা বলিয়া যাইব। আমি এ প্রাণ নিশ্চয়ই বিসর্জন করিয়া আপন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

ছত্রসিংহ। তুমি কি পাপ করিয়াছিলে বল দেখি?

অমরসিংহ। ভাই তোমরা সকলেই জান, যে আমি নেহালসিংহের পুত্র। কিন্তু নেহালসিংহ আমার পিতা নহেন। তিনি আমার এক প্রকার জীবনদাতা। সতেরো বৎসর বয়সের সময় আমি আত্মহত্যা করিবার নিমিত্ত গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছিলাম। নেহালসিংহ অচৈতন্যাবস্থায় আমাকে নদী হইতে তুলিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিলেন। পরে পুত্রের ন্যায় আমাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন; এবং অস্ত্র-বিদ্যা শিখাইলেন। সেই অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া আমি মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছি। গঙ্গায় ঝাঁপ দিবার পূর্বে আমি ন্যায় দর্শন ইত্যাদি সকল শাস্ত্রই অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। কিন্তু শাস্ত্র অধ্যয়নে কোনো উপকার হয় নাই। সে কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র। শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আমি মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারি নাই। নবাব মীরজাফরের পুত্র দুর্বৃত্ত মীরণের চার-পাঁচজন লোক আসিয়া, আমার মাতা, স্ত্রী এবং ভগ্নীকে বলপূর্বক ধৃত করিয়া লইয়া চলিল। আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমার এমন সাহস হইল না, যে সেই চার-পাঁচজন লোকের প্রাণ বধ করিয়া, আপন জননী, স্ত্রী এবং ভগ্নীকে রক্ষা করি। আমি তখন নিজে প্রাণের ভয়ে অস্থির হইয়া পড়িলাম। আমার জননী কাঁদিতে কাঁদিতে সেই ধৃতকারী লোকদিগের চরণ ধরিয়া বলিতে লাগিলেন,—'বাছা! আমরা ব্রাহ্মণের কন্যা, আমাদিগের জাতি নষ্ট করিও না।' কিন্তু ইহাতেও আমি একবার অগ্রসর হইয়া সেই ধৃতকারী পিশাচদিগের দণ্ড বিধানের চেষ্টা করিলাম না। ভয়ে ও ত্রাসে আমার সর্বশরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। ধিক্ এ জীবনে! ধিক্ এ জীবনে! হায় হায় জননীর সেই ক্রন্দনধ্বনি এখনো আমার কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

এই পর্যন্ত বলিয়াই অমরসিংহ শোকে মূর্ছিত হইয়া পড়িল। ছত্রসিংহ তাহাকে চেতন করিবার নিমিত্ত মস্তকে জল ঢালিতে লাগিল।

কিছুকাল পরে অমরসিংহ চৈতন্য লাভ করিয়া, আবার বলিতে লাগিল,—'ভাই, ন্যায় দর্শন অধ্যয়ন কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র। শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা মানুষের কাপুরুষতা বিনাশ হয় না, মানুষের মনের নীচাশয়তা দূর হয় না। এখন

একশত লোক আসিয়া যদি আমার সাক্ষাতে কোনো নিরাশ্রয়া রমণীকে আক্রমণ করে, আমি তৎক্ষণাৎ জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া তাহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইতে পারি। প্রাণ-দাতা এবং অস্ত্র-গুরু নেহাল-সিংহ অস্ত্র-শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়াই আমার সেই পূর্ব কাপুরুষতা এবং নীচাশয়তা দূর হইয়াছে। শাস্ত্রকারেরা উপদেশ দিয়াছেন,—'পরোপকারার্থ মানুষের প্রাণ বিসর্জন করা কর্তব্য।' কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া প্রাণ বিসর্জন করিতে যে ব্যক্তি কখনো শিক্ষা করে নাই, অথবা সংগ্রাম ক্ষেত্রে কিম্বা জীবনের অন্য কোনো ঘটনা উপলক্ষে দুই-চারিবার যে ব্যক্তি জীবন বিসর্জন করিতে প্রস্তুত হয় নাই, সে কি সেই শাস্ত্র প্রণেতাদিগের পুস্তক পাঠ করিয়া জীবন বিসর্জন করিতে পারে?

'নরপিশাচগণ যখন আমার জননী, স্ত্রী এবং ভগ্নীকে হরণ করিল, তখন কোনো শাস্ত্রই আমার অবিদিত ছিল না। তৎপূর্বে পিতার নিকট ন্যায়, দর্শন, সাহিত্য, বেদ, বেদান্ত—সকলই অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। কত লোককে উপদেশ প্রদান করিতাম যে জীবন বিসর্জন করিয়াও পরোপকার করিবে। কিন্তু কার্যকালে আমি নিজে কি করিলাম? পরোপকারের কথা তো দূরে থাকুক, যে গর্ভধারিণী দশমাস দশদিন আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, যাঁহার স্তন্যদুগ্ধ এই শরীরকে পোষণ করিয়াছে, যিনি প্রাণ দিয়াও আমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, যাঁহার বক্ষ আমার বাল্যকালের একমাত্র শয্যা ছিল, হায় হায় তাঁহার প্রতি নরপিশাচগণ যখন অত্যাচার করিতেছিল, তখন আমি একপদ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে একবার ধরিলাম না। অত্যাচারিদিগের গাত্র স্পর্শ করিতে আমার সাহস হইল না। আমি তখন আপন প্রাণরক্ষার্থ মনে মনে পলায়নের চিন্তা করিলাম। ধিক্ এ জীবনে! ধিক্ এ জীবনে!'

এই বলিয়াই অমরসিংহ দণ্ডায়মান হইল। কটিদেশ হইতে অসি বাহির করিয়া উত্তোলন পূর্বক ক্ষিপ্তের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন,—'জননী, তোমার যে কুপুত্র কাপুরুষতা-নিবন্ধন নরপিশাচের হস্ত হইতে তোমাকে রক্ষা করিতেও বিরত ছিল, আজ সে মুসলমান বালা হাফেজ-নন্দিনীর ধর্ম রক্ষার্থ এ প্রাণ বিসর্জন করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে।'

অমরসিংহের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ছত্রসিংহ নির্বাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অমরসিংহও কিছুকাল নির্বাক রহিল।

কিছুকাল পরে ছত্রসিংহ জিজ্ঞাসা করিল,—'নেহালসিংহের সঙ্গে তোমার কিরূপে সাক্ষাৎ হইল।'

অমরসিংহ বলিল,—'ভাই সে আবার আর এক প্রকারের কাপুরুষতার কথা। জননীর ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে প্রাণবিসর্জন করিতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু এই ঘটনার পরদিন লোক-গঞ্জনার ভয়ে আমি, আমার পিতা এবং আমার ভগ্নীপতি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণবিসর্জন করিতে উদ্যত হইলাম। দেশীয় লোকে আমাদিগকে জাতি ভ্রষ্ট করিবে· দেশীয় লোকে আমাদিগকে উপহাস করিবে, এই ভাবনাই আমাদিগকে অস্থির করিল। হায় হায় কাপুরুষ বাঙালীর প্রত্যেক কার্যের মধ্যেই কেবল কাপুরুষতা পরিলক্ষিত হয় ধিক বাঙালী! তোমাকে শত ধিক! ভাই আমি, আমার পিতা এবং আমার ভগ্নীপতি—তিন জনেই আত্মহত্যা করিবার নিমিত্ত গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছিলাম। নেহালসিংহের মুখে শুনিয়াছি, তিনি গঙ্গায় স্নান করিতে যাইয়া, চরের উপর আমার এবং আমার ভগ্নীপতির শরীর দেখিতে পাইলেন। আমার ভগ্নীপতির জীবন একেবারে নিঃশেষ হইয়াছিল। শত চেষ্টা করিয়াও নেহালসিংহ তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিলেন না। আমি মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিলাম। অনেক যত্ন ও পরিশ্রমে তিনি আমাকে পুনর্জীবিত করিলেন। আমি চৈতন্য লাভ করিয়া দেখিলাম নেহালসিংহ এবং অন্যান্য অনেক লোক আমার চতুঃপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমার ভগ্নীপতির মৃতদেহ আমার পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে।'

ছত্রসিংহ। তোমার পিতার মৃতদেহ পাওয়া গেল না?

অমরসিংহ। তাঁহারও বোধহয় মৃত্যু হইয়া থাকিবে। তাঁহার মৃতদেহ কোথাও পাওয়া গেল না।

ছত্রসিংহ। তোমার মাতা, ভগ্নী এবং স্ত্রীর কি দশা হইল, তাহা কিছু জানিতে পারিয়াছিলে?

অমরসিংহ। তাঁহারাও বোধহয় আত্মহত্যা করিয়া থাকিবেন। আমার পিতা নবাব বাড়ির একজন বাঁদীকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিয়া, তাহার দ্বারা জননীকে, কন্যা ও পুত্রবধূ-সহ আত্মহত্যা করিতে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

ছত্রসিংহ। ইহার পর নেহালসিংহ কি তোমাকে সঙ্গে করিয়া আপন বাড়িতে লইয়া গেল?

অমরসিংহ। নেহালসিংহ ইংরাজদের কাসিমবাজারের কুঠিতে ছিলেন।

কিন্তু তাঁহার রেসালা * সহ তাঁহাকে কলিকাতা যাইবার হুকুম হইলে, তিনি নৌকাপথে কলিকাতা যাইতেছিলেন। তাঁহার কলিকাতা যাইবার সময়ে তিনি আমাকে নদী হইতে উঠাইলেন। আমার চৈতন্য হইবামাত্র আমাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতা চলিয়া গেলেন।

ছত্রসিংহ। তোমার বাড়ি কি মুর্শিদাবাদে ছিল?

অমরসিংহ। না, ঢাকার অন্তর্গত বিক্রমপুর। আমরা বেলপুকুরের ভট্টাচার্য। আমাদের গুরুগিরি ব্যবসা ছিল। আমার প্রকৃত নাম ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য। আমি বানেশ্বর ভট্টাচার্যের পুত্র। আমরা সপরিবারে গঙ্গাস্নান করিতে মুর্শিদাবাদে আসিয়াছিলাম; পথে এই বিপদ উপস্থিত হইল।

ছত্রসিংহ। তবে তুমি নিশ্চয়ই সুজাউদ্দৌলাকে খুন করিতে চেষ্টা করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছ?

অমরসিংহ। আমি নিশ্চয়ই উজীরের প্রাণ বিনাশ করিব। হাফেজ-নন্দিনীর মুখখানি ঠিক আমার ভগ্নীর মুখের ন্যায়। ইহাকে দেখিবামাত্র আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, ইঁহার ধর্মরক্ষার্থ আমি প্রাণ বিসর্জন করিব। এ সদনুষ্ঠান হইতে আমাকে কেহ বিরত রাখিতে পারিবে না। কিন্তু আমি মরিলে ভগ্নী চাঁদকুমারীর কি উপায় হইবে, তাহাই কেবল ভাবিতেছি। কে তাঁহার ভরণপোষণ করিবে? পিতা নেহালসিংহ মৃত্যুকালে তাঁহাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। নেহালসিংহের গৃহে অবস্থানকালে আহারের সময়ে তিনি মাতার ন্যায় নিকটে বসিয়া আহার করাইতেন, জ্যেষ্ঠা সহোদরার ন্যায় সর্বদা আমাকে স্নেহ করেন। আমার মৃত্যু হইলে আমার শোকে তিনি বড়ই কষ্ট পাইবেন। তাঁহার এবং তাঁহার পুত্রের ভরণপোষণেরও কোনো উপায় থাকিবে না।

ছত্রসিংহ। রণবীরসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী চাঁদকুমারীর ভরণ-পোষণার্থ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি কি কিছু অর্থ প্রদান করেন নাই?

অমরসিংহ। ভাই, সে কথা মনে হইলে আর এই অকৃতজ্ঞ স্বার্থপর ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকরি করিতে ইচ্ছা হয় না। ওদের একটা ফিরিঙ্গি যুদ্ধে মরিলেই তাহার স্ত্রী পুত্রের চিরকালের ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছে। কিন্তু একটা এদেশীয় সিপাহী সংগ্রাম ক্ষেত্রে উহাদের উপকারার্থ

* এক এক সুবাদারের অধীনস্থ সৈন্যদলকে রেসালা বলা যায়।

প্রাণ বিসর্জন করিলে, তাহার স্ত্রী-পুত্রকে শ্রাদ্ধের ভিক্ষা স্বরূপ দশ-পাঁচ টাকার অধিক কখনো প্রদান করে না। রণবীরসিংহকে আমি দেখি নাই। কিন্তু তোমাদের সকলের মুখেই তো শুনিতে পাই, যে পলাশীর যুদ্ধে তিনি বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ছত্রসিংহ। ভাই পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে আমিও উপস্থিত ছিলাম। আমি স্বচক্ষে সকল দেখিয়াছি। সে দিন রণবীরসিংহ না থাকিলে বড় বিপদ উপস্থিত হইত। রণবীরসিংহের হাতেই মীরমদনের মৃত্যু হয়। মীরমদনের মৃত্যুর পরই সিরাজদ্দৌলা সৈন্যদিগকে রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে নবাবের সেনাপতি মোহনলালের হাতে রণবীরের মৃত্যু হইল। এ বড় অন্যায় যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রণবীরসিংহের স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণের কোনো বন্দোবস্ত করেন নাই।

অমরসিংহ। ভাই আমার সঙ্গেই আমার দুই-তিন হাজার টাকা আছে। লক্ষ্ণৌ পৌছিয়াই সেই টাকা তোমার নিকট দিব। আমার মৃত্যুর পর প্রয়াগে যাইয়া তুমি এই টাকা এবং আমার একখানা পত্র ভগ্নী চাঁদকুমারীকে দিবে। আর তাঁহার পুত্র মহাবীরসিংহকে তুমি সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা দিবে। চাঁদকুমারীর অত্যধিক সন্তান-বাৎসল্যই মহাবীরের সর্বনাশ করিবে। সংগ্রামক্ষেত্রে স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া, চাঁদকুমারী প্রাণান্তেও আপন পুত্র মহাবীরকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে চাহেন না। রণবীরসিংহের মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র দুই মাসের শিশু ছিল। তাহার যখন দুই-তিন বৎসর বয়স হইয়াছে, তখন আমি নেহালসিংহের গৃহে অবস্থান করিতে আরম্ভ করি। একদিন নেহালসিংহ আমাকে বলিলেন,—'বাবা তুমি তো অনেক শাস্ত্র পড়িয়াছ; আমার এই দৌহিত্রের একটা ভালো নাম নির্বাচন কর দেখি।' আমি বড় আহ্লাদের সহিত রণবীরসিংহের পুত্রের নাম মহাবীরসিংহ রাখিলাম। মহাবীর অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা করিলে এতদিনে প্রকৃত মহাবীর বলিয়াই পরিচিত হইতেন। কিন্তু দিদি চাঁদকুমারী একেবারে তাহার পরকাল নষ্ট করিতেছেন। মহাবীরের বয়ঃক্রম এখন প্রায় সতের-আঠার বৎসর হইয়াছে। মহাবীর নেহালসিংহের দৌহিত্র এবং রণবীরসিংহের পুত্র। সে প্রার্থনা করিলে এখনই সাহেবেরা তাহাকে সিপাহীর কার্যে নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু তাহাকে সংগ্রাম-ক্ষেত্রে পাঠাইবার কথা বলিলেই, দিদি চাঁদকুমারী রণবীরসিংহের শোকে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করেন। আমি তখন আর কিছুই বলিতে পারি না।

চাঁদকুমারীর ইচ্ছা যে তাঁহার পুত্র শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া কোনো রাজসরকারে রাজস্ব আদায়ের কার্যে নিযুক্ত হয়।

ছত্রসিংহ। সে কি শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে?

অমরসিংহ। আমার নিকটই শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছে। কিন্তু তাহার নিজের অস্ত্রশিক্ষার প্রতিই বিশেষ রুচি দেখা যায়। সাংগ্রামিক জীবনই সে ভালোবাসে।

ছত্রসিংহ। তুমি কি মনে কর, যে শাস্ত্রপাঠ করা ভালো নয়? কেবল যুদ্ধ করিতে শিখিলেই ভালো হয়?

অমরসিংহ। আমি তো বরাবরই বলিতেছি যে, কেবল শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা মানুষের কাপুরুষতা এবং নীচাশয়তা দূর হয় না। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, যে পরোপকারার্থ জীবন বিসর্জন করিতে হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সত্য সত্যই আপন জীবন বিসর্জন করিতে কখনো প্রস্তুত হয় না, সে কি কখনো জীবন বিসর্জন করিতে পারে? যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ ভিন্ন মানুষ কখনো মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না,—'এই অনিত্য দেহ অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ—পরোপকারার্থ এই অনিত্য দেহ বিসর্জন করা সর্বতোভাবে কর্তব্য,'—শাস্ত্রে এই সকল কথা পাঠ করিয়া আমাদের একটি নূতন রোগ উপস্থিত হয়। তখন কেবল অপরের জীবনের উপর আমাদের দৃষ্টি পড়ে। পৃথিবীর অন্যান্য লোক কেন শাস্ত্র পালন করে না, অন্যান্য লোক কেন পরোপকারার্থ প্রাণ বিসর্জন করে না; অন্যান্য লোক কেন স্বার্থপরতা ত্যাগ করে না; তজ্জন্য আমরা তাহাদিগকে কেবল নিন্দা করিতে থাকি। কিন্তু নিজে যে প্রাণ বিসর্জন করিতে অসমর্থ, সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি পড়ে না। পক্ষান্তরে সংগ্রামক্ষেত্রে দুই-তিনবার প্রাণবিসর্জন করিতে প্রস্তুত হইলে, মানুষ অকুতোভয় হইয়া শাস্ত্রের বাক্য পালন করিতে সমর্থ হয়।

ছত্রসিংহ। তবে কি মহাবীরসিংহকে একান্তই সিপাহীর কার্যে নিযুক্ত করাইয়া দিতে হইবে?

অমরসিংহ। আমার মৃত্যুর পর তুমি আমার প্রদত্ত টাকা এবং একখানা পত্র লইয়া প্রয়াগে (এলাহাবাদে) চাঁদকুমারীর নিকট চলিয়া যাইবে। তাঁহাকে আমার মৃত্যু বিবরণ বলিবে। অন্যান্য সকল বিষয়ই আমি পত্রের মধ্যে লিখিয়া রাখিয়া যাইব। আর একটি কথা মনে রাখিবে—সুজাউদ্দৌলার

প্রাণ বিনাশ করিয়া যদি আমি পলায়ন পূর্বক আত্মরক্ষা করিতে পারি, তবে নিশ্চয়ই আমি মহারাষ্ট্রীয়দিগের সৈন্যভুক্ত হইব। তাহা হইলে আমি এদেশে আসিতে পারিব না। তুমি তখন দিদি চাঁদকুমারী এবং মহাবীরসিংহকে হলকারের রাজ্যে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবে। তাঁহারা এখন নেহালসিংহের বৃদ্ধা জননীর সঙ্গে প্রয়াগে নেহালসিংহের পৈত্রিক বাড়িতে অবস্থান করিতেছেন।

ছত্রসিংহ। চাঁদকুমারীর নিকট যে পত্র দিবে তাহাও কি এখনই লিখিয়া রাখিবে?

অমরসিংহ। এখনই লিখিব বই কি। আমরা কল্যই বিশুলি * তাঁবুতে পৌঁছিব। যদি পৌঁছিবামাত্র, নবাবের প্রাণ বিনাশের সুযোগ হয়, তবে কি আর আমি বিলম্ব করিব? যাহা হয় সমুদয় বন্দোবস্ত আজ রাত্রেই করিতে হইবে।

ছত্রসিংহ। তবে তুমি পত্র লিখিতে আরম্ভ কর। আমি আর-এক-কল্কি গাঁজার যোগাড় করি। অনেক রাত্রি হইয়াছে। আর একবার গাঁজা না, খাইলে আর ঘুম হইবে না।

অমরসিংহ। ভাই তুমি এখন বুড়া হইয়াছে। গাঁজার অভ্যাসটা ছাড়িয়া দিতে পার? আমার এই শেষ অনুরোধটি রক্ষা কর।

ছত্রসিংহ। ভাই তোর অনুরোধে আমি প্রাণ দিতে পারি। কিন্তু গাঁজা ছাড়িতে পারিব না।

অমরসিংহ। (সজল নয়নে) আমি তোমার পায়ে পড়িয়া বলিতেছি, তুমি গাঁজা খাওয়ার অভ্যাস পরিত্যাগ কর। এই আমার মৃত্যুকালের অনুরোধ।

'মৃত্যুকালের অনুরোধ' এই কথা শুনিয়া ছত্রসিংহের হৃদয় একটু বিগলিত হইল। সে কিছুকাল পর্যন্ত চিন্তা করিয়া বলিল,—'অমর, কাল, সকাল হইতে তোমার অনুরোধ রাখিতে চেষ্টা করিব। এ কল্কী প্রস্তুত, এখন একবার খাই।'

এই বলিয়া ছত্রসিংহ গাঁজায় দম দিতে আরম্ভ করিল। অমরসিংহ প্রদীপের নিকট বসিয়া, স্বীয় জ্যেষ্ঠা সহোদরা সদৃশী নেহালসিংহের কন্যা চাঁদকুমারীর

* বিশুলি—রোহিলাখণ্ডের অন্তর্গত একটি শহর।

নিকট পত্র লিখিতে লাগিলেন। প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যেই পত্র লেখা শেষ হইল। তখন ছত্রসিংহ বলিল,—'লিখিয়াছ একবার পড় দেখি, শুনি।'

অমরসিংহ পত্রপাঠ করিতে লাগিল—

'দিদি, এ সংসারে তুমি এবং তোমার পুত্র মহাবীর ভিন্ন আমার আর ভালোবাসার কেহ নাই। আমি যাহাদিগকে ভালোবাসিতাম, তাঁহারা সকলেই বোধহয় এখন পরলোকে আছেন। সেখানে যাইতে পারিলেই তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তাঁহাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত মন সর্বদাই ক্রন্দন করে। কিন্তু এ পর্যন্ত আত্মহত্যা ভিন্ন আর পরলোকে যাইবার দ্বিতীয় উপায় ছিল না। কাপুরুষতা নিবন্ধন একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিলাম। তখন তোমার পিতা আমার জীবন রক্ষা করিলেন। তৎপর বুঝিতে পারিয়াছি যে, আত্মহত্যা করা অপেক্ষা সংসারে আর গুরুতর কাপুরুষতার কার্য কিছুই নাই। সুতরাং আর কখনো আত্মহত্যার চেষ্টা করি নাই।'

'এখন একটি মহদুদ্দেশে জীবন সমর্পণপূর্বক আমার পরলোকে যাইবার বিলক্ষণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এ সুযোগ পরিত্যাগ করিব না।

'অতি সচ্চরিত্রা একটি নিরাশ্রয়া নবাব-কন্যাকে নরপিশাচের হস্ত হইতে রক্ষার্থ প্রাণবিসর্জন করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। ইহাতে আমার প্রাণ হারাইবারই অধিক সম্ভাবনা; কিন্তু যদি পলায়নপূর্বক আত্মরক্ষা করিতে পারি, তবে অত্যল্পকাল মধ্যেই তোমার শ্রীচরণ দর্শন করিব। আর যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে আমার প্রেরিত এই দুই হাজার টাকার দ্বারা কয়েক বৎসর জীবিকানির্বাহের চেষ্টা করিবে; এবং অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষার্থে মহাবীরকে এই পত্র-বাহক ছত্রসিংহের সঙ্গে রাখিয়া দিবে। অত্যধিক সন্তান-বাৎসল্য নিবন্ধন এই পাঁচ-সাত বৎসর পর্যন্ত তুমি মহাবীরের অস্ত্র-শিক্ষা সম্বন্ধে বাধা দিতেছ। তুমি মা হইয়া তাহার পরম শত্রুর কার্য করিতেছ। অস্ত্র-শিক্ষা ভিন্ন মানুষ কখনো মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না। কাপুরুষতা এবং স্বার্থপরতা চিরকালই মনুষ্যকে পশু প্রকৃতি প্রদান করে। সেই কাপুরুষতা বিনাশের ঔষধ একমাত্র অস্ত্র-শিক্ষা। আমার মনে সর্বদাই এই প্রশ্নের উদয় হয়—তুমি বীরের কন্যা, বীরের পত্নী; অস্ত্র-শিক্ষার প্রতি তোমার মনে এইরূপ বিদ্বেষের ভাব কেন উপস্থিত হইল? অনেক চিন্তা করিয়া শেষে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, সংসর্গ দোষ হইতে কেহ নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। তিন বৎসর বয়সের সময় তোমার মাতৃবিয়োগ হইলে পর, তুমি পিতার

সঙ্গে বরাবর বঙ্গদেশে ছিলে। বাল্যকালে কাশিমবাজারের নিকটস্থ গ্রামের বাঙালী মেয়েদের সঙ্গে সর্বদা খেলা ধূলা করিতে। যৌবন কালে বাঙালী রমণীগণই তোমার সঙ্গিনী ছিলেন। তোমার জীবনের প্রত্যেক কার্য এবং ব্যবহারে আমি বাঙালী রমণীর ভাব চরিত্র দেখিতে পাই। বাঙালী মেয়েদিগের স্থায় তোমার অন্তর দয়া ও স্নেহে পরিপূর্ণ। বাঙালী মেয়েদিগের স্থায় তুমি অত্যন্ত পতিপ্রাণা ও পরমসাধ্বী। বাঙালী মেয়েদিগের স্থায় তোমার মধ্যে অত্যন্ত ত্যাগ স্বীকারের ভাব পরিলক্ষিত হয়। নিজে আহার না করিয়াও পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নীকে কিরূপে আহার করাইবে, কিরূপে তাহাদিগকে সুখে রাখিবে, বাঙালী মেয়েদিগের স্থায় তাহাই কেবল তোমার চিন্তা। বাঙালী মেয়েদের এই সদ্‌গুণ যে লাভ করিয়াছে সে ভালো। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই সকল সদ্‌গুণের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী মেয়েদের ভীরুতা ও তোমাকে আশ্রয় করিয়াছে। বাঙালী মেয়েদের অন্যান্য সদ্‌গুণ রক্ষা কর। কিন্তু তাহাদের ভীরুতা পরিহার কর।

'সময়ে সময়ে কলিকাতা অবস্থানকালে তুমি পতি-শোকে অধীর হইয়া পড়িলে, আমি তোমার নিকট বসিয়া কত শত সংস্কৃত পুস্তক পাঠ করিয়া তোমাকে শুনাইয়াছি। তোমার স্মরণ আছে কি, দশরথ-পত্নী সুমিত্রা কি কথা বলিয়া স্বীয় পুত্র লক্ষ্মণকে রামের সঙ্গে বনে পাঠাইয়াছিলেন? যদি এ সংসারে কেহ মাতার কর্তব্য প্রতিপালন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি সুমিত্রা দেবীকে সর্বাংশে অনুকরণ করুন।

'দিদি, আমি এ জন্মের মতো তোমার নিকট হইতে বিদায় হইতেছি। আমার এই শেষ অনুরোধটি রক্ষা করিবে। মহাবীরের অস্ত্র শিক্ষার বাধা দিবে না। সুমিত্রা দেবীর স্থায় তুমি মাতার কর্তব্য প্রতিপালন করিতে যত্ন করিবে। কিরূপে প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে, সে বিষয় সন্তানকে শিক্ষা প্রদান করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। আত্মরক্ষার প্রবল বাসনা কি বালক, কি বৃদ্ধ সকলের হৃদয় মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। কর্তব্য প্রতিপালনার্থ যে সর্বদা প্রাণ বিসর্জন করিতে হইবে, পিতা মাতা সন্তানকে তৎসম্বন্ধেই শিক্ষা প্রদান করিবেন। সংক্ষেপে বলিতেছি, সন্তানকে বাঁচিতে শিখাইতে হইবে না, মরিতে শিখাইবে।

'এ সংসার পরিত্যাগের পর যখন পরলোকে যাইব, তখন যদি দেখিতে পাই যে, সুমিত্রার স্থায় তুমি মহাবীরকে সহাস্য বদনে কর্তব্য প্রতিপালনার্থ

প্রাণ বিসর্জন করিতে বিদায় দিতেছ, তবে আমি পরমানন্দ লাভ করিব। তুমি সুমিত্রার সে কথা কয়েকটি কখনো ভুলিবে না।

'আমি পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি যে, প্রত্যেক জননী সুমিত্রার সেই বাক্য আপন আপন জপ-মন্ত্র করুন। তোমার স্মরণার্থ রামায়ণের সে শ্লোক কয়েকটি আবার লিখিয়া দিতেছি। মনে রাখিবে যে, এ শ্লোক কয়েকটি তোমার জপ-মন্ত্র। এই শ্লোকই আমার মৃত্যুকালের দান।—

'সৃষ্টস্ত্বং বনবাসায় স্বনুরক্তঃ সুহৃজ্জনে।
রামে প্রমাদং মাকার্ষীঃ পুত্র ভ্রাতরি গচ্ছতি॥···
ইদংহি বৃত্তমুচিতং কুলস্যাস্য সনাতনম্।
দানং দীক্ষাচ যজ্ঞেষু তনুত্যাগো মৃধেষু হি॥
রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম।
অযোধ্যা মটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথা সুখম্॥'

'দিদি, এখন আমাকে বিদায় দাও। যদি কর্তব্য সাধনে জীবন নিঃশেষিত হয় তবে এ জন্মের মতো বিদায় হইলাম। আর কর্তব্য সাধনের পরেও যদি আত্মরক্ষা করিতে পারি, তবে সত্বর আবার তোমার শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া তোমার সেই স্নেহ পরিপূর্ণ মুখ-কমল দর্শন করিয়া, এই শোক সন্তপ্ত হৃদয়কে শীতল করিয়া আসিব।

সেবক শ্রীঅমর সিংহ'

ছত্রসিংহের নিকট অমরসিংহ এই পত্র পাঠ করিলে পর ছত্রসিংহ বলিল,—'ভাই অমর, আমার একটা কথা পত্রের মধ্যে লিখিয়া দাও।'

অমরসিংহ। কি কথা?

ছত্রসিংহ। আমার চারি হাজার টাকা আছে। আমি মনে করিয়াছিলাম যে, মরণকালে সেই টাকাগুলি তোমাকে দিয়া যাইব। কিন্তু তুমি তো আমার পূর্বেই মরিতে চলিলে। আমার সন্তানাদি পরিবার কিছুই নাই। আমি টাকা দ্বারা আর কি করিব? তুমি চাঁদকুমারীকে বলিয়া দাও যে, তিনি আমার প্রদত্ত এই চারি হাজার টাকা গ্রহণ করিতে অসম্মতি প্রকাশ না করেন। আমি এই সমুদয় টাকা চাঁদকুমারী এবং তাঁহার পুত্রকে এবারেই দিয়া আসিব।

অমরসিংহ তখন পত্রের নিম্নে আবার লিখিলেন,—

'দিদি, এই পত্রবাহক ছত্রসিংহ পিতা নেহালসিংহের একজন পুরাতন

বন্ধু। ইনি আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। ইহার পুত্র সন্তান কেহ নাই। দীর্ঘকাল যাবৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে সিপাহীর কার্য করিয়া ইনি চারি হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে এই টাকা আমাকে দিয়া যাইবেন বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার মৃত্যুর পূর্বেই বোধহয়, আমার মৃত্যু হইবে। ইনি সেই জন্য ইহার সঞ্চিত চারি হাজার টাকা তোমার মহাবীরকে দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহার প্রদত্ত টাকা গ্রহণ করিতে তুমি অসম্মতা হইবে না। কারণ, ইনি তোমাকে আপন কন্যা বলিয়া মনে করেন।'

এই পত্র লিখিবার কিছু কাল পরে রাত্রি অবসান হইল। পালকি-বেহারাগণ পালকিসহ, হাফেজের পত্নী রাত্রে যে গৃহে ছিলেন, সেই গৃহের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। লেফ্‌টেন্যান্ট টম্‌সন্, এনসাইন মেলবিল্ এবং টম্‌কিন্ প্রভৃতি ইংরাজগণ আপন আপন অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। সকলেই প্রস্থানোন্মুখ হইলেন। অমরসিংহ এবং ছত্রসিংহ পূর্ব দিবসের ন্যায় আজও হাফেজের পত্নীর পালকির সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। পালকি-বেহারাগণ সময় সময় পথে স্কন্ধ হইতে পালকি ভূমে রাখিয়া বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেই, অমরসিংহ এবং ছত্রসিংহ হাফেজ-পত্নীর সঙ্গে কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিতেন। এখন হাফেজ-পত্নী আত্মীয় মনে করিয়া অকপটে ইহাদিগের সহিত নানা কথা বলিতে লাগিলেন।

দিবাবসানের পূর্বেই সৈন্যগণ হাফেজের পরিবার সহ বিশুলি (Bissoolee) শহরে পৌছিল। অমরসিংহ প্রভৃতির সংস্কার ছিল যে, হাফেজের পরিবার-দিগকে নবাবের আদেশানুসারে ফায়েজাবাদ লইয়া যাইতে হইবে। কিন্তু নবাব ইহাদিগকে ফায়েজাবাদ লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন না।

উজীর সুজাউদ্দৌলা যখন স্বয়ং সসৈন্যে রোহিলাখণ্ডের অন্তর্গত আউলা শহরে ছিলেন, তখন সৈন্যগণ হাফেজের পরিবারদিগকে* ধৃত করিতে প্রেরিত হইয়াছিল। এখন নবাব বিশুলিতে আসিয়াছেন। হাফেজের পরিবারদিগকে লইয়া সৈন্যগণ বিশুলি (Bissoolee) শহরে পৌছিলে পর, নবাবের

* The family of Hafiz Rahmut, with a torpid apathy which is not easy to be accounted for, took no measure either for flight, but continued toremain quietly in the fort of Peeleabete. Vide C. Hamilton's Rohilla Afghans, page 246.

সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। নবাব বিশুলি হইতে অন্য একজন রোহিলা সরদার ছুন্দি খাঁর পুত্র-কন্যা এবং স্ত্রীকে ধৃত করিতেও সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। ছুন্দি খাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা তাঁহার নিকট আনীত হইলে পর, উজীর স্বজাউদ্দৌলা স্বীয় ভগ্নীপতি নবাব স্যালার জঙ্গ বাহাদুরকে সঙ্গে দিয়া, তাহারই রক্ষণে ছুন্দি খাঁর পরিবার, হাফেজ রহমতের কন্যা ভিন্ন তাহার স্ত্রী ও অন্যান্য পরিবার এবং আর কয়েকজন রোহিলা সরদারের পরিবারদিগকে এলাহাবাদে কয়েদী-স্বরূপ * প্রেরণ করিলেন। স্বদ্ধ কেবল হাফেজ রহমতের কন্যাকে দুই-চারিজন সিপাহী এবং কয়েকজন দাস-দাসী সহ ফায়েজাবাদে আপন বেগমের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

অমরসিংহ এবং ছত্রসিংহের প্রতিও নবাব স্যালার জঙ্গের সঙ্গে এলাহাবাদ যাইবার হুকুম হইল।

হাফেজ-নন্দিনীকে এখন মাতৃক্রোড় হইতেও বিচ্ছিন্ন হইতে হইল। সজল নয়নে তিনি মাতার নিকট হইতে জন্মের মতোন বিদায় গ্রহণ করিলেন। মাতা তিন-চারিবার কন্যার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন,—'এখন পিতৃবৈরী বিনাশের সম্পূর্ণ ভার তোমার হস্তে রহিল। এখন শোক-দুঃখ প্রকাশ করিবার সময় নহে। পিতৃবৈরী-বিনাশ-ব্রত-প্রতিপালনে নিশ্চয়ই ঈশ্বর তোমার সহায়তা করিবেন।'

এই বলিয়া বীরপত্নী কন্যার নিকট হইতে বিদায় হইলেন †। কন্যার চক্ষু হইতে অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল; ষোড়শবর্ষীয়া যুবতী শত চেষ্টা করিয়াও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু মাতার চক্ষু হইতে এক-বিন্দু অশ্রুও নিপতিত হইল না। বীরদর্পে তিনি স্বতন্ত্র পালকিতে নবাব-সৈন্য সহ এলাহাবাদে চলিলেন।

* Shortly after his arrival at Bissoolee the Vizier sent off the sons of Doondee Khan, their wives and children, together with the family and immediate retainers of the Hafiz Rahmut, and numbers of the Afghan inhabitants of Barelee, Owlah, Bissoolee and other places to Allahabad under the conduct of his brother-in-law, the Nawab Salur Jung,—C. Hamilton's Rohilla Afghan.

† Mr. Charles Hamilton in his history of Rohilla Afghan does not make any mention of Hafiz Rahmut's daugher. But that she was taken into the harem of Vizier is a fact no one ean deny.

অষ্টম অধ্যায়

জগদম্বা বেগম

জ্যৈষ্ঠ মাস। বেলা অবসান হইয়া আসিয়াছে। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে। ফায়েজাবাদ উজীরের রাজপ্রাসাদ হইতে ক্রোশাধিক দূরস্থিত একখানি জনশূন্য ভগ্ন গৃহে বসিয়া, দুইটি লোক পরস্পরের সহিত পরস্পর কথা-বার্তা বলিতেছে।

ইহাদের উভয়ের পরিধানেই সিপাহীর পরিচ্ছদ ছিল। একজনের বয়ঃক্রম অন্যূন ষাট বৎসর হইয়াছে। দ্বিতীয়ের বয়স ত্রিশ বৎসরের অধিক নহে।

বৃদ্ধ সিপাহী তাহার সঙ্গী যুবককে সম্বোধন পূর্বক বলিল,—'ভাই অমর, বল দেখি আর কতদিন এখানে এইভাবে থাকিব? নবাব সুজাউদ্দৌলা এখন পর্যন্তও রোহিলখণ্ড পরিত্যাগ করেন নাই।'

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল,—'নবাব দুই-একদিনের মধ্যে এখানে আসিয়া পৌঁছিবেন। তোমার এখানে থাকিতে যদি বড় কষ্টবোধ হয়, তুমি না হয় টাকা এবং আমার পত্র লইয়া দিদি চাঁদকুমারীর নিকট প্রয়াগে চলিয়া যাও।'

এই সিপাহীদ্বয়কে পাঠকগণ বোধহয় সহজেই চিনিতে পারিবেন। বৃদ্ধ সিপাহী ছত্রসিংহ, আর যুবক অমরসিংহ। উভয়েই নবাব শালার জঙ্গের সঙ্গে রোহিলা-রমণীগণকে লইয়া এলাহাবাদে যাইতেছিল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার ছলনা করিয়া ইহারা ফায়েজাবাদ চলিয়া আসিয়াছে। অমরসিংহের কথা শুনিয়া ছত্রসিংহ বলিল,—'ভাই তোমার কিরূপ বিপদ উপস্থিত হয়, তুমি নবাবের প্রাণ বিনাশের পর পলাইয়া যাইতে পার কি না, তাহা না দেখিয়া, এস্থান হইতে চলিয়া যাইতে আমার ইচ্ছা হয় না। তুমি কি আজও আবার রাত্রে সেই বেগমের বাঁদীটার নিকট যাইবে?'

অমরসিংহ। আজও আবার আমাকে নবাব বাড়ি যাইয়া সেই তোফানী বাঁদীর সহিত রাত্রে সাক্ষাৎ করিতে হইবে। গতকল্য সে বলিয়াছে যে, আজ একটু অধিক রাত্র হইলে পর নবাব বাড়ির নিকটস্থ সেই পুষ্করিণীর পাড়ে আমবাগানে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।

ছত্রসিংহ। সে বাঁদী কি বলিয়াছে যে তোমাকে গোপনে অন্দরের মধ্যে লইয়া যাইতে পারিবে?

অমরসিংহ। সে স্ত্রীলোকের কোনো কথার উপরই বিশ্বাস করিতে পারি না।

তাহার যখন যাহা মুখে আইসে তাহাই বলে। কখনো বলে যে, সে অনায়াসে আমাকে অন্দরের মধ্যে লইয়া যাইতে পারিবে, আবার কখনো বলে, যে এরূপ দুঃসাহসের কার্য সে কখনোই করিবে না। এই স্ত্রীলোকটা বোধহয় নিতান্ত অসচ্চরিত্রা। এ দেখিতে যদ্রূপ কুৎসিত, ইহার চরিত্রও তদনুরূপই বটে। আমার সহিত কথা বলিবার সময়ে যেরূপ ভাবভঙ্গী করে, তাহাতে আর ইহার ছায়া স্পর্শ করিতেও আমার ইচ্ছা হয় না। কেবল ইহার সাহায্যে হাফেজ-নন্দিনীকে নবাবের অন্দর হইতে বাহির করিবার আশায়ই প্রত্যহ ইহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছি।

ছত্রসিংহ। হাফেজ-নন্দিনীকে তবে ফায়েজাবাদ আনিয়া বড় অন্দরে স্বয়ং বেগমের নিকট রাখিয়াছে। তাঁহাকে খোর্দ মহলে পাঠায় নাই ?

অমরসিংহ। বেগমের অন্দরেই রাখিয়াছে। কিন্তু উজীরের প্রধান স্ত্রী বউবেগম নাকি হাফেজ-নন্দিনীকে বড় যত্ন করেন না। উজীরের অন্দরের মধ্যে জগদম্বা বেগম নামে একজন প্রবীণা রমণী আছেন, তিনিই নাকি হাফেজ-নন্দিনীকে দয়া করিয়া আপন কন্যার ন্যায় সস্নেহে প্রতিপালন করিতেছেন। সময়ে সময়ে প্রবোধ বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করেন এবং তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু হাফেজ-নন্দিনী সর্বদাই বিষণ্ণবদনে বসিয়া থাকেন, কাহারো সহিত বাক্যালাপ করেন না।

ছত্রসিংহ। ভাই এতো বড় সুন্দর নাম। (হাস্য করিয়া) জগদম্বা বেগম ! বেগমের নাম জগদম্বা এতো কখনো শুনি নাই।

অমরসিংহ। ভাই জগদম্বা বেগম নাম শুনিয়া কাল আমার প্লীহা চমকিয়া উঠিয়াছিল। পরে তাঁহার পরিচয় শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম নহিলে কালই প্রাণত্যাগ করিতাম।

ছত্রসিংহ। ভাই তুমি কথায় কথায়ই প্রাণত্যাগ করিতে চাও। জগদম্বা বেগম নাম শুনিয়া তোমার প্লীহা চমকিয়া উঠিল কেন ? আর তুমিই বা প্রাণত্যাগ করিতে কেন ?

অমরসিংহ। দাদা আমার জননীর নাম জগদম্বা। তোফানী বাঁদীর মুখে শুনিলাম যে জগদম্বা বেগম নামে যে স্ত্রীলোকটি উজীরের অন্দরে আছেন, তিনি বঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছেন। এই কথা শুনিয়াই আমার মনে এই প্রশ্নের উদয় হইল,—'তবে কি আমার জননী জাতি-ভ্রষ্টা হইয়াও এই ঘৃণিত জীবন ধারণ করিতেছেন ? তিনি কি তবে আত্মহত্যা করেন নাই ?

মনোমধ্যে এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইবামাত্র, আমি একেবারে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া পড়িলাম। কিন্তু কোনো প্রকারেই আমার বিশ্বাস হইল না, যে আমার জননী এইরূপ ঘৃণিত জীবন যাপন করিতেছেন। আমি তখন জগদম্বা বেগমের সম্বন্ধে তোফানীকে নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলাম। আমার প্রশ্নোত্তরে তোফানী যাহা বলিল, তদ্দ্বারা নিশ্চয়ই অবধারণ করিলাম যে জগদম্বা বেগম নবাব মীরজাফরের স্ত্রী, দুর্বৃত্ত মীরণের গর্ভধারিণী।

ছত্রসিংহ। মীরজাফরের বেগম এখানে কিরূপে আসিলেন?

অমরসিংহ বলিল,—'ভাই সে বিষয়ে যদি শুনিতে চাহ, তবে অনেক কথা বলিতে হয়। মীরজাফরের বেগম যে এখানে আসিয়াছিলেন, তাহা আমি পূর্বেও জানিতাম। তিনি কিরূপে এখানে আসিয়াছেন শুন—

নবাব সুজাউদ্দৌলা বক্সারের যুদ্ধে পরাস্ত হইলে পর, দিল্লীর সম্রাট এবং বলবন্তসিংহ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, তৎক্ষণাৎ ইংরাজদিগের শরণাগত হইলেন। সুজাউদ্দৌলা তখন নবাব মীরকাসিমকে সঙ্গে লইয়া পলায়ন পূর্বক লক্ষ্ণৌ অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এদিকে ইংরাজ-সৈন্য সুজাউদ্দৌলাকে এবং মীরকাসিমকে ধৃত করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের অনুসরণ করিল। আমি ইহার পর মেজর কার্নাকের (Major Carnac) অধীনস্থ সৈন্যদিগের সঙ্গে সেবার এদিকে আসিয়াছিলাম।

'ইংরাজেরা তখন আশা করিয়াছিলেন যে, এলাহাবাদ এবং কোরা ব্যতীত, সুজাউদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া অযোধ্যাও দিল্লীর সম্রাটকে প্রদান করিবেন। কিন্তু বিলাতে এ প্রস্তাব মঞ্জুর হইল না।

'এদিকে সুজাউদ্দৌলা মনে করিতে লাগিলেন যে, মীরকাসিমের সাহায্য করিতে যাইয়াই তাঁহার এই বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং মীরকাসিমের প্রতিই তাঁহার বিদ্বেষের ভাব উপস্থিত হইল। তিনি ফয়াজাবাদে পৌঁছিয়া মীরকাসিমের সঙ্গে যে কিছু ধনসম্পত্তি মণি-মুক্তা ছিল, তাহা বলপূর্বক কাড়িয়া রাখিলেন এবং মীরকাসিমকে আপন রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিলেন। মীরকাসিম তখন আপন পরিবার সহ রোহিলখণ্ডে যাইয়া বেরিলি শহরে নিতান্ত দীন-দুঃখীর ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। মীরকাসিমের সঙ্গে তখন তাঁহার স্ত্রী এবং শাশুড়ী ছিলেন।

'কয়েক দিন পরে মীরকাসিম সৈন্য সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত নেপাল চলিয়া গেলেন। তাঁহার শাশুড়ী এবং স্ত্রী বেরিলিতে রহিলেন।

এদিকে ইংরাজ সৈন্য ক্রমে অগ্রসর হইয়া অযোধ্যা আক্রমণের উপক্রম করিল। সুজাউদ্দৌলাও তখন অত্যন্ত নিরুপায় হইয়া আপন পরিবার ফায়েজাবাদ হইতে রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত বেরিলিতে প্রেরণ করিলেন, এবং ইংরাজদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। ইংরাজেরা দেখিলেন যে, সুজাউদ্দৌলাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারিলেও অযোধ্যায় রাজত্ব করা বড় সহজ নহে। সুতরাং তাঁহারা সুজাউদ্দৌলার সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে সম্মত হইলেন।

'এই সন্ধির পর সুজাউদ্দৌলার জননী সায়দ উন্নিসা বেগম এবং তাঁহার স্ত্রী বউবেগম বেরিলি হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে, মীরকাসিমের স্ত্রী এবং শাশুড়ীকে সঙ্গে করিয়া ফায়েজাবাদ আনিলেন। মীরকাসিমের শাশুড়ীই নবাব মীরজাফরের স্ত্রী। তিনি স্বীয় কন্যাসহ তদবধি এখানে অবস্থান করিতেছেন। মীরকাসিমের শাশুড়ীকেই নবাবের অন্দরের স্ত্রীলোকেরা জগদম্বা বেগম বলিয়া সম্বোধন করেন। কিন্তু কিজন্য তাঁহাকে জগদম্বা বেগম বলেন, তাহা জানি না।'

অমরসিংহের বাক্যাবসানে ছত্রসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মীরজাফরের স্ত্রী আপন স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া, জামাতার সঙ্গে এখানে আসিলেন কেন ?'

অমরসিংহ বলিল যে, 'শুনিয়াছি মীরজাফরের সঙ্গে তাঁহার প্রধানা স্ত্রীর দীর্ঘকাল হইতেই বিবাদ ছিল। তিনি স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব হইতেই কন্যা ও জামাতার সঙ্গে একত্র বাস করিতেছিলেন *।

ইহাদিগের এইরূপ কথা-বার্তায় রাত্র হইল। তখন অমরসিংহ তোফানী বাঁদির সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত নবাব বাড়ির দিকে চলিল। ছত্রসিংহ গৃহে বসিয়া আহারের আয়োজন করিতে লাগিল।

* মীরজাফরের সহিত যে তাঁহার প্রধানা স্ত্রী মীরণের মাতার বিবাদ ছিল, তাহার অনেক ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। মীরজাফর সিংহাসনচ্যুত হইয়া যে দিবস কলিকাতা রওনা হইলেন, সেই দিন কাপ্তান কলিয়ড, বার্সিটার্ট সাহেবের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কথা কয়েকটি লিখিত ছিল—

'His legitimate wife, called the Begum, the mother of the decaesed Chota Nawab and of Kasimali's wife, refused to accompany the old Nawab, with whom, she says, she has not been in good harmony, for long time past, that she is very glad the Government is put into such good hands ; and she should live much happier with her daughter and son-in-law.

নবম অধ্যায়

প্রেমিকা

ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, যে অমরসিংহ এবং ছত্রসিংহ নবাব সুজা-উদ্দৌলার আদেশানুসারে নবাব শ্যালার জন্য এবং অন্যান্য সৈন্যের সঙ্গে রোহিলা রমণীগণকে লইয়া এলাহাবাদে যাইতেছিল। কতক দূর গেলে পর ইহারা দুইজন শারীরিক অসুস্থতার ছলনা করিয়া ফায়েজাবাদে চলিয়া আসিয়াছে।

আজ চারিদিন হইল, ইহারা ফায়েজাবাদে পৌছিয়াছে। এখানে পৌছিয়াই অমরসিংহ হাফেজ-নন্দিনী কোথায় কিভাবে আছেন, তাহারই অনুসন্ধান করিতে লাগিল। প্রথম দিনের অনুসন্ধানে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। কিন্তু আজ তিনদিন হইল, নবাবের বাড়ির নিকটস্থিত পুষ্করিণীর পাড়ে কোনো একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে অমরসিংহের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অমরসিংহ বিলক্ষণ জানিত যে, অন্দরের কোনো একটি বাঁদীর সাহায্য ভিন্ন হাফেজ-নন্দিনীর কোনো সংবাদ পাইবার সাধ্য নাই। সুতরাং নবাবের বাড়ির নিকটস্থ পুষ্করিণীর পাড়ে একটি কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘাকার স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইয়া, অমরসিংহ ধীরে ধীরে তাহার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

'আপনি কি এই নবাব বাড়ির লোক? আপনি কি নবাবের বাড়িতে থাকেন?'

স্ত্রীলোকটি অমরসিংহের প্রশ্ন শ্রবণে একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। সে হাসির অর্থ এই যে, আমি বেগমের প্রধান বাঁদী আমাকে এই লোকটা চিনে না? এ পৃথিবীতে আমাকে চিনে না এমন লোক কি কোথাও আছে? আমি তোফেজ্জাল উন্নিসা খাতুন।

অমরসিংহ তখন আবার বিনীতভাবে বলিল,—'নবাবের অন্দরের কোনো বাঁদীর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে?'

এ প্রশ্ন শুনিয়া স্ত্রীলোকটা আরও হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল। অমরসিংহ তাহাকে এইরূপ হাস্য করিতে দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিল।

কিছুকাল পরে স্ত্রীলোকটি আত্মপরিচয় প্রদানে বলিল যে, সে অযোধ্যার বেগমের প্রধান পরিচারিকা। অন্যান্য শত শত বাঁদী তাহার অধীনে

থাকিয়া কাজ করে। স্বয়ং বেগম পর্যন্ত তাহার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া কোনো কার্য করেন না। এ পৃথিবীতে তাহাকে চিনে না এমন লোক কে আছে?

অমরসিংহ এখন স্ত্রীলোকটির হাস্য করিবার কারণ বুঝিতে সমর্থ হইল; এবং আরও অধিক বিনীতভাবে বলিল,—'তবে আপনি অবশ্য নবাব বাড়ির সকল খবরই জানেন।'

স্ত্রীলোক। আমি সকল খবর জানি না, তবে কে জানে? তুমি কি চাও?

অমরসিংহ। আজ্ঞে আমি কিছু চাহি না। সে দিন শুনিলাম যে, নবাব একজন নূতন বেগম আনিয়াছেন। তাহাকেই প্রধান বেগম করিয়া বড় অন্দরে রাখিবেন। প্রধান বেগমকে এখন খোর্দ মহলে পাঠাইয়া দিবেন।

স্ত্রীলোক। (হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিয়া) বেগমকে খোর্দ মহলে পাঠাইয়া দিবেন! এও কি সম্ভব? হাজার নূতন বেগম আসিলেও খাস্ মহলে বেগমই থাকিবেন। টাকা-কড়ি সকলই বেগমের হাতে থাকে। বেগমের লক্ষ লক্ষ টাকার জায়গির আছে। নবাবের কি আছে? নবাব তো বেগমের গোলাম।

অমরসিংহ। এই নূতন বেগম শুনিয়াছি বড় সুন্দরী!

স্ত্রীলোক। আঃ ভারি সুন্দরী। শরীরে মাংস নাই। কয়েকখানা হাড় মাত্র। দেখিতে খাট। আমাদের মতোন একটু লম্বা মোটা-সোটা না হইলে কি আর নবাব-আমির-উমরার নজর পড়ে। তবে এ ছুঁড়ী হাফেজ রহমনের কন্যা। উজীর যখন ইহাকে আনিয়াছেন, তখন কয়েক দিন বড় অন্দরে রাখিয়া, পরে খোর্দ মহলে পাঠাইয়া দিবেন।

অমরসিংহ। নূতন বেগম এখানে আসিয়াছেন পর বুঝি বেশ আমোদ-আহ্লাদে আছেন?

স্ত্রীলোক। ছাই আমোদ-আহ্লাদ। দিন-রাত্র কেবল তাহার চক্ষের জল পড়িতেছে। কাহারো সঙ্গে কথাও বলে না। কথা বলিতে জানেও না। ও কি আর উজীরকে বশ করিতে পারিবে?

অমরসিংহ। তবে বড় বেগম বুঝি ইহাকে এইরূপ দুঃখিত দেখিয়া ইহার প্রতি বিশেষ দয়া প্রকাশ করেন?

স্ত্রীলোক। বেগমের আর কাজ নাই, ঐ মেয়েটাকে দয়া করিতে যাবেন। বেগম তাকে বড় একটা জিজ্ঞাসাও করেন না। করিবেনই বা কেন।

তিনি নবাবের প্রধান বেগম। তিনি এখন যাইবেন ঐ মেয়েটার সঙ্গে কথা বলিতে? তবে বুড়া বেগমের অন্দরের জগদম্বা বেগম এ ছুঁড়ীকে মেয়ের মতোন প্রতিপালন করিতেছেন।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, পূর্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, অমরসিংহ জগদম্বা বেগমের নাম শুনিয়াই শিহরিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পরে তোফানীকে অনেক প্রশ্ন করিয়া জানিতে পায়, জগদম্বা বেগম বঙ্গদেশের নবাব মীরজাফরের স্ত্রী। এই বিষয় অবধারিত হইলে পর সে আশ্বস্ত হইল।

প্রথম দিন তোফানীর সঙ্গে অমরসিংহের আর অধিক বাক্যালাপ হইল না। এই সকল কথাবার্তার পর পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় হইয়া যাইবার সময়, অমরসিংহ তোফানীকে বলিল,—'আপনার সঙ্গে আর একবার সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি। কাল আবার আপনি কি দয়া করিয়া এখানে আসিবেন?'

তোফানী অমরসিংহের এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিল। তাহার মনে হইল যে, অমরসিংহ তাহার রূপ দেখিয়া একবারে তাহার জন্য পাগল হইয়াছে। তোফানীর মনে ইহাতে অত্যন্ত আহ্লাদ হইল। সে হাসিতে হাসিতে বলিল,—'কাল একটু অল্প বেলা থাকিতে আসিলে আমার সঙ্গে তোমার এইখানেই দেখা হইবে। এখন আর দেরী করিতে পারি না। বেগমের গোছলের সময় হইয়াছে।'

এই কথা বলিয়া তোফানী নবাব বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেল। বেগমের স্নানের সময় তোফানীকে বেগমের শরীর মার্জনা করিতে হইত।

অমরসিংহও পূর্ব অধ্যায়ের উল্লিখিত জনশূন্য ভগ্ন গৃহে আসিয়া, ছত্রসিংহের সঙ্গে একত্রে সেখানে অবস্থান করিতে লাগিল।

ইহার পর দিবস অপরাহ্নে আবার তোফানীর সঙ্গে অমরসিংহের সেই পুষ্করিণীর পাড়েই সাক্ষাৎ হইল। তোফানী অমরসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশায়, তাহার আসিবার প্রায় এক ঘণ্টা পূর্বে এখানে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। এক ঘণ্টা পরে অমরসিংহও আসিয়া উপস্থিত হইল।

আজ তোফানী অমরসিংহের সঙ্গে কথা বলিবার সময়ে নানা প্রকার কুৎসিৎ ভাব-ভঙ্গী করিতে লাগিল। ইহাতে অমরসিংহ মনে মনে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইল। কিন্তু তোফানীর সাহায্যে হাফেজ-নন্দিনীকে উদ্ধার করিবার আশায় হৃদয়স্থিত সে বিরক্তির ভাব গোপন করিতে চেষ্টা করিল।

অনেক কথা-বার্তার পর অমরসিংহ বলিল,—

'তুমি গোপনে একদিন আমাকে নবাবের অন্দরের মধ্যে লইয়া যাইতে পারিবে ?'

তোফানী একবার বলিল,—'পারিব বই কি ?' আবার কিছুকাল চিন্তা করিয়া বলিল,—'যে ধরা পড়িলে আমাদের দুই জনের মাথা কাটা যাইবে। এইরূপ দুঃসাহসের কার্য করিতে পারিব না।'

অমরসিংহ অত্যন্ত সুন্দর পুরুষ। তোফানীর ইচ্ছা, যে অমরসিংহ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ পূর্বক তাহাকে নিকা করে। কিন্তু স্ত্রীলোক শত কুচরিত্রা হইলেও একেবারে স্পষ্টাক্ষরে পুরুষের নিকট এইরূপ কথা বলিতে তাহার লজ্জা হয়। সুতরাং তোফানী ভাব-ভঙ্গী দ্বারা আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

অমরসিংহ তোফানীর সে ভাব-ভঙ্গী যেন বুঝিয়াও বুঝে না। সে কেবল হাফেজ-নন্দিনীর বিষয় প্রকারান্তরে নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিল। অনেক বাক্যালাপের পর তোফানী বলিল,—'আজ আর দেরী করিতে পারি না। বেগমের গোছলের সময় হইয়াছে। গোছলের পর তিনি নেমাজ পড়িবেন। কাল তুমি বৈকালে এই সময় না আসিও, বরং আহারের পর রাত্রে আসিবে; তাহা হইলে আমরা অনেকক্ষণ বসিয়া কথা-বার্তা বলিতে পারিব।'

অমরসিংহ তোফানীর এই কথা শুনিয়া চলিয়া গেল। তোফানীও নবাব বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিল।

আজ সেই তৃতীয় দিবস। অমরসিংহ রাত্রে ছত্রসিংহের নিকট হইতে বিদায় হইয়া তোফানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত পুষ্করিণীর পাড়ে আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এদিকে তোফানী আজ বেলা প্রহরেক থাকিতে নবাবের অন্দরের মধ্যে নিজের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্বক দর্পণ হাতে করিয়া আপন কেশবিন্যাস করিতে লাগিল। তাহার মস্তকে অধিক কেশ ছিল না। টাক্-পড়া মাথা। কিন্তু কেশবিন্যাসে যত্নের কোনো ত্রুটী হইল না। কেশবিন্যাসের পর বেগমের প্রদত্ত একখানি অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করিল। তোফানীর বদ্ধমূল সংস্কার রহিয়াছে, যে সে অত্যন্ত রূপবতী। এইরূপ সংস্কার বোধহয় অনেকানেক স্ত্রীলোকেরই আছে। কিন্তু কি স্ত্রী, কি পুরুষ, যাহাদের এইরূপ সংস্কার আছে, তাহাদিগকে আমরা দোষ দিতে পারি না। পরমেশ্বর

মনুষ্যের চক্ষু দুইটি এমন স্থানে রাখিয়াছেন, যে, মানুষ অপর সকলের মুখ দেখিতে পায়, কিন্তু তাহার নিজের মুখ দেখিবার সাধ্য নাই। সুতরাং অন্যের মুখাকৃতিতে যে সকল দোষ থাকে তাহাই কেবল তাহার চক্ষে পড়ে। নিজের মুখাকৃতির দোষ সে কখনো দেখিতে পায় না।

তোফানী কেশবিন্যাস করিয়া, উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান পূর্বক আপন শয্যার পার্শ্বে বসিয়া একাকিনী চিন্তা করিতে লাগিল—'ও বামন বড় নির্বোধ। নির্বোধ না হইলে আমাকে নিকা করিবার কথা বলে না কেন? একবার যদি বলে যে, আমাকে নিকা করিবে, আমি তৎক্ষণাৎ রাজি হইব। আমি কি আর অস্বীকার করিব? আমাকে নিকা করিবার জন্য যে ওর ইচ্ছা হইয়াছে, তা তো স্পষ্টই বুঝা যায়। ওর ইচ্ছা না হইলে, ও রোজ রোজ আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে কেন? আসল কথা, হতভাগা বামন মনে করে যে, আমি নবাবের ঘরের প্রধান বাঁদী। আমাকে নিকা করিতে চাহিলে লক্ষ টাকার কাবিন দিতে হইবে। আমি কি ওর কাছে কাবিনের দাবী করিব? ও যে সুন্দর পুরুষ, ওর কাছে আর কেহ কাবিনের দাবী করিবে না। ওর সঙ্গে আমারই মিল হয়। ও যেমন সুন্দর পুরুষ, আমিও সেইরূপ সুন্দরী। ওর সঙ্গে নিকা হইলে আমি আর এখানে থাকিব না। বেগমের নিকট বলিয়া-কহিয়া বিদায় হইয়া যাইব। কিন্তু বামন মুখ খুলে কিছুই বলে না। তবে কি আমি প্রথম ওকে মনের কথা বলিব? একেবারে লজ্জা পরিত্যাগ করিয়াই বা ওকে সে কথা কেমন করিয়া বলি! দূর হউক হতভাগা বামন, নিকা না হইলেও আমি এতদূর নির্লজ্জ হইতে পারিব না। কিন্তু যাহা হয় আজই একটা-কিছু করিতে হইবে। আর রোজ রোজ ঘরের কাজ-কর্ম ফেলে এখন ওর জন্য যাইয়া পুষ্করিণীর পাড়ে বসিয়া থাকিতে পারি না। কাল প্রায় এক প্রহর পর্যন্ত ওর জন্য অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। যদি আজ নিকা করিবার কথা বলে, তবে তো সকল দিকই রক্ষা হয়। আমারও লজ্জাটা থাকে, ওরও কার্য সিদ্ধি হয়। আর যদি কালিকার মতো চুপ করিয়া থাকে, তবে না হয় আমি নিজেই বলিব। ও বামনার কাছে আমার এত লজ্জা কি? ওতো আর আমার শ্বশুর নহে, ভাশুরও নহে। বিদেশী লোক, কে বা জানিবে, কে বা শুনিবে। এক কথা বলিব, হয় তো হইল, না হয়, নাই বা হইল। বামনার জন্য এই তিনদিন পর্যন্ত পুষ্করিণীর পাড়ে যাইতে হইতেছে। যদি নিকা অস্বীকার করে ওর গায়ে থুথু দিয়া, ওর নাকের

উপর এক কিল দিয়াচলিয়া আসিব। বেটা কি শুদ্ধাচারী বামন! একটু কাছে দাঁড়াইয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিলেও বেটা সরিয়া দাঁড়ায়।

'কাল বলিলাম যে আমি তোমাকে মুরগীর কাবাব রাঁধিয়া দিব। বেটা ঘৃণা করিয়া থুথু ফেলিতে লাগিল। বেটা বামন—ধান্ আতপ চাউল আর কলা—ও আর কাবাবের মজা কি বুঝিবে! ওর সাত পুরুষের মধ্যেও মুরগী খায় নাই—কিন্তু হিন্দুর ছেলে একবার মুরগী ধরিলে কি আর ছাড়িতে চাহিবে?

তোফানী স্বীয় প্রকোষ্ঠের দ্বার রুদ্ধ করিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছে অকস্মাৎ এরফানী আসিয়া তাহার দ্বার ধরিয়া ঠেলিতে লাগিল। তোফানী চমকিয়া উঠিয়া বলিল,—'কে কে?'

এরফানী বলিল,—'বেগমের গোছলের সময় হইয়াছে। তোকে বার বার ডাকিতেছেন।তোকে খুঁজিতে খুঁজিতে আমার প্রাণ শেষ হইয়াছে।'

তোফানী এই কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল। তাহাকে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছেদে সুসজ্জিত দেখিয়া এরফানী বলিল,—'আজ এতো সাজগোজ কেন লো?'

তোফানী। (হাস্য করিয়া) আজ আমার খসমের কাছে যাইব।

এরফানী। তোমার আবার খসম। এজন্মে তো না।

তোফানী। কেন, আমি ইচ্ছা করিলেও কি আর তোর মতো নিকা করিতে পারি না? তবে কি এখন তোর মতো যাকে-তাকে নিকা করিব?

এরফানী। চক্ষু থাকিতে কেহ তোমাকে নিকা করিবে না। তবে ইচ্ছা করিলে সেই অন্ধ লোকটা, যে নবাব বাড়ির দ্বারে ভিক্ষা করে, তার সঙ্গে জুটতে পারে।

তোফানী। সে অন্ধের কাছে কেন?

এরফানী। তুমি কেমন রূপবতী তা তো আর সে দেখিতে পায় না।

তোফানী এরফানীর উপর অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া, আর তাহার সঙ্গে কোনো কথা বলিল না, বেগমের নিকট চলিয়া গেল। বেগমকে স্নান করাইয়া সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই সেই পুষ্করিণীর পাড়ে অমরসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিল। আজ অমরসিংহ পূর্বেই আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। তোফানী মনে করিল, তাহার প্রতি অমরসিংহের প্রণয় ক্রমে ক্রমে গাঢ় হইতেছে।

ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে নানা কথা-বার্তা হইতে লাগিল। তোফানী অমর-

সিংহকে প্রকারান্তরে তাহাদের পরস্পরের বিবাহ-সম্বন্ধীয় কথার মধ্যে আনিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু অমরসিংহ সে সকল কথার উত্তর না দিয়া, কেবল বেগম এবং হাফেজ-নন্দিনীর বিষয়ের নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

অমরসিংহের মুখ্য অভিপ্রায় যে, নবাব দেশে প্রত্যাবর্তন করিলে, কোনো প্রকারে গোপনে তাহার অন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিবে। এই বিষয়ে তোফানীর সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। তোফানী দেখিল যে, ইহাকে গোপনে অন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিবার সুযোগ করিয়া না দিলে, ইহার সহিত বিবাহের বড় আশা নাই। সুতরাং প্রায় দুই ঘণ্টা কথা-বার্তার পর তোফানী বলিল,—'কাল রাত্র এগারটার সময়ে তুমি এখানে আসিবে। আমি তোমাকে স্ত্রীলোকের পোশাক পরাইয়া নবাবের অন্দরের মধ্যে লইয়া যাইব। কাল নবাব সাহেব বাড়ি আসিবেন। সকলেই আমোদ-আহ্লাদে ব্যস্ত থাকিবে। কাল যেমন সুবিধা হইবে, এমন সুবিধা আর কখনো হইবে না।'

অমরসিংহ এই কথা শুনিয়া যার-পর-নাই আনন্দিত হইল। এপর্যন্ত তোফানী তাহার কাছে দাঁড়াইয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিলেই অমরসিংহ পশ্চাতে সরিয়া যাইত। কারণ, তোফানীর কথা বলিবার সময়, তাহার মুখ হইতে অবিশ্রান্ত সুধামৃত বর্ষিত হইত। কিন্তু তোফানী তাহাকে গোপনে অন্দরের মধ্যে লইয়া যাইতে প্রতিশ্রুত হইলে পর, সে তোফানীকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত তাহার অতি নিকটে দাঁড়াইয়া কথা বলিতে দিল, আজ আর তোফানীর নিকট হইতে সরিয়া গেল না। তোফানী ভাবিল, যে অমরসিংহ আজ প্রেমের এক সিঁড়ি আরোহণ করিয়াছে।

কিন্তু অমরসিংহ মনে মনে ঠিক করিয়া বসিয়া আছে যে, গৃহে যাইবার সময় পথে নদীতে স্নান করিয়া যাইবে।

অনেক কথা-বার্তার পর পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় হইয়া আপন আপন গৃহে চলিয়া গেল। অমরসিংহ পথে গঙ্গাস্নান করিয়া ভগ্ন গৃহে প্রত্যাবর্তন পূর্বক ছত্রসিংহের নিকট সমুদয় কথা বলিল।

দশম অধ্যায়

নায়িকা—কিন্তু প্রেমিকা নহে

যে উপন্যাসের মধ্যে একজন প্রগাঢ় প্রেমিক নায়ক এবং অতি স্বরসিকা প্রেমিকা নায়িকা না থাকে, সে উপন্যাসে বঙ্গীয় পাঠক এবং পাঠিকাদিগের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে কি না বলিতে পারি না। সুবিজ্ঞ বঙ্গীয় গ্রন্থকার-দিগের কর্তৃক আজ পর্যন্ত যে সকল উপন্যাস বিরচিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের মধ্যেই প্রেমিক নায়ক এবং প্রেমিকা নায়িকার বর্তমানতা পরিলক্ষিত হয়। এই উপন্যাসের মধ্যে কোনো নায়ক নাই। অযোধ্যার বেগমকে আমরা পাঠক-গণের নিকট নায়িকা বলিয়া উপস্থিত করিতেছি। কিন্তু তিনিও প্রেমিকা নহেন। উপন্যাসের মধ্যে কোনো নায়ক নাই বলিয়া, যদি উপন্যাসটি অঙ্গহীন হইয়া থাকে, তবে পাঠকগণ লেখকের এই ত্রুটী মার্জনা করিবেন।

সুবিজ্ঞ বঙ্গীয় গ্রন্থকারদিগের লিখিত উপন্যাসের মধ্যে নায়ক প্রায়ই একজন প্রেমিক যুবক। আর নায়িকা একজন যার-পর-নাই প্রেমিকা যুবতী। ইহারা পরস্পর পরস্পরের সম্মিলন লাভার্থ উন্মত্ত-প্রায় হইয়া পড়েন। এদিকে কার্য জগতের কার্যকারণ, শৃঙ্খল, দেশাচার, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ইহাদিগের পরস্পরের সম্মিলন সম্বন্ধে ঘোর বাধা প্রদান করিতে থাকে। তখন প্রেমিক নায়ক এবং প্রেমিকা নায়িকা বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ পূর্বক সেই সকল দেশাচার এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। সংগ্রামে সকল শত্রুকে পরাজয় করিয়া অবশেষে যুবক নায়ক যার-পর-নাই প্রেমিকা নায়িকার সম্মিলন লাভ করেন। কয়েক দিন পরে তাঁহাদের সন্তানাদি হয়; এবং তৎপর তাঁহারা পুত্র-পৌত্রাদি ক্রমে পরম সুখে কাল-যাপন করিতে থাকেন। মানব-জীবনের এই অপরূপ আলেখ্যই বঙ্গীয় উপন্যাসে চিত্রিত হয়। ঈদৃশ জীবনালেখ্য বঙ্গীয় পাঠক ও পাঠিকাগণের মন সহজে আকর্ষণ করে। প্রেমরাজ্যেই বাঙালীর বীরত্ব। প্রেমিক ও প্রেমিকার উপাখ্যান বঙ্গীয় পাঠক বিশেষতঃ পাঠিকাদিগের বিশেষ সুখপাঠ্য।

কিন্তু এই উপন্যাস লেখকের প্রেমরাজ্যে প্রবেশ করিবার একেবারেই অধিকার নাই। ইহার বিরুদ্ধে প্রেমরাজ্যের দ্বার চিরকালই রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে

সুতরাং প্রেম-উপাখ্যান দ্বারা পাঠক পাঠিকাগণের মনোরঞ্জন করা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

সুশীতল বায়ু সংস্পর্শেই প্রেমের উদয় হয়; সুস্নিগ্ধ চন্দ্রালোক সংস্পর্শেই প্রেমের আবির্ভাব হয়; মেঘাড়ম্বর হইলেই প্রেমিকের প্রেমের ভাব উপস্থিত হয়; রাত্রে একটু বৃষ্টি পড়িলেই প্রেমিকের হৃদয় উথলিয়া উঠে। কিন্তু বৈশাখ মাসের দুই প্রহরের রৌদ্রের সময় কাহারো মনে প্রেমের উদয় হয় না। তবে কোনো কোনো বঙ্গীয় গ্রন্থকারকে প্রেমবীর বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদের নিকট কি বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ সকলই সমান। কি যৌবনে, কি বার্ধক্যে, সকল সময়েই তাঁহাদের হৃদয় হইতে সমভাবে প্রেমরস নির্গত হইতেছে। সর্বদাই কেবল কৃষ্ণলীলা।

এই উপন্যাসের একদিকে যদ্রূপ নায়ক নাই, পক্ষান্তরে আবার সুরসিকা নায়িকার প্রেমালাপের নাম-গন্ধও নাই। ইহাতে কেবল কর্তব্য লঙ্ঘন এবং তন্নিবন্ধন অনুতাপ স্বরূপ প্রায়শ্চিত্তের কথাই বিবৃত হইয়াছে।

পাঠক ও পাঠিকাগণ সমুদয় পুস্তক পাঠ করিয়া, আবার জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, অযোধ্যার বেগম কিরূপে এই উপন্যাসের নায়িকা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন? উপন্যাসোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রায় সকলের হৃদয়েই এক-প্রকার-না-এক-প্রকার অনুতাপানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, সকলকে এক-প্রকারে না-এক-প্রকারে আপন আপন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে। তবে অযোধ্যার বেগম নায়িকা বলিয়া কেন নির্বাচিত হইলেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।' বঙ্গীয় সুলেখকদিগের লিখিত প্রেমোপন্যাসের মধ্যে যে কয়েকটি লোকের জীবনালেখ্য চিত্রিত হয়, তন্মধ্যে যে যুবক এবং যুবতীর পেটভরা প্রেম থাকে, তাহারা দুই জনই নায়ক ও নায়িকারূপে পাঠকের নিকট পরিচিত হয়েন।

এই সকল গ্রন্থকারের সদৃষ্টান্ত অনুকরণ পূর্বক লেখক অযোধ্যার বেগমকেই নায়িকা বলিয়া পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছেন। এই উপন্যাসের লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অযোধ্যার বেগমই গুরুতর কর্তব্য লঙ্ঘন নিবন্ধন সর্বাপেক্ষা অধিক অনুতাপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন; সুতরাং প্রেমোপন্যাসে যে যুবতীর জীবনে সর্বাপেক্ষা অধিকতর প্রেম বিকসিত হয়, তিনি যদি নায়িকা হইতে পারেন, তবে কর্তব্য লঙ্ঘন এবং অনুতাপ বিষয়ক

উপন্যাসের উল্লিখিত ব্যক্তিগণ মধ্যে যিনি অধিক পরিমাণে কর্তব্য লঙ্ঘন নিবন্ধন সর্বাপেক্ষা অধিকতম কষ্ট সহ্য করেন, তিনি কেন নায়িকা হইবেন না? অতএব অযোধ্যার বেগমকে এই পুস্তকের নায়িকা বলিয়া উপস্থিত করিলে লেখক বিশেষ অপরাধী হইতে পারেন না।

বঙ্গীয় পাঠক ও পাঠিকাদিগের নিকট লেখকের আর-একটি বিশেষ বলিতে হইল। বঙ্গীয় পাঠক ও পাঠিকাগণ বলিবেন, আজ-কাল বাঙালী রমণীদিগের মধ্যে একটু সাংগ্রামিক ভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। গৃহের মধ্যে শাশুড়ী ননদিনীর সঙ্গে প্রায়ই ইঁহাদের তুমুল সংগ্রাম হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় লেখকের উচিত নহে, যে, বঙ্গমহিলাদিগকে তিনি ভীরু বলিয়া অভিহিত করেন। অন্ততঃ বঙ্গমহিলাদিগকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত লেখক মনে করিলে অনায়াসে তাহাদিগকে পুরুষের পরিচ্ছদ প্রদানান্তর নবীনানন্দ নামে অভিহিত করিয়া দুই-একটা সংগ্রামক্ষেত্রেও পাঠাইতে পারিতেন।

কিন্তু লেখক ছদ্মবেশ বড়ই ঘৃণা করেন। লেখকের মতে স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষের পরিচ্ছদ প্রদান করিয়া সমরক্ষেত্রে প্রেরণ করা উচিত নহে। বঙ্গমহিলাগণ যদি সত্য সত্যই অশ্বারোহণে সংগ্রামক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাদিগকে পাছা-পেড়ে-শাড়ি পরাইয়া কাপ্তান কমলমণি, মেজর বিমলা, কর্নেল সূর্যমুখী, ফিল্ড মার্শেল সৌদামিনী ইত্যাদি নাম প্রদানান্তর সমরক্ষেত্রে উপস্থিত করাই কর্তব্য। তাঁহারা পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া কাপুরুষতা প্রদর্শন করিবেন কেন?

পাঠক ও পাঠিকা ভিন্ন বঙ্গীয় সমালোচকদিগের নিকটও লেখকের একটি নিবেদন আছে। বিগত বিশ বৎসর পর্যন্ত বঙ্গীয় সমালোচকগণ কেবল প্রেমোপন্যাসই সমালোচনা করিতেছেন। তাঁহারা আপন আপন সংবাদ-পত্র এবং মাসিক পত্রিকা লইয়া এত ব্যস্ত থাকেন যে, পুস্তক সমালোচনা করিবার অবকাশ হয় না। কোনো উপন্যাস সমালোচনার্থ তাঁহাদের হস্তে পড়িলেই তাঁহারা উপন্যাসের লিখিত কেবল প্রেমিকার জীবনালেখ্য পাঠ করিয়াই সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু এই উপন্যাসে তোফানী ভিন্ন আর প্রেমিকা নাই; এবং তোফানীর অধ্যায় ভিন্ন আর কোথাও প্রেমের কথা নাই। সমালোচকগণ যদি কেবল তোফানীর অধ্যায় পাঠ করিয়া সমগ্র পুস্তক সমালোচনা করিতে আরম্ভ করেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহারা তোফানীকে এই পুস্তকের নায়িকা বলিয়া অবধারণ করিবেন এবং পুস্তক অযোধ্যার বেগম

নামে অভিহিত হইয়াছে বলিয়া, লেখককে নিন্দা করিবেন। তাঁহারা আরও বলিবেন, যে, লেখকের বিশুদ্ধ প্রেমিকার ছবি অঙ্কিত করিবার সাধ্য নাই।

কিন্তু লেখকের এ সম্বন্ধে বড়ই দুর্ভাগ্য। লেখক এ সংসারে কেবল তোফানীর প্রেমের ন্যায় বিশুদ্ধ প্রেমই সাধারণতঃ দেখিতে পান। সুবিজ্ঞ গ্রন্থকারদিগের বিরচিত প্রেম পন্যাসে যেরূপ প্রেমের কথা লিখিত আছে, সেইরূপ প্রেম লেখক বড় একটা দেখিতে পাইলেন না। ঈদৃশাবস্থা, ঐতিহাসিক উপন্যাসে কিরূপে মিথ্যা কথা লিখিবেন। সুতরাং লেখক বাধ্য হইয়া তোফানীকেই প্রেম বিভাগের উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন।

নায়িকা সম্বন্ধে আর অধিক ভূমিকার প্রয়োজন নাই। ভূমিকা লিখিতে গেলে, ইচ্ছা না থাকিলেও তাহা আপনা আপনিই সুদীর্ঘ হইয়া পড়ে; আমরা পাঠকদিগের নিকট এখন এ উপন্যাসের নায়িকাকে উপস্থিত করিব।

এই উপন্যাসের নায়িকা অযোধ্যার উজীর সুজাউদ্দৌলার প্রধানা স্ত্রী বউবেগম। ইনি দিল্লীর একজন প্রধান উমরার কন্যা। ইঁহাকে বিবাহ করিবার সময় উজীরকে প্রায় দুই-তিন কোটী টাকার কাবিন লিখিয়া দিতে হইয়াছিল। ইনি উচ্চ ভদ্রবংশজাতা হইলেও এত টাকার কাবিন পাইবার উপযুক্ত ছিলেন না। কিন্তু সুজাউদ্দৌলার পিতা সবদর জঙ্গ দিল্লীর প্রধান উমরা সাদত আলির কন্যা সারদউন্নিসাকে বিবাহ করিবার সময় প্রায় চারিকোটী টাকা মূল্যের সম্পত্তি কাবিনস্বরূপ লিখিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং বউবেগমের পিতাও উজীর সুজাউদ্দৌলার নিকট সেই পরিমাণ কাবিন দাবী করিলেন। উজীর সবদর জঙ্গ এবং তাঁহার পুত্র বর্তমান উজীর সুজাউদ্দৌলা এইরূপে বিবাহোপলক্ষে কাবিন প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া, অযোধ্যার রাজকোষ একেবারে শূন্য হইল। নগদ যত টাকা ছিল, তৎসমুদয়ই বেগমদিগের হস্তগত হইল। সবদর জঙ্গ এবং সুজাউদ্দৌলার কাবিন প্রদানকালে নগদ টাকা দ্বারা সমুদয় কাবিনের দেনা পরিশোধ হইল না। সুতরাং পিতা-পুত্র দুই-জনকেই আপন আপন বিবাহের সময় অনেকানেক মূল্যবান পৈত্রিক জায়গির আপন আপন স্ত্রীকে লিখিয়া দিতে হইল।

অযোধ্যায় দুই প্রকার জায়গির ছিল। নিষ্কর জায়গির আর খিরাজি জায়গির। নিষ্কর জায়গির বঙ্গদেশের নিষ্কর দেবত্র ব্রহ্মত্র জমির সদৃশ ভূমি-সম্পত্তি। আর খিরাজী জায়গির বঙ্গদেশের জমিদারীর ন্যায় করপ্রদ সম্পত্তি।

বেগমদিগের অধিকাংশ জায়গিরই নিষ্কর ছিল। বউবেগম কিম্বা সাদৎ-উন্নিসা বেগমের জায়গিরের বার্ষিক উপস্বত্ব অন্যূন বিশ-ত্রিশ লক্ষ টাকা ছিল।

উজীরের সাধারণ ধনাগারে অধিক টাকা সঞ্চিত থাকিত না। কখনো কখনো উজীরকে আপন স্ত্রী ও মাতার নিকট হইতে বহু টাকা ঋণ করিতে হইত। কিন্তু তিনি যথাসময়ে সে ঋণ পরিশোধ করিতেন।

নবাব সুজাউদ্দৌলা অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত নরপিশাচ ছিলেন। সর্বদাই তিনি ব্যভিচার ইত্যাদি কুকার্যে রত থাকিতেন। বউবেগমের এই সকল বিষয় নিবারণ করিবার কোনো ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু সময়ে সময়ে নবাবকে তাঁহার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে হইত বলিয়াই, নবাবের উপর তাঁহার কিছু প্রভুত্ব ছিল।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি বউবেগম প্রেমিকা নহেন। উত্তমর্ণ এবং অধমর্ণের মধ্যে যে সম্বন্ধ উজীর এবং তাঁহার মধ্যে প্রায় সেই সম্বন্ধই ছিল। বেগমেরা স্বামীর নিকট হইতে বিপুল অর্থ-সম্পত্তি লাভই স্বামীর ভালোবাসার চিহ্ন বলিয়া মনে করিতেন। অর্থ সম্পত্তিই তাঁহাদিগকে সুখী করিত স্বামীর হৃদয়ে একাধিপত্য করিবার চেষ্টাও তাঁহারা করিতেন না।

এ সংসারে অর্থ-সম্পত্তির লিপ্সাই মানুষকে ঘোর মোহান্ধকারে নিপাতিত করিয়, চরমে তাহাদিগকে বিনাশের দিকে পরিচালন করে। অযোধ্যার বেগম মোহান্ধকারে পড়িয়া রহিয়াছেন। ধীরে ধীরে তাঁহার জীবনতরী বিনাশের দিকে পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু সে বিষয়ে চৈতন্য নাই, সে বিষয়ে জ্ঞান নাই, ঐশ্বর্যমদে মত্ত হইয়া দিন যাপন করিতেছেন।

রোহিলা-যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। রোহিলা-যুদ্ধে নবাবের জয়লাভ হইয়াছে। অনেকানেক রোহিলা সরদারের জায়গির নবাবের হস্তগত হইয়াছে। বেগম ভাবিতেছেন, এবার রোহিলখণ্ডের মধ্যে আর কয়েকখানি বড় বড় জায়গির নবাবের নিকট হইতে চাহিয়া লইবেন। এখন নবাব বাড়ি আসিলেই হয়। বেগম নবাবের পথ চাহিয়া রহিয়াছেন এদিকে নবাব সসৈন্যে স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। ফয়েজাবাদে খবর পৌঁছিল আগামী কল্য অপরাহ্ণে নবাব রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছিবেন।

একাদশ অধ্যায়

স্বপ্ন

আজ রজনী প্রভাত হইবামাত্র ফায়েজাবাদ লোকারণ্যের কোলাহলে পরিপূর্ণ হইল। নগরবাসী কি বণিক, কি দোকানদার সকলেই আপন আপন গৃহপ্রাঙ্গন সুসজ্জিত করিতে লাগিল। প্রত্যেক গৃহদ্বারে কদলীবৃক্ষ রোপিত হইল। শহরের বালকগণ নিশান হাতে করিয়া দলে দলে পথ রোধ করিয়া চলিতে লাগিল। সময় সময় ইহারা 'ঐ নবাবের সৈন্য দেখা যায়' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতে লাগিল। ইহাদের কথায় প্রতারিত হইয়া দোকানদার এবং পসারিগণ হাতের কাজ পরিত্যাগ পূর্বক বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। কেহ কেহ এইরূপ প্রতারিত হইয়া শালা, বজ্জাত, মিথ্যাবাদী ইত্যাদি সুললিত শব্দে বালকদিগকে অভিহিত করিতে লাগিল।

নবাবের প্রাসাদেও আজ বিশেষ সমারোহ হইতে লাগিল। প্রাতঃকাল হইতেই দলে দলে গায়িকা, নর্তকী, বাদ্যকর আসিয়া নবাব বাড়ি পরিপূর্ণ করিল। এক একদল বাদ্যকর অন্যান্য দলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবার নিমিত্ত এক-একজন প্রধান প্রধান উম্‌রা-আমিরের নিকট আপন আপন বিদ্যার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। এদিকে রাত্রি প্রায় চারি দণ্ড থাকিতে নহবতের বাদ্য আরম্ভ হইল। রজনী প্রভাত হইবার পূর্বেই নগরবাসী এবং রাজপ্রাসাদ-বাসিদিগের নিদ্রা ভঙ্গ হইল।

নবাবের বড় অন্দরে তাঁহার স্ত্রী বহুবেগম এবং জননী সাদরউন্নিসা বেগম বিশেষ হর্ষোৎফুল্ল অন্তরে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বাঁদীদিগকে গৃহ সুসজ্জিত করিতে আদেশ করিতেছেন। এদিকে তাঁহারা নিজে বিবিধ রত্নাভরণ এবং অতি মূল্যবান সুচারু বসন পরিধান পূর্বক সুসজ্জিত হইতেছেন।

আজ ফায়েজাবাদে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই হর্ষোৎফুল্ল বদন, সকলেই নবাবের আগমন সংবাদে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু নবাব প্রাসাদবাসিনী তিনটি স্ত্রীলোক কোনোপ্রকার আমোদ-আহ্লাদেই যোগ দিতেছেন না। অদ্যকার শুভদিন তাঁহাদের অন্তরে কোনো প্রকার পরিবর্তনই আনয়ন করে নাই। তাঁহারা পূর্ব দিনও যেভাবে ছিলেন, আজও সেইভাবে সময়াতিপাত করিতেছেন।

এই তিন জনের মধ্যে একজনের বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসরের অধিক হইয়াছে। ইনি যখন অতুল ঐশ্বর্য এবং সম্পদের অধিকারিণী ছিলেন, তখনো সাংসারিক পদ প্রভুত্ব ইঁহাকে মুহূর্তের নিমিত্তও সুখী করে নাই, বরং সাংসারিক সুখ সম্পদের, সাংসারিক ঐশ্বর্যের ক্রোড়-ভ্রষ্টা হইয়াছেন পর, এখন ইঁহার জীবনে দুঃখ-কষ্ট-প্রদ-ঘটনা অত্যল্পই ঘটিয়া থাকে। ইঁহার বর্তমান নাম জগদম্বা বেগম। ইনি বঙ্গের নবাব মীরজাফরের সহধর্মিনী এবং মীরকাসিমের শশ্রূ।

দ্বিতীয়া স্ত্রীলোকটির বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর হইবে। ইনি পরমাসুন্দরী দেখিতে কৃশাঙ্গী। ইঁহার মুখ-কমল বিমর্ষের ছায়ায় সমাবৃত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সেই বিষাদপরিপূর্ণ মুখকমল হইতে ধর্ম এবং পবিত্রতার জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছে। ইঁহার হস্তে সর্বদাই একখান কোরান থাকে। বিগত দশবৎসর পর্যন্ত কোরান পাঠ ভিন্ন ইহার অন্য কোনো কাজ নাই। কখনো বৃদ্ধা জননীকে কোরান পাঠ করিয়া শুনাইতেছেন; কখনো বা নির্জনে বসিয়া মনে মনে কোরান পাঠ করিতেছেন। সমুদয় কোরানখানি ইঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া পড়িয়াছে। ইঁহাকে হাফেজ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইংরাজ-দিগের বাইবেলে যদ্রূপ লিখিত আছে, 'Seek ye after ME and every thing shall be given unto you'—অর্থাৎ আমাকে পাইতে চেষ্টা কর, আমার অনুসন্ধান কর, তবে পৃথিবীর সকলই তুমি পাইবে। ঠিক এই প্রকার ভাব পরিপূর্ণ কিন্তু প্রকারান্তরে লিখিত কোরানের একটি কথা ইনি প্রত্যহ এক-একবার পাঠ করিয়া অশ্রুবিসর্জন করিতেন। সময় সময় নির্জনে বসিয়া প্রোগুক্ত কথাটি পাঠ করিবার পর আপনা আপনি বলিতেন,—'হে পরমেশ্বর সম্পদ ও ঐশ্বর্যের মধ্যে যখন ছিলাম তখন একবারও তোমাকে পাইবার চেষ্টা করি নাই। সম্পদ এবং ঐশ্বর্য যে গিয়াছে সে ভালোই হইয়াছে'।

এই ধার্মিকা রমণী বঙ্গের শেষ সুবাদার মুসলমান-[illegible]-তিলক মীরকাশিমের স্ত্রী, নবাব মীরজাফরের জ্যেষ্ঠা কন্যা।

ইঁহারা দুই জন ভিন্ন আর একটি রমণী অদ্যকার আনন্দোৎসবে যোগদান করেন নাই। ইনি সেই দেববালা হাফেজ-নন্দিনী। আজ প্রায় দশ-বার-দিন হইল পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় উজীরের প্রাসাদে মৌনব্রতাবলম্বন পূর্বক কাল যাপন করিতেছেন। নবাবের অন্দরে প্রবেশ করিবার

পর পাঁচ-ছয়দিনের মধ্যে ইনি কাহারো সহিত একটি কথাও বলেন নাই এখানে আসিবার পর ইহার মধ্যে ঘোর পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছে। যখন জননীর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তখন ইহার কথাবার্তা ভাব-ভঙ্গী দেখিলে সরলা বালিকা বলিয়া বোধ হইত। সংসারের ভালো-মন্দ তখন কিছুই বুঝিতেন না। তখন ইহার ব্যবহার এবং কাজের মধ্যে পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকার সরলতা পরিলক্ষিত হইত। প্রত্যেক কায এবং ঘটনা উপলক্ষে জননীর উপর নির্ভর করিতেন।

কিন্তু ফায়েজাবাদ আসিবার পর আর সে ভাব নাই। এখন ইহার প্রত্যেক কায এবং ব্যবহারের মধ্যে একজন প্রবীণা রমণীর ভাব পরিলক্ষিত হয়। ইহার পূর্বাবস্থার সহিত বর্তমান অবস্থা তুলনা করিলে বোধহয়, যেন বিপদ একদিনের মধ্যে একটি পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকাকে প্রৌঢ়াবস্থা প্রদান করিয়াছে।

নহবতের বাদ্য এবং লোকের কোলাহলে আজ নবাব-প্রাসাদবাসিনী রমণীগণ রাত্রি প্রায় দুই দণ্ড থাকিতে জাগ্রত হইয়াছেন। কিন্তু হাফেজ-নন্দিনীর এখনো নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই। ফায়েজাবাদ পৌঁছিবার পর হইতে এক রাত্রিও ইহার সুনিদ্রা হয় নাই। কিন্তু আজ বিলক্ষণ নিদ্রা যাইতেছেন।

হাফেজ-নন্দিনীকে জগদম্বা বেগম কন্যার ন্যায় স্নেহ করেন। সুতরাং তিনি জাগ্রত হইয়া, নেমাজ পড়িবার পর, ধীরে ধীরে হাফেজ-নন্দিনীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। হাফেজ-নন্দিনী এখনো নিদ্রা যাইতেছেন। জগদম্বা বেগম জানিতেন যে, হাফেজ-নন্দিনী ফায়েজাবাদ আসিয়াছেন পর তাঁহার নিদ্রা হয় না। সুতরাং তাঁহাকে জাগ্রত না করিয়া, ধীরে ধীরে তাঁহার শিয়রে যাইয়া দাঁড়াইলেন। অনিমিষ নেত্রে তাঁহার সেই সরলতা এবং পবিত্রতা পরিপূর্ণ মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন। শায়িতাবস্থার সেই অপরূপ রূপরাশির আধার হাফেজ-বালা তখন সত্য সত্যই জগদম্বার নিকট দেববালা বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। জগদম্বার প্রগাঢ় ইচ্ছা হইল যে, তাঁহার মুখকমল এখন একবার চুম্বন করেন। কিন্তু পাছে হাফেজ-নন্দিনীর নিদ্রা ভঙ্গ হয়, সেই আশঙ্কায় আপন হৃদয়ের প্রগাঢ় বাসনা সম্বরণপূর্বক আবার একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

নিদ্রাবেশে এখন হাফেজ-নন্দিনীর মুখখানি একটু বিকৃত হইল। তিনি স্বপ্নাবেশে বলিয়া উঠিলেন,—'বাবা আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও—বাবা! আমি তোমার সঙ্গে যাইব।'

এই কয়েকটি কথা তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইবামাত্র তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষু উন্মীলন করিবামাত্র দেখেন জগদম্বা বেগম তাঁহার শিয়রে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে হাফেজ-নন্দিনী ফায়েজাবাদ পৌঁছিবার পর পাঁচ-দিনের মধ্যে কাহারো সহিত বাক্যালাপ করেন নাই। কিন্তু চারি-পাঁচদিবস পরে, তিনি জগদম্বা বেগম এবং তাঁহার কন্যার সহিত কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আজ দুই-দিন হইতে জগদম্বাকে মা বলিয়া এবং তাঁহার কন্যাকে ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন।

নিদ্রা ভঙ্গের পর জগদম্বাকে শিয়রে দেখিয়া হাফেজ-নন্দিনী গাত্রোত্থান পূর্বক মা! মা! বলিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন। এবং সজল নয়নে ক্রন্দন করিতে বলিতে লাগিলেন,—'মা! এতক্ষণ স্বপ্নে বাবার সঙ্গে কথা বলিতেছিলাম। বাবা আমাকে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।'

জগদম্বা বেগম হাফেজ-নন্দিনীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে তিনি ক্রন্দন সম্বরণ পূর্বক আবার বলিতে লাগিলেন,—

'মা, আজ সমস্ত রাত্রি নানা প্রকার স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। প্রথম রাত্রে দেখিলাম, একটা রাক্ষসাকৃতি পুরুষ আমাকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত হাঁ করিয়া আমার দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে। আমি তখন প্রাণের ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলাম। কিন্তু রাক্ষস আমার নিকটে আসিবামাত্র আমার পশ্চাৎ হইতে আমার পিতা এবং আর একজন বীরপুরুষ তাহাকে ধৃত করিলেন। সেই বীর পুরুষ রাক্ষসকে ধরাতলে ফেলিয়া তাহার বক্ষের উপর উপবেশন করিলেন। তখন আমার পিতা সেই বীরপুরুষের হস্তে একখানি ছুরিকা প্রদান করিলেন। বীর পুরুষ সেই ছুরিকা রাক্ষসের বুকের মধ্যে প্রবিষ্ট করিলেন। অতি বিকট চীৎকারের পর রাক্ষসের মৃত্যু হইল।

'এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া, একবার জাগ্রত হইয়াছিলাম। জাগ্রতাবস্থায়ও সেই রাক্ষসের আকৃতি স্মরণ হইবামাত্র আমার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। কিছুকাল শয্যোপরি বসিয়াছিলাম। তৎপর আবার নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিলাম। অত্যল্প কাল মধ্যেই আমার নিদ্রা হইল। তখন আবার স্বপ্নে দেখিতে লাগিলাম, আমার পিতা সেই পূর্বের বীরপুরুষকে সঙ্গে করিয়া আমার নিকটে আসিয়া বসিলেন। বীরপুরুষের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন,—'বাছা! তুমি ইঁহাকে পূর্বে আর কখনো দেখ নাই। তোমার

জন্মিবার দীর্ঘকাল পূর্বে ইহার মৃত্যু হইয়াছিল। ইনি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আলি মহম্মদ—তোমার জ্যেষ্ঠতাত পুত্র। ইহার দ্বারাই রোহিলা রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল।

'পিতা এই কথা বলিবামাত্র সেই বীরপুরুষ দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্বক স্বর্গের দিকে চাহিয়া, এবং বামহস্ত দ্বারা আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন;—হে পরমেশ্বর, যে মহৎ প্রতিহিংসার ভাবে আমার মন উত্তেজিত হইয়াছিল বলিয়া, আমি বাণিজ্য ব্যবসায় পরিত্যাগ পূর্বক সাংগ্রামিক জীবন অবলম্বন করিয়াছিলাম; যে মহৎ প্রতিহিংসা সর্বদা আমার মনে জাগ্রত ছিল বলিয়া, আমি সংগ্রামক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেই উত্তেজিত হইয়া পড়িতাম; আজ আমার হৃদয় হইতে পিতৃবৈর-নির্যাতনের সেই মহৎ প্রতিহিংসার ভাব এই পবিত্র বালিকার হৃদয়ে প্রবেশ করুক।—

'আমি এই বীরপুরুষের কথার ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি অবাক হইয়া পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

'তখন আমার পিতা আমাকে বলিতে লাগিলেন—বাছা তোমার জ্যেষ্ঠতাত দাউদ খাঁর নাম তুমি কখনো শুন নাই?

'আমি বলিলাম আপনার মুখে কতবার শুনিয়াছি।

'বাবা আবার বলিতে লাগিলেন—'কমাউনের রাজা অন্যায় পূর্বক আমার সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দাউদ খাঁর প্রাণ বিনাশ করিয়াছিলেন বলিয়াই, আলি মহম্মদ পিতৃ-বৈর-নির্যাতনার্থে সাংগ্রামিক জীবন অবলম্বন করিয়াছিলেন। দাউদ খাঁর মৃত্যুই আলি মহম্মদের হৃদয়-মন বীর-রসে পরিপূর্ণ করিয়াছিল। আলি মহম্মদই রোহিলা রাজ্য সংস্থাপক। রোহিলখণ্ডবাসী কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলেই যেন আলি মহম্মদের পদানুসরণ করেন।—

'এই বলিয়া আমার পিতা এবং সেই বীরপুরুষ অন্তর্হিত হইলেন। আমি স্বপ্নাবেশে চীৎকার করিয়া উঠিলাম,—বাবা আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও। বাবা আমি তোমার সঙ্গে যাইব।—

জগদম্বা স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হইলেন। জগদম্বা বিশ্বাস করেন যে স্বপ্নে সময় সময় মৃত আত্মীয়-স্বজন আসিয়া সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু হাফেজ-নন্দিনীকে আবার ক্রন্দন করিতে দেখিয়া তিনি তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, স্বপ্নের কথা আর মনে স্থান দিলেন না।

দ্বাদশ অধ্যায়

কুলক্ষণ

জগদম্বা বেগম হাফেজ-নন্দিনীর প্রকোষ্ঠ মধ্যে বসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতেছেন। কিছুকাল পরে জগদম্বার কন্যা মীরকাসিমের পত্নী কোরান হস্তে করিয়া সেখানে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র হাফেজ-নন্দিনী বলিলেন,—

'দিদি, আজ একবার আমার নিকট কোরান পাঠ কর। আমার মনে হইতেছে যেন, সত্বরই আমাকে এ সংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে।'

মীরকাসিমের স্ত্রী তখন কোরান খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন,—

'সূর্যের ন্যায় তেজস্বী হইবে। চন্দ্রের ন্যায় নির্মল ও সুস্নিগ্ধ হইবে।'

মীরকাশিমের স্ত্রী এই কথাটি পাঠ করিবামাত্র হাফেজ-নন্দিনী বলিলেন,—

'দিদি, মানুষের সূর্যের ন্যায় তেজস্বী হইবার প্রয়োজন কি? কেবল চন্দ্রের ন্যায় নির্মল এবং সুস্নিগ্ধ হইলেই ভালো হয়। চন্দ্রালোক দর্শনে সকলের হৃদয়ই আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। চন্দ্রের সুশীতল কিরণ সকলের মনেই শান্তি প্রদান করে। কিন্তু সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপ, সর্বদাই অসহনীয় বলিয়া বোধ হয়।'

মীরকাসিমের স্ত্রী বলিলেন,—'সূর্যের তেজে সংসারের সকল প্রকার পাপ, দুর্নীতি এবং অত্যাচার বোধহয় ভস্মীভূত হয়। আর চন্দ্রালোক পৃথিবীকে নির্মল ও সুস্নিগ্ধ করে। সুতরাং পৃথিবীতে চন্দ্র ও সূর্য উভয়েরই প্রয়োজন রহিয়াছে। সূর্যের তেজে সংসারের পাপ এবং দুর্নীতি বিনষ্ট না হইলে, চন্দ্রালোক পৃথিবীকে কিরূপে নির্মল করিবে? পরমেশ্বর এই নিমিত্তই চন্দ্র-সূর্য উভয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। আর রসুল এবং পয়গম্বরগণ মানুষকে চন্দ্র-সূর্য উভয়ের প্রকৃতি লাভ করিতে বলিয়াছেন।'

হাফেজ-নন্দিনী বলিলেন,—'দিদি, আমি চন্দ্রের ন্যায় নির্মল এবং সুস্নিগ্ধ হইতে ইচ্ছা করি। সূর্যের তেজ আমার ভালো বোধহয় না। তুমি এখন যে কথা পাঠ করিলে, এই কথা বাবা কতবার আমার নিকট পাঠ করিয়াছেন। বাবার পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সের সময় আমার জন্ম হইয়াছে। আমি তাঁহার শেষ সন্তান। তিনি সর্বদাই আমাকে ক্রোড়ে করিয়া রাখিতেন। আমি বড়

হইয়াও বাবার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম। বাবা বলিতেন, চন্দ্রের মৃদুতা বালিকা-জীবন সুশোভিত করে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সূর্যের তেজেরই অধিক প্রয়োজন।

'দিদি, এ কথা কি সত্য? কেবল বাল্যকালে চন্দ্রের ন্যায় নির্মল হইতে হয়, আর বয়স হইলে সূর্যের ন্যায় প্রখর হইতে হইবে? কত বৎসর বয়স হইলে সূর্যের তেজ মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে? আমার এখন ষোল বৎসর বয়স হইয়াছে।'

মীরকাসিমের স্ত্রী বলিলেন,—'তুমি আজ এত আগ্রহাতিশয় সহকারে এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? আজ তোমার কথা-বার্তা এবং ব্যবহারে বিশেষ পরিবর্তন দেখিতেছি। তোমার কি হইয়াছে বল দেখি?'

হাফেজ-নন্দিনী বলিলেন,—'আজ শেষ রাত্র হইতে আমার মনে হইতেছে, যেন, বাবা আমাকে তাঁহার নিকটে যাইতে বলিতেছেন। বাবাকে রাত্রে দুইবার স্বপ্নে দেখিয়াছি। বোধহয় আমাকে আজই এই স্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে।'

হাফেজ-নন্দিনীর এই সকল কথা শুনিয়া জগদম্বার মন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইল। জগদম্বা বেগম সংসারের সমুদয় কার্য কলাপের মধ্যেই ঈশ্বরের হস্ত নির্দেশ করিতেন। তাঁহার মন স্বভাবতঃই অত্যন্ত ধর্মভাবে পরিপূর্ণ ছিল। সংসারের প্রত্যেক ঘটনা এবং প্রত্যেক কার্যের মূলে একটা-না-একটা কারণ রহিয়াছে বলিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু কোনো বিষয়ের কার্য-কারণ-শৃঙ্খল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, যখন কোনো কারণ অবধারণ করিতে অসমর্থা হইতেন, তখন মনে করিতেন যে, ঈশ্বরের মঙ্গল হস্তই ইহার মূলে নিহিত রহিয়াছে। তিনি সর্বদাই বলিতেন,—'মানুষ ঈশ্বরের হস্তের পুত্তলিকা। এ সংসারে তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন কিছুই হয় না।'

প্রাতঃকালে হাফেজ-নন্দিনীর স্বপ্নের কথা শুনিয়াই জগদম্বা মনে মনে নানা চিন্তা করিতেছিলেন। কিন্তু এখন আবার তাঁহার এই সকল কথা শুনিয়া, তিনি স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন যে, আজ পিতৃহীনা নিরাশ্রয়া বালিকার নিশ্চয়ই কোনো অমঙ্গল ঘটিবে। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, যে উজীর সুজাউদ্দৌলা আজ বাড়ি আসিবেন। হয় তো তাঁহার আগমনেই এই নিরাশ্রয়া বালিকার কোনো ঘোর অনিষ্ট হইবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া, তিনি সুজাউদ্দৌলার জননী সাদরউন্নিসা বেগম এবং সুজার স্ত্রী বউবেগমের নিকট চলিয়া গেলেন

মীরকাসিমের স্ত্রী হাফেজ-নন্দিনীর প্রকোষ্ঠে বসিয়া তাঁহার সহিত কথা-বার্তা বলিতে লাগিলেন।

সায়দউন্নিসা বেগম এবং বউবেগম উভয়ে অন্দরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ সুসজ্জিত করিবার নিমিত্ত বাঁদীদিগকে হুকুম করিতেছেন। পাঠকদিগের পূর্ব-পরিচিতা প্রেমিকা তোফানী এবং এরফানী প্রভৃতি আর দশ-বারজন বাঁদী বিশেষ উৎসাহের সহিত সেখানে কার্য করিতেছে।

বাঁদীগণের মধ্যে কেহ স্বর্ণ-নির্মিত ঝাড়, ফুলদান, আতরদান ইত্যাদি মূল্যবান গৃহসামগ্রী পরিষ্কার করিতেছে। কেহ মণি-মুক্তা-মণ্ডিত বিবিধ শখের জিনিস প্রকোষ্ঠ মধ্যে যথাস্থানে সুসজ্জিত করিয়া রাখিতেছে।

জগদম্বা প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলে পর শাশুড়ী এবং পুত্রবধূ বিশেষ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। তিনি আসন গ্রহণান্তর পর বউবেগম এবং সায়দউন্নিসা বেগমকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন,—'আপনাদের দুই জনের নিকট আমি একটা কথা বলিতে আসিয়াছি। আমার একটি অনুরোধ রাখিবেন কি?'

সায়দউন্নিসা অতি ভদ্রবংশজাতা রমণী। নবাব জাফর আলির স্ত্রী রাজ্যভ্রষ্টা হইয়া তাঁহার গৃহে অবস্থান করিতেন বলিয়া, তিনি সর্বদাই তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করিতেন। জগদম্বার প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন,—'আপনার অনুরোধ আমি অবশ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব।'

তখন জগদম্বা বলিতে লাগিলেন,—'আজ নবাব সুজা বাড়ি আসিবেন। তিনি হয়তো কোন অসদ্ অভিপ্রায়ে হাফেজ-নন্দিনীকে এখানে আনিয়াছেন। কেবল বন্দীস্বরূপ কয়েদ করিবার নিমিত্ত ইহাকে আনিলে, নিশ্চয়ই ইহার জননীর সঙ্গে ইহাকে এলাহাবাদে প্রেরণ করিতেন। আমি অনুরোধ করি আপনারা সুজার অজ্ঞাতে ইহাকে স্থানান্তরে কোথাও প্রেরণ করুন। আমার মনে হইতেছে যে, হাফেজ-নন্দিনী এখানে থাকিলে তাহার বিশেষ কোনো অমঙ্গল উপস্থিত হইবে। আমি আজ অনেক কুলক্ষণের কারণ দেখিতেছি।'

সায়দউন্নিসা। সুজা নিশ্চয়ই ইহাকে নিকা করিবার অভিপ্রায়ে এখানে পাঠাইয়াছেন। নহিলে ইহার মাতার সঙ্গে ইহাকে এলাহাবাদে প্রেরণ করিতেন।

জগদম্বা। কিন্তু হাফেজ-নন্দিনী বোধহয় সুজাকে নিকা করিতে কখনোও সম্মত হইবেন না।

সায়দউন্নিসা। স্ত্রীলোকের আবার একটা সম্মতি-অসম্মতি কি? বন্দীস্বরূপ যখন সুজার হাতে পড়িয়াছে, তখন সুজা উহাকে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবেন।

জগদম্বা। আপনি হাফেজ-কন্যাকে সামান্য স্ত্রীলোক বলিয়া মনে করিবেন না। সুজা বলপূর্বক তাহাকে নিকা করিতে চাহিলে সে নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিবে।

সায়দউন্নিসা। আত্মহত্যা যে করিবে, তাহা বোধহয় না। কিন্তু তাহা হইলেই বা আমরা কি করিতে পারি। এখন কি আমি পুত্রের সঙ্গে এইজন্য বিবাদ করিব;

জগদম্বা। স্ত্রীলোকের প্রাণ অপেক্ষাও ইজ্জৎ বড়। এই পিতৃহীনা দুরবস্থাপন্না যুবতীর ইজ্জৎ রক্ষার্থ আপনাদের দুই জনেরই চেষ্টা করা উচিত। আপনারা এখনই ইহাকে স্থানান্তরে প্রেরণ করুন।

সায়দউন্নিসা। সুজার অজ্ঞাতে ইহাকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিলে, সুজা আমাদিগের প্রতি যার-পর-নাই কোপাবিষ্ট হইবেন।

জগদম্বা। তিনি কোপাবিষ্ট হইলেই বা কি? তিনি তো আর আপনাদের প্রাণদণ্ড করিতে পারিবেন না?

সায়দউন্নিসা। সুজার সঙ্গে বিবাদ করিলে কি আমাদের রক্ষা আছে? এখনই আমাদের সমুদয় অর্থ সম্পত্তি বলপূর্বক হরণ করিবেন। আমাদিগের জায়গির হইতে আমাদিগকে বেদখল করিবেন। আমরা কি সুজার সঙ্গে বিবাদ করিতে পারি।

জগদম্বা। এ সংসারে ধন-সম্পত্তি সকল সময়েই বিনষ্ট হইতে পারে। কেবল টাকা এবং জায়গিরের নিমিত্ত এই কর্তব্য প্রতিপালনে বিরত থাকিবেন না। আপনারা স্ত্রীলোক হইয়া এই নিরাশ্রয়া পিতৃহীনা বালিকাকে রক্ষা না করিলে ইহার জন্য ঈশ্বরের নিকট আপনাদিগকে দায়ী হইতে হইবে।

সায়দউন্নিসা। কোনো নবাব কোনো স্ত্রীলোককে নিকা করিবার ইচ্ছা করিলে তাহার মাতা কিম্বা স্ত্রী কি কখনোও তাঁহাকে এইরূপ কার্য হইতে বিরত রাখিতে পারেন? আপনি কখনো শুনিয়াছেন, কিম্বা দেখিয়াছেন, যে কোনো নবাবের মাতা কিম্বা স্ত্রী তাহাকে এইরূপ কার্য হইতে বিরত রাখিতে সমর্থা হইয়াছেন?

জগদম্বা। কেবল শুনিব কেন? আমি নিজেই আপন গর্ভজাত কুপুত্র

নবাব নসিরাল্ মুলুকের * হস্ত হইতে অনেকানেক স্ত্রীলোককে রক্ষা করিয়াছি। আপনি যদি পুত্রের মঙ্গল কামনা করেন, তবে তাঁহাকে এ কুকার্য হইতে বিরত রাখিতে চেষ্টা করুন। দুর্বৃত্ত নসিরাল মুলুকের লোকেরা তিনটি ব্রাহ্মণ কন্যাকে ধৃত করিয়া আনিয়াছিল। সেই ব্রাহ্মণ-কন্যাত্রয়ের মধ্যে বয়োধিকা রমণী নসিরাল মুলুককে অভিসম্পাত পূর্বক বলিল,—যে, বিনা মেঘে বজ্রপাত হইয়া ইহার মৃত্যু হইবে। কিন্তু কি আশ্চর্য! ব্রাহ্মণ-কন্যার বাক্য নিষ্ফল হইল না। বিনা মেঘে বজ্রপাত হইয়াই মীরণের মৃত্যু হইল; সে ব্রাহ্মণ কন্যার কথাবার্তা শুনিয়া তাঁহার প্রতি আমার এতদূর শ্রদ্ধা হইয়াছিল, যে তাঁহার নামানুসারেই আমি জগদম্বা নাম ধারণ করিয়াছি।'

বউবেগম জগদম্বার ওই কথা শুনিয়া বলিলেন,—'আপনি একটা কাফের নাম গ্রহণ করিলেন কেন?'

জগদম্বা বলিলেন,—'কাফের বলিয়া হিন্দুদিগকে ঘৃণা করিবেন না। নবাব আলিবর্দির ন্যায় বুদ্ধিমান লোক নবাবদিগের মধ্যে আর কেহই ছিলেন না। সেই আলিবর্দি একজন বৃদ্ধ কাফের পণ্ডিতের পরামর্শানুসারে সমুদয় রাজকার্য নির্বাহ করিতেন। সে পণ্ডিতকে তিনি আপন খানসামা বলিতেন। মুর্শিদাবাদের নবাবদিগের মধ্যে কেবল আলিবর্দিই এক স্ত্রীতে অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার একটি ভিন্ন দুইটি স্ত্রী ছিল না। তাঁহার দ্বিতীয় অন্দর ছিল না। আলিবর্দির সেই বৃদ্ধ পণ্ডিতের মুখে আমি অতি শৈশবাবস্থায় তিনটি কথা শুনিয়াছিলাম। সেই তিনটি কথা বাল্যকাল হইতেই আজ পর্যন্ত আমার হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। আজীবন সে কথা কয়েকটি স্মরণ থাকিবে। নবাবগণ যদি নির্বিঘ্নে রাজত্ব করিতে ইচ্ছা করেন, বেগমেরা যদি আপন আপন স্ত্রী-ধর্ম পালন করিতে চাহেন, জননী যদি সুপুত্র লাভ করিতে বাসনা করেন, তবে সেই কাফের পণ্ডিতের উপদেশ তিনটিই প্রতিপালন করিতে হইবে। বুদ্ধিমান নবাব এবং বাদসাহগণ হিন্দুদিগকে কাফের বলিয়া ঘৃণা করেন না। আকবর এবং আলিবর্দি ইহাদিগের মহত্ব বুঝিতে পারিয়াছিলেন।'

জগদম্বার বাক্যাবসানে সায়দউন্নিসা এবং বউবেগম উভয়েই অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কাফের পণ্ডিত কি তিনটি উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন?'

---

* মীরজাফরের পুত্র মীরণের নাম নবাব নসিরাল মুলুক।

জগদম্বা বলিলেন,—'তাঁহার সেই উপদেশের কথা বলিতে হইলে, আমার জীবনের সমুদয় ঘটনা বলিতে হয়। তাঁহার মুখে যে তিনটি কথা শুনিয়াছিলাম সে তিনটি কথাই আমার জীবনে ফলিয়াছে।'

অযোধ্যার বেগমদ্বয় বিশেষ আগ্রহাতিশয় সহকারে জগদম্বাকে সেই সকল কথা বলিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি আত্মবিবরণ বিবৃত করিতে আরম্ভ করিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কাফেরের তিনটি উপদেশ

জগদম্বা আত্মবিবরণ বিবৃত করিতে আরম্ভ করিয়া বলিলেন,—'আমার পিতা আলিবর্দি খাঁর একজন বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন। আলিবর্দির সিংহাসনারোহণের পূর্বেই কোনো এক সংগ্রাম উপলক্ষে তাঁহার মৃত্যু হইল। আলিবর্দির স্ত্রী অত্যন্ত সহৃদয়া পুণ্যবতী ছিলেন। তিনি আমাকে এবং আমার জননীকে আপন গৃহে আশ্রয় প্রদান করিলেন। দুই বৎসর পরেই আমার জননীরও মৃত্যু হইল। তখন আলিবর্দির স্ত্রীই আমাকে জননীর ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

'ইহার কয়েক বৎসর পরে আলিবর্দি বঙ্গের সুবাদার হইলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘেসিতি বেগমের এবং আমার প্রায় একই সমান বয়স ছিল। তিনি আমাকে ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করিতেন। ঘেসিতি বেগম ভিন্ন আলিবর্দির আর দুই কন্যা ছিল। আমরা চারিজনেই চারিটি ভগ্নীর ন্যায় একত্রে আহার-বিহার করিতাম। আলিবর্দি খাঁ যখন যখন খাস দরবারে তাঁহার বৃদ্ধ পণ্ডিতকে লইয়া বসিতেন, তখন সময়ে সময়ে আমরা চারি ভগ্নী সেখানে যাইয়া বসিতাম। সেই বৃদ্ধ পণ্ডিত এবং নবাব আলিবর্দি আমাদিগকে লইয়া অনেক আমোদ-আহ্লাদ করিতেন। পণ্ডিতও আমাদিগকে অত্যন্ত ভালোবাসিতেন। তিনি জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ ছিলেন, কিন্তু মুখে সর্বদাই হাস্য-পরিহাসের কথা বলিতেন।

'এক দিন সেই বৃদ্ধ পণ্ডিত হাসিতে হাসিতে, আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—'তোমরা চারিজন আমাকে বিবাহ করিবে?'

'আমরা তখন তাঁহার কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলাম। কিন্তু ঘেসিতি বেগম বাল্যকাল হইতেই বড় মুখরা ছিলেন। তিনি বলিলেন,—পণ্ডিত, আমাদিগকে বিবাহ করিলে তোমার জাতি যাইবে।

'পণ্ডিত আবার হাস্য করিয়া বলিলেন,—তোমাদের মস্তক মুণ্ডন করিয়া, তোমাদিগকে বৈষ্ণবী করিব।

'আলিবর্দি বলিলেন,—আমার কন্যারা বৈষ্ণবী হইবে কেন?

'ইহার প্রত্যুত্তরে পণ্ডিত বলিলেন—না, বৈষ্ণবী হইবে না, কিন্তু বেশ্যা হইতে হইবে। বৈষ্ণবী এবং বেশ্যার প্রায় এক প্রকারই ধর্ম। তবে বৈষ্ণবী হইলে সমাজে কোনো গ্লানি থাকে না। তাই তোমার উপকারার্থ এই প্রস্তাব করিয়াছিলাম।

'আলিবর্দি আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—আমার কন্যারা বেশ্যাই বা হইবে কেন! ইহারা সকলেই নবাবের বেগম হইবেন।

'পণ্ডিত বলিলেন,—নবাবের বেগমদিগকেই আমি বেশ্যা বলিয়া মনে করি। তবে আপনার বেগমই কেবল স্ত্রী-ধর্ম প্রতিপালন করিতে কৃতকার্য হইয়াছেন।

'আলিবর্দি জিজ্ঞাসা করিলেন,—নবাবের বেগমদিগকে আপনি এত ঘৃণা করেন কেন?

'তখন পণ্ডিত বলিতে লাগিলেন,—যে স্ত্রী আপনার স্বামীর হৃদয়-মন সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিতে অসমর্থা, যাঁহার স্বামীর মন পর-স্ত্রী দর্শনে আকৃষ্ট হয়, তিনি স্ত্রী-ধর্ম রক্ষা করিতে পারেন নাই। ধর্মপত্নী আপন স্বামীর মন এতদূর অধিকার করেন, যে, তাঁহার স্বামীর মন অন্য স্ত্রী দর্শনে কখনোও আকৃষ্ট হয় না। কিন্তু নবাবের বেগমগণ নবাবদিগের মন সেই প্রকার বান্ধিয়া রাখিতে অসমর্থা।—সুতরাং তাঁহারা ধর্মপত্নী নহেন। তাঁহারা নবাবদিগের বেশ্যা।

'পণ্ডিতের এই কথাটি আমার মনে একেবারে মুদ্রিত হইয়া পড়িল। আমি মনে করিতে লাগিলাম যে, পণ্ডিত যথার্থ কথাই বলিয়াছেন।

'ইহার পর আর একদিন নবাব আলিবর্দির সঙ্গে পণ্ডিত দেখা করিতে আসিলেন। আমরাও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

'আলিবর্দি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন যে,—পরমেশ্বর তাঁহাকে সকল সুখ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু পুত্র-মুখ-দর্শন-সুখ হইতে ঈশ্বর তাঁহাকে বঞ্চিত রাখিয়াছেন।

'বৃদ্ধ পণ্ডিত এই কথা শুনিয়া বলিলেন,—ধর্মগুরু কবীর বলেন, পুত্ আর মূত্ একস্থান হইতে আসিতেছে, যে পুত্ পিতা মাতার মুখ উজ্জ্বল করিতে অসমর্থ সে পুত্ নহে সে মূত্।

'পণ্ডিতের এই কথাটিও আমার বড়ই মনে লাগিল। ইহার পর আর এক-দিন আলিবর্দির সঙ্গে কথা বলিবার সময় পণ্ডিত পূর্ব পূর্ব নবাবদিগের অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—দেশের রাজাকে যদি প্রজাগণ ভক্তি-শ্রদ্ধা না করে, রাজাকে আপন প্রভুত্ব রক্ষার্থ যদি সর্বদাই সৈন্য রাখিতে হয়, তবে সে রাজা, রাজা নহে, সে দস্যু।'

'পণ্ডিতের এই তিনটি কথাই আমার মনের মধ্যে মুদ্রিত হইয়া পড়িল। আমি সর্বদাই মনে মনে বলিতাম,—স্ত্রী স্বামীর মন সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিতে না পারিলে তিনি ধর্ম-পত্নী নহেন—তিনি বেশ্যা। রাজা, প্রজাসমষ্টির ভক্তি আকর্ষণ করিতে না পারিলে তিনি দস্যু। পুত্র, পিতা-মাতার মুখ সমুজ্জ্বল করিতে না পারিলে সে পুত্র নহে সে মূত্র। রাত্রে শয়ন করিয়াও এই তিনটি কথা চিন্তা করিতাম। আলিবর্দির কন্যা ঘেসিতি বেগম প্রভৃতিও এই সকল কথা পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা এই সকল কথা যখন শুনিলেন তখন একটু হাস্য করিলেন। আমার ন্যায় তাঁহাদের মনে এই সকল কথা বদ্ধমূল হইয়া পড়িল না।

'ইহার কিছুকাল পরে আলিবর্দির ভ্রাতুষ্পুত্র আহম্মদ জঙ্গের সঙ্গে ঘেসিতি বেগমের বিবাহ হইল। আহম্মদ জঙ্গের অপর নাম নিবাইশ মহম্মদ। তিনি ইহার পরে ঢাকার নবাবের পদে নিযুক্ত হইলেন। ঘেসিতি বেগমের বিবাহের পর; আলিবর্দির আর দুই কন্যারও বিবাহ হইল। আমার বিবাহের প্রস্তাব হইলেই আমার মনে অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হইত। পণ্ডিতের সেই কথা স্মরণ হইলে, আর বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইত না। মনে করিতাম, যে, যাঁহার সঙ্গে বিবাহ হইবে, তিনিই আর পাঁচশটা বিবাহ করিবেন। আলিবর্দি খাঁর ন্যায় এক-স্ত্রীতে অনুরক্ত এমন লোক কোথাও মিলিবে না। কিন্তু লজ্জায় মনের কথা কাহারোও নিকট প্রকাশ করিতাম না।

'মীরজাফর আলিবর্দির প্রসাদাকাঙ্খী ছিলেন। তিনি আমাকে বিবাহ করিলে আলিবর্দি খাঁর প্রিয়পাত্র হইতে পারিবেন, এই মনে করিয়া আমাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করিলেন। নবাব আলিবর্দি খাঁও তাহাতে সম্মত হইলেন। কিন্তু আমি মনে মনে বড় কষ্টানুভব করিতে লাগিলাম।

ভাবিতে লাগিলাম যে। মীরজাফর কি আর বিশ-পঁচিশটা বিবাহ করিবেন না? উঁহার সঙ্গে বিবাহ হইলেও আমাকে ইহার বেশ্যা হইতে হইবে। কিন্তু মনের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেও সাহস হইত না। অবশেষে ঘেসিতি বেগমের নিকট বলিলাম দিদি, সে পণ্ডিতের কথা তোমার স্মরণ নাই? সে পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, যাহারা বহুবিবাহ করে, তাহাদিগের পত্নী হইলে বেশ্যা হইতে হয়। যে এক-স্ত্রীর অধিক বিবাহ করিবে, তাহাকে আমি বিবাহ করিব না।

'ঘেসিতি বেগম আমার কথা শুনিয়া, হি হি করিয়া হাসিতে লাগিলেন। বহুবিবাহ নবাব, আমির—উমরাদিগের মধ্যে সর্বত্রই প্রচলিত। সুতরাং তিনি আমাকে পাগল বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন, এবং আমার সকল কথা তাঁহার স্বামীর নিকট বলিলেন। তাঁহার স্বামী আহম্মদ জঙ্গ এই কথা লইয়া আপন বয়স্যদিগের সঙ্গে আমোদ করিতে লাগিলেন। ক্রমে আমার এইকথা আলিবর্দি এবং তাঁহার স্ত্রীর কর্ণেও প্রবেশ করিল। আমি মনের কথা প্রকাশ করিয়া অত্যন্ত লজ্জায় পড়িলাম। মেয়েদিগের মধ্যে সকলেই আমাকে ঠাট্টা করিতে লাগিল; সকলেই আমাকে একটা পাগলিনী বলিয়া মনে করিতে লাগিল।

'কিন্তু আলিবর্দির ন্যায় বিচক্ষণ লোক মুর্শিদাবাদে আর কখনোও রাজত্ব করেন নাই। অন্য লোকে আমার কথা শুনিয়া ঠাট্টা তামাশা করিত, তিনি বরং আমার প্রশংসা করিতেন। তিনি তাঁহার স্ত্রীর নিকট বলিলেন,—মেহের যদি মীরজাফরকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা না করে, তবে মীরজাফরের সঙ্গে তাহার বিবাহ দেওয়া কর্তব্য নহে।

'আমার বাল্যকালের নাম মেহেরউন্নিসা ছিল। আলিবর্দি আমাকে সস্নেহে মেহের বলিয়া ডাকিতেন।

'আলিবর্দি আহম্মদ জঙ্গকে ডাকিয়া বলিলেন—মেহের মীরজাফরকে বিবাহ করিতে অসম্মতা হইয়াছেন। অতএব মীরজাফরের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেওয়া হইবে না।

'মীরজাফর আহম্মদ জঙ্গের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। আহম্মদ জঙ্গ আলিবর্দিকে বলিলেন,—মেহের জাফরকে বিবাহ করিতে কেন অসম্মতা হইলেন? এই সকল হাসি তামাশার কথা শুনিয়া আপনি কি ইহা সত্য বলিয়া মনে করিয়াছেন?

'আহম্মদ জঙ্গ আলিবর্দি খাঁর নিকট এই কথা বলিয়াই অন্দরের মধ্যে প্রবেশ-পূর্বক তাঁহার স্ত্রীর দ্বারা আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আমার তখন সতের-আঠার বৎসর বয়স হইয়াছে! আমি বাল্যকালে আহম্মদ জঙ্গ প্রভৃতির সঙ্গে একত্রে খেলা করিয়াছি। কিন্তু পনের-ষোল বৎসর বয়স হইবার পর আর তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতাম না। আমি পর্দার অন্তরালে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তখন আহম্মদ জঙ্গ অত্যন্ত গম্ভীরভাবে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—মেহের, যাহারা বহুবিবাহ করে তুমি তাহাদিগকে বিবাহ করিবে না বলিয়াই, বৃদ্ধ নবাব (অর্থাৎ আলিবর্দি খাঁ) মীরজাফরের সঙ্গে তোমার বিবাহ সাব্যস্ত করিয়াছেন। মুর্শিদাবাদে দুইজন লোক আছেন, যাঁহারা বহুবিবাহে রাজি নহেন। একজন বৃদ্ধ নবাবই আলিবর্দি খাঁ, দ্বিতীয় জন মীরজাফর। অতএব তুমি মীরজাফরকে বিবাহ কর।

'আহম্মদ জঙ্গ বিশেষ গাম্ভীর্যের সহিত এই কথা বলিলেন। আমি তাঁহার কথা সত্য বলিয়া মনে করিলাম এবং অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত মীরজাফরকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলাম। আহম্মদ জঙ্গের চাতুরি তখন কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তিনি আমাকে এই কথা বলিয়াই বাহিরে যাইয়া হাসিতে লাগিলেন।

'কয়েক দিবস পরে মীরজাফরের সঙ্গে আমার বিবাহ হইল। কিন্তু আমার বিবাহের পর তিন মাসের মধ্যে মীরজাফর অন্যূন বিশ-পঁচিশটি স্ত্রীলোককে নিকা করিলেন। প্রথমতঃ আমার অত্যন্ত আত্মগ্লানি হইতে লাগিল। কিন্তু কলঙ্ক এবং পাপের মধ্যে শরীর একবার ঢালিয়া দিলে, আর পাপকে পাপ বলিয়া বোধ হয় না, কলঙ্ককে কলঙ্ক বলিয়া বোধ হয় না। ছয় মাসের মধ্যে আমার বাল্যসংস্কার একেবারেই দূর হইল! বহুবিবাহের প্রতি আর কোনো ঘৃণা রহিল না; ইহার পর ঘেসিতি বেগমের সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হইত, তখনই তিনি পরিহাস করিয়া, আমাকে বলিতেন,—মীরজাফর তো বহুবিবাহ করে নাই? তোমাকেও বেশ্যা হইতে হয় নাই? আমিও তখন হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতাম না। তখন মনে করিতাম বাল্যকালে সেইরূপ সংস্কার মনে স্থান প্রদান করিয়া নিতান্ত পাগলের ন্যায় কার্য করিয়াছিলাম।

'আমার বিবাহের প্রায় পনের-ষোল বৎসর পরে আলিবর্দির মৃত্যু হইল।

সিরাজ বঙ্গের নবাব হইলেন। কিন্তু সিরাজের সিংহাসন প্রাপ্তির প্রায় এক বৎসর পরে একদিন অপরাহ্নে বস্ত্রাবৃত একখানা পালকি আমাদের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আমি মনে করিলাম সিরাজের প্রাসাদ হইতে কোনো স্ত্রীলোক হয়তো আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন। আমি দ্বিতল গৃহ হইতে নিচে আসিলাম। গৃহদ্বারে আমার সেই কুপুত্র মীরণ দাঁড়াইয়াছিল। মীরণ আমাকে দেখিতে পাইল না। কিন্তু সেই পালকির মধ্য হইতে একটা যমদূতের ন্যায় দাড়িওয়ালা ইংরাজকে * বাহির হইতে দেখিয়া, আমি আশ্চর্য হইয়া, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম। একটা ইংরাজ আমাদের অন্দরের মধ্যে কেন আসিয়াছে, ইহার কোনো মর্মাবধারণ করিতে পারিলাম না। মীরণ এবং আমার স্বামী সেই ইংরাজটাকে সঙ্গে করিয়া যে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন, আমি অদৃশ্যভাবে তাহার পার্শ্ববর্তী গৃহে যাইয়া দাঁড়াইলাম। ইহাদিগের পরস্পরের কথাবার্তা সহজে বুঝিবার সাধ্য ছিল না। সকল কথার অর্থ বুঝিতেও পারিলাম না। কিন্তু আমার স্বামী যে কোরান স্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন, তাহা দেখিতে পাইলাম। ইহাদের অন্যান্য কথাবার্তা দ্বারা আমি সহজেই অনুমান করিলাম, যে, সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার পরামর্শ হইতেছে।

'আমার স্বামী তখন সিরাজের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। ভৃত্য হইয়া আপন প্রভুর সঙ্গে এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করা অপেক্ষা আর কি গুরুতর পাপ হইতে পারে? আমি এই কুকার্য হইতে ইহাদিগকে বিরত করিবার অভিপ্রায়ে মীরণকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলাম,—বাছা! আমি তোমাদের সমুদয় দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়াছি। হয় তোমরা এ দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ কর, নহিলে আমি সকল কথা প্রকাশ করিয়া দিব।

'আমার স্বামী মীরজাফর তখন আমার শিরশ্ছেদ করিবার নিমিত্ত কৃত-

* It still remained necessary that Meer Jaffer should take an oath to observe the treaties. Mr. Watts therefore proposed an interview, which Jaffer wished likewise.... Mr. Watts relying on the fidality of his own domestics, and on the manners of the country, went in the afternoon from his house in covered plainquin such as carry woman of distinction, and passed without interruption to Jaffer's Palace, who with his son Meeran received him in one of the apartments of the Seraglio.—Ormes History of Indoostan, Vol. II, p. 160.

পরাস্ত হইলেন। কিন্তু নিতান্ত জঘন্য পশুরও বোধহয় জননীর নিমিত্ত একটু স্নেহ থাকে। মীরণ আমার স্বামী অপেক্ষা সহস্রগুণে নিষ্ঠুর হইলেও সে আমার শিরশ্ছেদনে সম্মত হইল না। তাহারা পিতা-পুত্র উভয়েই আমাকে ধমকাইয়া বলিল,—এ কথা প্রকাশ করিলে তৎক্ষণাৎ আমার শিরশ্ছেদন করিবে।

'আমিও মনে মনে ভাবিয়া দেখিলাম, যে সিরাজের নিকট এই কথা প্রকাশ করিলে, সে তৎক্ষণাৎ আমার স্বামী-পুত্রের প্রাণ বিনাশ করিবে। সিরাজ যদি ক্ষমাশীল হইত, এবং সে আমার অনুরোধে আমার স্বামী পুত্রকে ক্ষমা করিবে, আমার যদি এইরূপ আশা থাকিত, তবে নিশ্চয়ই আমি স্বামী-পুত্রের এ সকল দুরভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া, সিরাজের জীবন রক্ষা করিতাম। কিন্তু এ সংসারে যাহাদের ক্ষমা নাই, তাহারা নিতান্ত দুর্ভাগ্য। তাহারা অন্য লোককে তাহাদের সাহায্য করিবারও সুযোগ প্রদান করে না।

'অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া এ সম্বন্ধে আমি নির্বাক রহিলাম। ইহার কয়েক মাস পরে সিরাজ সিংহাসনচ্যুত হইলেন। আমার স্বামী বঙ্গের নবাব হইলেন।

'কিন্তু রাজা হইয়া, কিম্বা প্রধান রাজপুরুষ হইয়া, যে ব্যক্তি প্রজার শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালোবাসা আকর্ষণ করিতে অসমর্থ, তাহার ন্যায় হতভাগা লোক এ সংসারে আর কেহই নাই। যে দীনহীন কাঙ্গাল দিনান্তে অতিকষ্টে একসন্ধ্যা আহারের সংস্থান করিতেও অসমর্থ তাহার অন্তরেও সময়ে সময়ে সুখের উদয় হইতে পারে। কিন্তু প্রজা-সাধারণের বিরাগভাজন নরাধম রাজা কিম্বা রাজপুরুষকে, বোধহয়, পরমেশ্বরই সকল সুখ হইতে বঞ্চিত রাখেন।

'মীরজাফর বঙ্গের নবাব হইলে পর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তখন এই রাজপদ রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমার স্বামী এবং কুপুত্র মীরণ অহর্নিশ কেবল নরহত্যা করিয়া হস্ত কলঙ্কিত করিতে লাগিল।

'সেই সময়ের ভয়ানক অবস্থা আমার স্মৃতিপথারূঢ় হইলে আমার হৃদয় বিকম্পিত হয়। রাজা প্রজাসাধারণের বিরাগভাজন হইলে সকলের প্রতিই তাহার সন্দেহ উপস্থিত হয়। সে হতভাগ্য রাজা আর কাহারোও উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না মীরজাফর এবং মীরণ, উভয়েরই এই দুর্দশা উপস্থিত হইল। তাহারা সন্দেহ করিয়া প্রত্যেক দিনই গোপনে দুই-চারিটা লোকের প্রাণ বিনাশ করিতে লাগিল।

'দুর্দান্ত মীরণ, একজন দীর্ঘকালের বিশ্বস্ত ভৃত্য এবং নবাব সিরাজের

প্রধান বক্সী খাজে হাজিকে* সন্দেহ করিয়া তাহার প্রাণ বধ করিল। দ্বিতীয় বক্সী মীরকাজেম্ † আমার মাতুল হইতেন। তাঁহার প্রতিও মীরজাফর এবং মীরণের সন্দেহ হইল। তাঁহাকে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া গোপনে গৃহ দ্বারে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিল।

'ইহার কয়েক দিবস পরে আবার এমারতের দারোগা ‡ ইয়ার মহম্মদ এবং অপর একং বিশ্বস্ত ভৃত্য আবদুল ওয়াহেব খাঁর § প্রাণ বিনাশ করিল।

'তোমাদিগের নিকট অধিক কি বলিব। দিন দিন এই প্রকার নরহত্যা এবং নিষ্ঠুর ব্যবহার দর্শনে, স্বামী-পুত্রের প্রতি আমার অত্যন্ত ঘৃণা উপস্থিত হইল। আমি তখন মনে মনে চিন্তা করিতাম যে, বাল্যকালে আলিবর্দির পণ্ডিতের মুখে যে তিনটি কথা শুনিয়াছিলাম, তাহা সমুদয়ই আমার অদৃষ্টে ফলিল। বোধহয় আমার অদৃষ্টে এইরূপ ঘটিবে বলিয়াই ঐ কথা কয়েকটি আমার মনে তদ্রূপ বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিল। আলিবর্দির কন্যাত্রয়ও এই সকল কথা শুনিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা তো সত্বরই এই সকল কথা বিস্মৃত হইলেন, তাঁহাদিগের মনে তো এ সকল কথা বদ্ধমূল হইয়া পড়িল না।

'আমার মনে তখন দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, মীরজাফরকে বিবাহ করিয়া আমি স্ত্রী-ধর্ম পালনে অসমর্থ হইয়াছি। সুতরাং আমি ধর্মপত্নী নহি, আমি বেশ্যা। মীরণকে গর্ভে ধারণ করিয়া আমি পুত্র লাভ করিতে পারি নাই।

*Coja Haddee, the first Buxy, first banished for pretended conspiracy against the Nawab's life and afterwards cut off at Shabad in his march out of the Province.—Original papers relative to the Disturbances in Bengal. Vol. I, p. 63.

† Meer Cazim, the second Buxy, invited by the Chota Nawab to his house and, after having received from him unusual marks of affection, assassinated at the gates of the palace.—Original papers relative to the Disturbances in Bengal. Vol. I, p. 63.

‡ Yar Mahmud, formerly in great favour with the Nawab Serajah Dowlah, and since Drogali of the Emarut, slain in the presence of the Chata Nawab.—Original papers relative to the Disturbancec in Benal. Vol. I, p. 63.

§ Abdal Ohab Cawn murdered at the Rumna, by some of the horcurahs belonging to Checon, (who was a favourite of Meer Jaffer.).—Original papers relative to the Disturbances in Bengal. Vol. I, p. 63.

মীরণ পুত্র নহে সে মূত্র। আর আমার স্বামী রাজা হইয়া প্রজার শ্রদ্ধা ভক্তি ও ভালোবাসা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। সুতরাং তিনি রাজা নহেন, তিনি দস্যু।

'মীরজাফরের রাজ্যলাভ আমাকে সুখী করিতে সমর্থ হইল না। আমি সর্বদা মনোদুঃখে দিনাতিপাত করিতে লাগিলাম। কিন্তু প্রাগুক্ত ঐ সকল নরহত্যার পূর্বে মীরণ যে ভীষণ নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছিল, তাহা বলিতে আরম্ভ করিলেই আমি অস্থির হইয়া পড়ি। সেইজন্য সে কথা এ পর্যন্ত তোমাদিগের নিকট বলি নাই।

'আমার স্বামীর সিংহাসন প্রাপ্তির কয়েক মাস পরে তিনি মীরণের হস্তে মুর্শিদাবাদের রাজকার্যের ভার প্রদান করিয়া, রায় দুর্লভ এবং মেদিনীপুরের রাজা রামরামসিংহের সঙ্গে কি বন্দোবস্ত উপলক্ষে কলিকাতা কিম্বা বর্ধমানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কোথায় গিয়াছিলেন, এবং কি কার্যোপলক্ষে মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিলেন, তাহা আমি বিশেষরূপে জানিতাম না। আমার সহিত তাঁহার বড়-একটা সাক্ষাৎ হইত না।

'এই সময় এই প্রকার জনরব * উঠিল যে, দিল্লীর বাদশাহ আমার স্বামীকে সুবাদারের পদে নিযুক্ত করিতে অসম্মত হইয়াছেন; তিনি সিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র এক বৎসর বয়স্ক শিশু মির্জা মেন্দিকে বঙ্গের সুবেদারী প্রদান করিয়া, রায়দুর্লভকে তাঁহার দেওয়ান নিযুক্ত করিয়াছেন। এই জনরব মুর্শিদাবাদে পৌঁছিবামাত্র, রাত্রে দুর্বৃত্ত মীরণ এক বৎসর বয়স্ক শিশু মির্জা মেন্দির প্রাণসংহারার্থ কয়েক জন দস্যু প্রেরণ করিল। মির্জা মেন্দিকে সিরাজের জননী আমান বেগম প্রতিপালন করিতেন। আমান বেগম

* The letter from Delhi said, the ministry there disapproved of the accession of Jaffer to the Nawabship; that Mirza Mendi, the son of Surajah Dowlah's younger brother, an infant ought to have been proclaimed ... ...on 10th in the morning the whole city was in consternation, and the troops in their defferent quarters in tumult. A band of ruffians sent by Meerun, had in the night entered the palace of Alliverdy's widow, with whom lived the widow of Zaindee Haimed, and her infant grandson Mirza Mendi. They murdered the child; and gave out they had likewise slain the two mothers—Orme's History of Indoostan Vol. II, p. 272.

আপন মাতা নবাব আলিবর্দির স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে তখন মুর্শিদাবাদে বাস করিতেছিলেন।

'মীরণের প্রেরিত দস্যুগণ নবাব আলিবর্দি খাঁর স্ত্রীর গৃহে প্রবেশ পূর্বক তৎক্ষণাৎ মির্জা মেন্দির শিরচ্ছেদন করিল ; এবং নবাব আলিবর্দির স্ত্রী এবং আমান বেগমের প্রাণসংহারার্থ তাহাদিগকে ধৃত করিয়া আপন প্রাসাদে বন্দী করিয়া আনিল।

'আলিবর্দির স্ত্রী আমাকে জননীর ন্যায় বাল্যাবস্থায় প্রতিপালন করিয়াছেন। তাঁহার কন্যা আমান বেগমকে আমি সর্বদাই কনিষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করিতাম। আমার গর্ভজাত নরপিশাচ আমার সেই জননী এবং কনিষ্ঠা ভগ্নীর প্রাণসংহারার্থ ধৃত করিয়া আনিয়াছে, এই কথা শুনিয়া আমি অধৈর্য হইয়া পড়িলাম। ঘাতকগণ যে গৃহে তাহাদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত লইয়া গিয়াছিল, পাগলিনীর ন্যায় দৌড়িয়া সেই গৃহাভিমুখে চলিলাম। দুর্বৃত্ত মীরণ তখন নিদ্রা যাইতেছিল। ঘাতকগণকে অর্থ প্রদান পূর্বক বশীভূত করিয়া তাঁহাদিগের প্রাণ রক্ষা করিলাম ; এবং সেই রাত্রে দুই জনকেই ঘেসিটি বেগমের নিকট ঢাকায় প্রেরণ করিলাম। মীরণকে প্রতারিত করিবার নিমিত্ত প্রাতে লোক দ্বারা তিনটি মৃত শববাহিকা গোরস্থানে প্রেরণ করিলাম*।

'আলিবর্দির স্ত্রীর প্রতি মুর্শিদাবাদের আবালবৃদ্ধ সকলেরই ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল। মীরণ তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে, এই কথা প্রকাশ হইবামাত্র মুর্শিদাবাদে প্রজাবিদ্রোহ হইবার উপক্রম হইল। এই বিদ্রোহ নিবারণার্থ মীরকাসিমের দ্বারা আমি বিদ্রোহীদিগের প্রধান লোকের নিকট প্রকৃত অবস্থা বলিয়া পাঠাইলাম। তাহাতে সে দিনের বিদ্রোহ নিবারিত হইল। নতুবা সেই দিনই মীরজাফরের রাজত্ব শেষ হইত।

'এদিকে কাসিমবাজার হইতে একটা † ইংরাজ আসিয়া এই কুকাযের

---

* In the morning three biers were carried publicly to burial, amidst the silence grief and abhorrence of the people, for the two women, exclusive of the high condition from which they had fallen by the death of Surajah Dowlah, were the most respectable of their sex, for their virtues and the nobility of their sentiments.—Orme's History of Indoostan. Vol II. p. 272.

† On the 13th Mr. Scrafton visited and reproached Meerun, who, amongest other vindications, still preserving a secret said, 'Why shall not I kill an old woman, who goes about

মিমিচ্চ মীরণকে তিরস্কার করিতে লাগিল। ইংরাজগণ প্রবঞ্চক এবং অর্থগৃধ্নু হইলেও মীরণের ন্যায় জঘন্য নহে। মীরণ সে ইংরাজটার উপর কোপাবিষ্ট হইয়া বলিল,—'তোমার কথা শুনিতে চাহি না। ও বুড়ী ডুলী আরোহণে বাড়ি বাড়ি যাইয়া, বিদ্রোহীর দল বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছিল। আমি কেন ও স্ত্রীলোককে জীবিত রাখিব?—

'এই ঘটনার কয়েক মাস পরে মীরণ শুনিতে পাইল, যে, আলিবর্দির স্ত্রী এবং আমান বেগম আমার সাহায্যে ঢাকায় পলায়ন করিয়া, আত্মরক্ষা করিয়াছেন। সে তৎক্ষণাৎ ঢাকার নায়েব নবাব জেসারাৎ খাকে ইহাদিগের প্রাণ বিনাশার্থ পত্র লিখিল। জেসারাৎ খাঁ এইরূপ কুকার্য করিতে সম্মত হইলেন না*। তখন মীরণের প্রেরিত লোক ঘেসিতি বেগম, আমান বেগম, ঘেসিতি বেগমের পালিত পুত্র মুরাদ উদ্দৌলা, সিরাজের দ্বিতীয় পত্নী লোৎউন্নিসা বেগম, লোৎউন্নিসার গর্ভজাত তিন বৎসর বয়স্ক বালিকা, এবং অপর প্রায় সত্তর জন লোককে রাত্রে বুড়ীগঙ্গায় ডুবাইয়া তাহাদের প্রাণসংহার করিল। আমার জননী সদৃশী আলিবর্দি খাঁর স্ত্রী পলায়ন করিয়া যে কোথায় চলিয়া গেলেন তাঁহার আর কোনো তত্ত্ব পাওয়া গেল না। ইহাদের প্রাণ বিনাশের সংবাদ শ্রবণ মাত্র আমি শোকে ও দুঃখে উন্মত্তের ন্যায় হইলাম। তৎক্ষণাৎ জামাতা কাসিম আলিকে ডাকাইয়া সক্রোধে বলিলাম—বাছা! এখনই মীরজাফর এবং মীরণের প্রাণ বিনাশ করিয়া তুমি বঙ্গের নবাবের পদ গ্রহণ কর।

in her doly to stir up the Jemautdars against my father? A few days after it was discovered that the two women had not been murderd, but had been taken out of the place, and put into boats, which set off immediately for Dacca.—Orme's History of Indostan Vol. II., p. 272.

* A porwana was sent to Jesarut Cawn, the Nawab of Dacca to put to death all the survivors of the family of Nuwab Aliverdi Cawn, Shahamut Jung and Serajah Dowlah; but upon his declining to obey so cruel an order the messenger who had private instructions to execute this tragedy, in case of the other refusal, took them from the place of their confinement, carried them out at midnight upon the river, and massacred and drowned them, with about seventy women of inferior note, and attendants. What became of Aliverdi Cawn's widow is uncertain, it being reported by many, that she escaped the fate of the rest of her family.—Original papers relative to the Disturbances in Bengal, Vol. I, p, 63-64.

'এই দুর্ঘটনা শ্রবণ করিবার পর মাসাধিক পর্যন্ত আমি ক্ষিপ্তের ন্যায় কালযাপন করিতে লাগিলাম। অহর্নিশ কেবল চিন্তা করিতাম যে, এমন কি পাপ করিয়াছিলাম যে, অত দুঃখ-কষ্ট আমাকে সহ্য করিতে হইল?

'সময়ে সময়ে আমার মনে হইত যে ঘেসিতি বেগম এবং তাহার স্বামীই চক্রান্ত করিয়া মীরজাফরের সঙ্গে আমার বিবাহ জুটাইয়া দিয়াছেন। বোধহয় ঘেসিতি বেগমের সেই পাপে এইরূপ দুরবস্থা হইয়াছে। নবাব আলিবর্দি এবং তাঁহার পণ্ডিত সর্বদাই বলিতেন, যে, মানুষ কুকার্য করিয়া কেবল আপন মৃত্যুবাণ প্রস্তুত করে। এই কথা স্মরণ হইলে আমার মনে হইত, যে, ঘেসিতি বেগম চক্রান্ত পূর্বক জাফরের সঙ্গে আমাকে বিবাহ দেওয়াই বোধহয় আপন মৃত্যুবাণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

'আবার কখন কখন আমি ভাবিতাম, যে, বাল্যকালে লোকের মনে যে সকল ভাবের উদয় হয় তাহাই ধর্মানুগত ভাব। বড় হইয়া সংসারে প্রবেশ করিলে হৃদয়-মন কঠিন হয়, তখন ন্যায়ানুগত ধর্মানুগত ভাব হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করে না।

'আমি বাল্যকালে যে এই ব্যভিচারী নবাব এবং উমরাদিগকে বিবাহ করিব না বলিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলে এত কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত না। আমি নবাব-পত্নী না হই কৃষক-পত্নী হইলেও সুখে কালযাপন করিতে সমর্থা হইতাম।

'ঈদৃশ শোক-দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কালযাপন করিবার সময় একদিন সন্ধ্যায় পর আমার শয়নগৃহ হইতে অন্দরের প্রাঙ্গনে একটি হিন্দুরমণীর ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। হিন্দুরমণীর বিলাপ ও পরিতাপ শুনিলে বোধহয় পাষাণ-হৃদয়ও বিগলিত হয়। সে অবিশ্রান্ত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে,—বাবা আমরা ব্রাহ্মণের কন্যা। তোমাদিগকে স্পর্শ করিলেও আমাদের জাতি যায়। আমাদের সর্বনাশ করিও না। আমাদের ধর্ম নষ্ট করিও না।—ও মা গঙ্গে এই কি আমার গঙ্গা স্নানের ফল হইল?—

'স্ত্রীলোকটির এইরূপ কাতোরোক্তি ও বিলাপ শ্রবণ করিয়া আমি বাহিরে চলিলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে তাহারা মীরণের অন্দরের মধ্যে নীত হইল।

'আমি দ্রুতপদে তখন মীরণের অন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, যে তাহারা লোকেরা একটি বয়োধিকা স্ত্রীলোক এবং দুইটি যুবতীকে ধৃত করিয়া আনিয়াছে। সেই বয়োধিকা স্ত্রীলোকটি এখন আর করুণস্বরে

বিলাপ করে না। সে শরবিদ্ধা ব্যাঘ্রীর ন্যায় কোপানলে প্রজ্বলিত হইয়া আত্মঘাতিনী হইবার চেষ্টা করিতেছে; বারম্বার সজোরে বক্ষে ও কপালে করাঘাত করিতেছে। যুবতী দুইটি ভয় ও ত্রাসে অচৈতন্য-প্রায় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

'মীরণ সেই বয়োধিকা রমণীকে উন্মত্তার ন্যায় কপালে ও বক্ষে করাঘাত করিতে দেখিয়া হি হি করিয়া হাসিতেছে। রমণী যে আপন মনের দুঃখে আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছে, তদ্দৃষ্টে মীরণের ন্যায় নিষ্ঠুর দুর্বৃত্তের মনে দয়ার সঞ্চার হইল না। নিষ্ঠুর বালকগণ পশু পক্ষীকে যন্ত্রণা প্রদান করিয়া যদ্রূপ তামাশা দেখে, মীরণও সেইরূপ তামাশা দেখিতেছিল।

'আমি ইহাদিগকে দেখিয়াই বুঝিলাম, যে মীরণের লোকেরা কোনো অসদভিপ্রায় সাধনার্থ এই ভদ্রমহিলাদিগকে ধৃত করিয়া আনিয়াছে। আমি তখন সেই বয়োধিকা রমণীর হস্ত ধারণ করিয়া বলিলাম,—মা, তুমি আমার সঙ্গে আইস, এ দুর্বৃত্ত তোমার কোনো অনিষ্ট করিতে পারিবে না। কিন্তু সে স্ত্রীলোকটি তখন একেবারে উন্মত্তা হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার হস্ত ধরিবামাত্র সে আমার হাত আঁচড়াইতে লাগিল, এবং শত্রুজ্ঞানে আমাকে পদাঘাত করিল। আমি কোনো প্রকারেই তাহাকে বুঝাইতে পারিলাম না যে, মীরণের হস্ত হইতে তাহাকে উদ্ধার করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল।

'অনেক আত্মপ্রহারের পর রমণী অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িল। তখন অতি করুণস্বরে আমি বলিলাম,—মা তোমার কোনো ভয় নাই। আমার এই দুর্বৃত্ত পুত্র তোমাকে এবং এই যুবতীদ্বয়কে এখানে আনিয়াছে। আমি এখনই তোমাদের পতি-পুত্রের নিকট পাঠাইয়া দিব।—

'আমার কথা শুনিয়া রমণী অধিকতর কোপাবিষ্ট হইয়া বলিল,—এমন কুসন্তান তুই গর্ভে ধারণ করিয়াছিস? তুই বেশ্যা—নইলে তোর গর্ভে এমন নিষ্ঠুর দুর্বৃত্ত কেন জন্মগ্রহণ করিবে? আমাদের তো সর্বনাশ করিয়াছে। আমরা ব্রাহ্মণের কন্যা। মুসলমান স্পর্শ করিলেই আমাদের জাতিধ্বংস হয়। এখন তুই কোথায় আমাদিগকে পাঠাইয়া দিবি? আমাদিগকে বিষ আনিয়া দে। যমালয় ভিন্ন আর আমাদের কোথাও স্থান নাই। আমার পতিপুত্রের সর্বনাশ হইয়াছে। তাঁহারা আর ভদ্রলোকের মধ্যে মুখ দেখাইতে পারিবেন না। হয় তো তাঁহারা এতক্ষণে আত্মহত্যা করিয়াছেন—

'রমণীর প্রত্যেক বাক্য আমার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিতে লাগিল।

'আমি আবার বলিলাম,—মা দুরাত্মা যাহা করিয়াছে, তাহার এখন আর আমি কি করিব। তোমরা তিনজন এই দুরাত্মার গৃহ হইতে আমার সঙ্গে আইস। আমি দেখিব তোমাদের কোনো সদুপায় করিতে পারি কি না।'—

'রমণী বলিল, আমাদের সকল সদুপায় এখন মৃত্যু। এখন আমাদের মরণের সুবিধা করিয়ে দে।

'এই বলিয়াই রমণী নিকটস্থ যুবতীদিগকে আপন ক্রোড়ের দিকে টানিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহারা দুই জন এখনও প্রায় অচৈতন্যাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। আমি প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিবার পর পাপাত্মা মীরণ সে স্থান হইতে স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছিল।

'কিছুকাল পরে সে রমণীও বুঝিতে পারিল, যে মীরণের আক্রমণ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং এখন সে একটু আশ্বস্ত হইল। কিন্তু ক্রোধানলে তখনও তাহার সর্ব শরীর জ্বলিতেছিল। সে সক্রোধে বলিতে লাগিল,—বিনামেঘে বজ্রপাত হইয়া এই পাপাত্মার মৃত্যু হইবে। হে সর্বসাক্ষী পরমেশ্বর, যদি আমি সাধ্বী হই, তবে ছয় মাসের মধ্যে নিশ্চয়ই এ নরাধমের মৃত্যু হইবে।—

'অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমি রমণীকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, এবং অবশেষে তাঁহার হস্ত ধরিয়া, আপন গৃহে লইয়া চলিলাম। আমার আদেশানুসারে দুই জন বাঁদী সেই যুবতীদ্বয়কে ধরিয়া আমার গৃহে লইয়া আসিল। তাঁহারা তিন জনই একটু সুস্থ হইলেন পর আমি বলিলাম, মা তোমাদের স্বীয় স্বীয় স্বামী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন কে কোথায় আছেন আমার নিকট বল। আমি এখনই বিশ্বস্ত লোক দ্বারা তোমাদিগকে তাঁহাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিব। আমার এই কথা শুনিয়া বয়োধিকা রমণী বলিলেন যে তাঁহাদের বাড়ি ঢাকা জিলায়। তাঁহার স্বামী, পুত্র এবং জামাতার সঙ্গে তিনি এবং তাঁহার কন্যা ও পুত্রবধূ মুর্শিদাবাদে গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছেন। প্রায় পাঁচদিন হইল তাঁহারা এখানে আসিয়াছেন। কিন্তু আজ সায়ংকালে তাঁহার স্বামী ও জামাতা যখন সন্ধ্যা করিবার নিমিত্ত গঙ্গার ঘাটে গেলেন, তখন তাঁহার ষোড়শ বৎসর বয়স্ক পুত্র এবং তাঁহারা তিনজন গঙ্গার পার্শ্বস্থিত একখানি গৃহে ছিলেন। পূর্ণ একমাস গঙ্গাতীরে বাস করিবেন মনস্থ করিয়া, সেই গৃহ ভাড়া করিয়াছিলেন। কিন্তু সায়ংকালে তাঁহার স্বামী এবং জামাতার অনুপস্থিতিতে নবাবের প্যাদা সেই গৃহের

মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে ধৃত করিয়া আনিয়াছে। তাহার সঙ্গে যুবতীদ্বয় মধ্যে যাহার বয়স প্রায় বিশ-বাইশ বৎসর ছিল, সে তাঁহার কন্যা। আর যে বালিকাটির বার বৎসর বয়ঃক্রম ছিল সে তাঁহার পুত্রবধূ।

'রমণীর মুখে এই সকল কথা শুনিয়া, আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্বামী এবং জামাতার অনুসন্ধানে লোক প্রেরণ করিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সমস্ত রাত্রি তল্লাশ করিয়াও তাঁহাদিগের সঙ্গে আমার প্রেরিত লোকের সাক্ষাৎ হইল না। রমণীর স্বামীর নাম বাণেশ্বর ভট্টাচার্য, জামাতার নাম নীলাম্বর এবং পুত্রের নাম ভুবনেশ্বর ছিল।

'এই স্ত্রীলোক তিনটি সমস্ত রাত্রি বসিয়া কেবল ক্রন্দন করিতে লাগিল। আমারও সে রাত্রে আর নিদ্রা যাইবার সুযোগ হইল না। প্রাতঃকালে আবার আমি সেই বাণেশ্বর ভট্টাচার্যের অনুসন্ধানে লোক প্রেরণ করিলাম। কিন্তু আমার প্রেরিত লোক গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার পূর্বেই আমার একজন বাঁদীর আত্মীয় স্ত্রীলোক আমাদের অন্দরের মধ্যে প্রবেশ পূর্বক এদিক ওদিক তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। এই স্ত্রীলোকটা নবাব বাড়ির নিকটেই বাস করিত, সদা সর্বদা বাঁদীদিগের সঙ্গে অন্দরের মধ্যেও আসিত। অন্দরের এক এক প্রকোষ্ঠে বাহির হইতে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিয়া অপর প্রকোষ্ঠের নিকট যাইতে লাগিল। অবশেষে আমার প্রকোষ্ঠের নিকট আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে ভয়ে আর বাক্য নিষ্পত্তি করিল না, একজন বাঁদীকে ডাকিয়া চুপি চুপি তাহার নিকট কি বলিল। বাঁদী তাহার কথা শুনিয়া, আমার নিকটে আসিয়া বলিল, যে, এই স্ত্রীলোকদিগের স্বামী এবং আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ইহার সাক্ষাৎ হইয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ সে স্ত্রীলোকটাকে গৃহের মধ্যে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহাদের স্বামীগণ কোথায় আছেন?

'স্ত্রীলোকটা আমার কথার প্রত্যুত্তরে বলিল, আজ্ঞে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, আর একজন তিশ বৎসর বয়স্ক লোক, আর একটি পনের-ষোল বৎসরের ছেলে কাল সমস্ত রাত্রি কেবল নবাব বাড়ির চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহারা রাত্রে নবাব বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। পাহারাওয়ালাদিগকে কত টাকা কবুল করিল। কিন্তু নবাব-বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিতে দিতে পাহারাওয়ালাগণ সম্মত হইল না। শেষরাত্রে আমার ঘরের নিকট আসিয়া তাহারা তিনজনেই কাঁদিতে

লাগিল। তাহাদের নিকট শুনিলাম, যে, তাহাদের সঙ্গের তিনটি স্ত্রীলোককে নবাববাড়ির মধ্যে ধরিয়া আনিয়াছে। প্রাতঃকালে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে, তাহার সঙ্গের আর দুইটি লোককে বলিল,—'বাবা সমস্ত রাত্রি যখন নবাববাড়ি নিয়া রাখিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই তাহাদের জাতিধ্বংস করিয়াছে। এখন আর আমাদের বাঁচিয়া থাকিবার কোনো প্রয়োজন নাই। চল আমরা তিনজনই গঙ্গায় যাইয়া ডুবিয়া মরি।

'তাহাদিগের দুরবস্থা দেখিয়া আমার বড় দয়া হইল। আমি বলিলাম,—তোমরা আমার ঘরে বসিয়া থাক। আমি নবাব বাড়ির মধ্যে যাইয়া এখনই দেখিয়া আসিব তোমাদের স্ত্রীলোকদিগকে নিয়া কোথায় রাখিয়াছে—

'কিন্তু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একেবারে ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়াছিল। সে বলিল,—বাছা, আর তাহাদিগকে দেখিলে কি হইবে। তাহাদিগের জাতি মান সবই নষ্ট করিয়াছে। ইহার পর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমার হাতে দশটি টাকা দিয়া বলিল, বাছা, আমরা এখন প্রাণত্যাগ করিতে চলিলাম। তোমাকে এই দশটি টাকা দিতেছি। তুমি আমাদের একটি উপকার কর। তুমি নবাব বাড়ির মধ্যে যাইয়া আমাদের সেই স্ত্রীলোক তিনটিকে যদি দেখিতে পাও, তবে তাহাদিগকে বলিবে যে, বাণেশ্বর ভট্টাচার্য, পুত্র এবং জামাতা সহ গঙ্গায় ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তোমাদিগকে তিনি আত্মহত্যা করিতে বলিয়াছেন *। আত্মহত্যা ভিন্ন আর ধর্মরক্ষার উপায় নাই।—

'বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এই কথা কয়টি বলিয়া, অপর দুইজন সঙ্গীকে লইয়া নদীর নিকট চলিল। তাহারা সত্য সত্যই ডুবিয়া মরিবে কি না, তাহা দেখিবার নিমিত্ত আমি তাহাদিগের পিছু পিছু চলিলাম। তাহাদিগের তিনজনকেই আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া পড়িতে দেখিয়াছি।

---

* সম্ভ্রান্ত হিন্দুগণ যে কখনো কখনো আপন আপন স্ত্রী ও কন্যার সতীত্ব রক্ষার নিমিত্ত নবাবের কিম্বা ইংরাজের লোক গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্বে স্বহস্তে আপন আপন স্ত্রী কন্যার প্রাণ বিনাশ করিতেন, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। সিরাজের কলিকাতা আক্রমণের পূর্বে ইংরাজেরা উমিচাঁদকে সন্দেহ করিয়া তাহাকে কয়েদ করিল। উমিচাঁদের বাড়ি লুট করিতে সৈন্য পাঠাইল। উমিচাঁদের লোক তখন স্ত্রীলোকদিগের জাতি মান রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে স্বহস্তে তের জন স্ত্রীলোকের শিরশ্ছেদন করিয়াছিল।—Orme's History of Indostan Vol. II, p. 60.

স্ত্রীলোকটি এই রূপ কথা বলিবামাত্র সেই বয়োধিকা রমণী এবং তাহার কন্যা ও পুত্রবধূ শোক ও দুঃখে একেবারে ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠিলেন। আমি তখন বিশিষ্টরূপ চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারিলাম না যে, কি কথা বলিয়া ইহাদিগকে সান্ত্বনা করিব। সেই দ্বাদশ বৎসর বয়স্কা বালিকাটি কেবল ক্রন্দন করিতে লাগিল। কিন্তু বাণেশ্বরের স্ত্রী এবং কন্যা আত্মঘাতিনী হইবার উদ্দেশ্যে কেবল আত্মপ্রহার করিতে লাগিলেন।

'প্রায় তিন ঘণ্টা পরে সেই স্বর্ণ প্রতিমা সদৃশী বার বৎসর বয়স্কা বালিকাটির মুখের দিকে চাহিয়া বাণেশ্বরের স্ত্রী বলিলেন, আমি নিজে আত্মহত্যা করিতে পারি। কিন্তু এই বালিকাকে আমি কিরূপে আত্মহত্যা করিতে বলিব?

'এই বলিয়া তিনি পুত্রবধূকে ক্রোড়ে করিয়া, আবার ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এই রমণী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস দর্শন করিয়া আমি আশ্চর্য হইলাম। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে আপন কন্যার নিকট বলিতে লাগিলেন,—

বাছা, সকল শাস্ত্রই কি মিথ্যা হইল! আমার শ্বশুর জ্যোতিষশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ছিলেন। তিনি গণনা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, বিংশতি বৎসরকাল আমি পরম পবিত্র কাশীধামে বাস করিয়া পরে ষাট বৎসর বয়সের সময় স্বামীসহ সহমৃতা হইব। আমাকে কখনো বিধবা হইতে হইবে না। আমার পুত্র দিগ্বিজয়ী হইবেন। আমার পুত্রবধূ বীরমাতা হইবেন। কেবল এক তোমার বিষয়ই বলিয়াছেন, যে, বাইশ বৎসর বয়সে তুমি বিধবা হইয়া ব্রহ্মচর্যাবলম্বন পূর্বক জগৎ পবিত্র করিবে। আমার শ্বশুরের কি সকল কথাই মিথ্যা হইবে? কখনো না—কখনো না। তিনি সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তাঁহার একটি কথাও কখনো নিষ্ফল হয় নাই। যাহাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই কালে সফল হইয়াছে; হয় তো এই তীর্থস্থানে আসিয়া আমরা কোনো মহাপাপ করিয়াছি, তজ্জন্যই এই বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। আমার পতি-পুত্র-জামাতা হয় তো আত্মহত্যা করিবার অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিবেন। আর শাস্ত্রে কথিত আছে, ভগবতী গঙ্গা নারীচরিত্রের একমাত্র আদর্শ। তিনি নারী হইয়া—মা হইয়া, কি কখনো স্বীয় বক্ষের উপর ব্রহ্মহত্যা হইতে দিবেন? গঙ্গা কখনো আমার স্বামী পুত্রকে আত্মহত্যা করিতে দিবেন না। আমরা এই অপবিত্র নবাব অন্দর হইতে বাহির হইয়া, চল কাশীতে চলিয়া যাই।

যদি আমার স্বামী-পুত্র-জামাতা আত্মহত্যা করিয়া থাকেন, তবে গয়ায় পিণ্ড না পড়িলে তাঁহাদের মুক্তি হইবে না। অতএব তাঁহাদের পিণ্ড প্রদান না করিয়া, আমরা আত্মহত্যা করিব না। দ্বাদশ বৎসর পরে তাঁহার পিণ্ডদান করিয়া, পরে আমরা তিনজনেই আপন আপন স্বামীর কুশপুত্তল নির্মাণ পূর্বক তৎসঙ্গে চিতারোহণ করিব। এখন আমি কোন্ প্রাণে এই দ্বাদশ বৎসর বয়স্কা পুত্রবধূকে আত্মহত্যা করিতে বলিব? আর আমরা দুইজনে আত্মহত্যা করিলে, ইহাকে কাহার নিকট রাখিয়া যাইব?

'জননীর এই কথা শুনিয়া, বুদ্ধিমতী কন্যা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন রমণী তাঁহাকে নবাবের অপবিত্র গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবার সুবিধা করিয়া দিতে বলিলেন।

'ইহারা আত্মহত্যা করিবার প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিল, তাহাতে আমি অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিলাম। আমি তৎক্ষণাৎ নিশ্বাস খোজা এবং দুই জন বাঁদী ইহাদিগের সঙ্গে দিয়া কাশীর রাস্তার উপর ইহাদিগকে উঠাইয়া দিয়া আসিতে বলিলাম। ইহাদিগের পথের ব্যয় নির্বাহার্থে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিবার সময় ব্রাহ্মণী কোনক্রমেই অর্থ গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। আমি বলিলাম,—মা, এখন তোমাদের সঙ্গে একটি পয়সাও নাই, কি প্রকারে কাশীতে চলিয়া যাইবে? অনেক বলিয়া কহিয়া, আমি ব্রাহ্মণীর পুত্রবধূর অঞ্চলে পঞ্চাশটি মোহর এবং কয়েকটি টাকা বাঁধিয়া দিলাম। তাঁহারা তিনজনে কাশীতে চলিয়া গেলেন। এই ব্রাহ্মণীর নাম জগদম্বাদেবী।

'কিন্তু কি আশ্চর্য! জগদম্বাদেবীর বাক্য নিষ্ফল হইল না। এই ঘটনার অত্যল্পকাল পরে, বিনা মেঘে বজ্রপাত হইয়া, আমার কুপুত্র নবাব নসিরান মুলকের প্রাণ বিনষ্ট হইল।

'নসিরান মুলকের মৃত্যু সংবাদে আমি এক বিন্দুও অশ্রু বিসর্জন করি নাই। তাহার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছিবামাত্র উজু করিয়া নেমাজ গৃহে প্রবেশ করিলাম। এবং খোদাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম,—আয়ে খোদা তেরী সব মরজি হো চুকে—মেরি কিস্‌মত মে যো লিখা হায়ে এলাহি! সিতাব হো।

'নসিরান মুলকের মৃত্যু ঘটনায় জগদম্বাদেবীর প্রতি আমার ভক্তি শ্রদ্ধা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। মনে করিতে লাগিলাম যে এই কুপুত্র হইতে তিনিই আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন। সুতরাং সেই হইতে আমি সেই পরমাসাধ্বী রমণীর নাম ধারণ করিতেছি। সেই হইতেই আমার নাম জগদম্বা বেগম।

জগদম্বা শব্দের অর্থ সকলের মা। আমার ইচ্ছা যে আমি সকলকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করি।'

জগদম্বা বেগম এইরূপে আত্মবিবরণ বিবৃত করিলে পর বউবেগম জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আপনার স্বামীকে নাকি সিংহাসনচ্যুত করিবার নিমিত্ত আপনি জামাতার সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছিলেন?'

জগদম্বা বেগম আবার বলিতে লাগিলেন,—'আমার এই কন্যার প্রতিই আমার অধিক স্নেহ। পুত্র আমার চক্ষের শূল ছিল। নসিরাল মুল্কের মৃত্যুর পূর্বেই আমি মীরকাসিমকে সিংহাসন অধিকার করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম। মীরকাশিম আলিবর্দি খাঁর একজন আত্মীয় ছিলেন। কাসিম আলি প্রথম হইতে আলিবর্দির স্ত্রীর সহিত একত্র হইয়া চেষ্টা করিলে, ইংরাজদিগের সাহায্য গ্রহণ না করিলেও, সিংহাসন অধিকার করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার কি দুর্বুদ্ধি হইল, তিনি ইংরাজদিগের সাহায্যে রাজ্যলাভ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হলওয়েল সাহেব নামক একজন ইংরাজকে কেবলই উৎকোচ প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে হলওয়েল সাহেবের দ্বারা তাঁহার বড় উপকার হইল না। লোক পরম্পরায় শুনিতে পাই যে, কোনো ইংরাজের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই কাসিম আলি নসিরাল্ মুল্কের প্রাণবধ করিয়াছিলেন। কিন্তু কাসিম আলি নিজে একথা বার বার অস্বীকার করিয়াছেন। কাসিম আলি ইংরাজদিগের সাহায্যে রাজ্য লাভ করিয়াই সর্বনাশ করিলেন। সস্নেহে প্রজাপালন করিবার তাঁহার বিলক্ষণ ইচ্ছা ছিল। ইংরাজদিগের অত্যাচার হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি প্রাণপণে যত্ন করিতেন। কিন্তু ইংরাজদিগকে তিনি যে টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, সেই টাকা পরিশোধ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে প্রজার উপর ঘোর অত্যাচার করিতে হইল। তাঁহার আমলে জমিদার তালুকদার-দিগের উপরও অত্যন্ত অত্যাচার হইতে লাগিল। যে রাজা প্রজার উপর অত্যাচার করে তাঁহার রাজ্য কখনও চিরস্থায়ী হয় না। সুতরাং কাসিম আলি রাজ্যচ্যুত হইয়া, আপনাদিগের আশ্রয় লইলেন। তাঁহার সঙ্গে আমরা আসিয়া বেরিলিতে অবস্থান করিতেছিলাম। পরে আপনাদের অনুরোধে এখানে আসিয়া অবধি আপনাদের আতিথ্য গ্রহণ করিতেছি।'—

জগদম্বা বেগম সায়দউন্নিসা এবং বউবেগমের নিকট এইরূপ আত্মবিবরণ বিবৃত করিলে পর, তাঁহাদের মন একটু বিগলিত হইল। তাঁহারা উভয়েই

জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সুজার হস্ত হইতে হাফেজ-নন্দিনীকে কি প্রকারে রক্ষা করা যাইতে পারে ?'

জগদম্বা বলিলেন,—'সুজা এখানে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্বেই হাফেজ-নন্দিনীকে স্থানান্তরে প্রেরণ করুন। হাফেজ-নন্দিনী রোহিলাধিপতির কন্যা। আপনারাও একবার বিপদে পড়িয়া, রোহিলাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। হাফেজ-নন্দিনীর প্রতি অত্যাচার করিলে নিশ্চয়ই, সুজার কোনো বিশেষ অমঙ্গল হইবে।'

সায়দউন্নিসা বউবেগমকে বলিলেন,—'তুমি ইহাকে স্থানান্তরে প্রেরণের ভার গ্রহণ কর।'

বউবেগম মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, যে, পুত্রের নিকট ইনি নির্দোষী থাকিতে চাহেন ; এ বিষয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমাকে গ্রহণ করিতে বলেন ; এ বড় স্বার্থপরতার কার্য।

হাফেজ-নন্দিনীকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিবার দায়িত্ব কে গ্রহণ করিবেন, এই বিষয় লইয়া তর্ক-বিতর্ক হইতে লাগিল। জগদম্বা বলিলেন,—'আপনারা উভয়েই এই দায়িত্ব গ্রহণ করুন।'

সায়দউন্নিসা এবং বউবেগম অগত্যা উভয়েই এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু কোথায় তাঁহাকে পাঠাইবেন সেই বিষয়ের কথাবার্তা আরম্ভ হইবামাত্র কেল্লা হইতে দুড়ুম দুড়ুম শব্দে তোপ পড়িতে লাগিল। চতুর্দিক হইতে রণ-বাদ্যের ধ্বনি সমুত্থিত হইল। ঢ্যাং ঢ্যাং ফো ফো এই শব্দে রাজপ্রসাদ পরিপূর্ণ হইল। "নবাব আসিয়াছেন" "নবাব আসিয়াছেন" লোকারণ্যের এই চীৎকারে পরস্পরের কথা শুনিবার কাহারও সাধ্য নাই। বেগমেরা আপন আপন আসন হইতে উঠিয়া যাইয়া, গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইলেন। লোকারণ্যের কোলাহলে পড়িয়া সকলেই আপন আপন কর্তব্য বিস্মৃত হইলেন। এ সংসারের ধুমধাম এবং লোকারণ্যের কোলাহলের মধ্যে পড়িয়া মানুষ সর্বদাই আপন আপন কর্তব্য বিস্মৃত হয়।

কিন্তু অর্ধঘণ্টা পরে দেখা গেল যে, নবাব এখনো আসিয়া পৌঁছেন নাই। তিনি এখনও ফায়েজাবাদ হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে আছেন। ইংরাজ সৈন্যের অগ্রভাগ দেখিয়াই, লোকে নবাব আসিয়াছেন বলিয়া চীৎকার করিয়াছিল।

লোকারণ্যের কোলাহল একটু থামিল। সংসারে শত সহস্র কোলাহলের

মধ্যে থাকিলেও জগদম্বা কখনও স্বীয় কর্তব্য বিস্মৃত হয়েন না। তিনি আবার বেগমদিগকে ডাকিয়া বলিলেন,—'কোথায় হাফেজ-নন্দিনীকে পাঠাইবে তাহা এখনই অবধারণ কর। আর সময় নাই।"

বেগমদ্বয় আবার জগদম্বার সঙ্গে একত্র হইয়া বসিলেন। বেগমেরা বলিলেন,—'এমন স্থানে তাহাকে রাখিতে হইবে যে সুজা অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইলে তাঁহাকে আবার তৎক্ষণাৎ আনিয়া দিতে পারি।'

জগদম্বা বলিলেন,—'তবে সম্পূর্ণরূপে কর্তব্য প্রতিপালনের ইচ্ছা তোমাদের নাই। বড় আঁটাআঁটি দেখিলে, তাঁহাকে সুজার হাতে সমর্পণ করিবে।'

এইরূপ বাদানুবাদে অর্দ্ধঘণ্টা অতিবাহিত হইবামাত্র আবার দুড়ুম দুড়ুম শব্দে তোপ পড়িতে লাগিল। আবার সেই ঢাং ঢাং ফেঁা ফেঁা আরম্ভ হইল। আবার 'নবাব আসিয়াছেন' 'নবাব আসিয়াছেন' বলিয়া চতুর্দিকে চীৎকার হইতে লাগিল। বেগমরা জানলার নিকট যাইয়া দাঁড়াইলেন। একঘণ্টা পর্যন্ত লোকারণ্যের কোলাহল চলিতে লাগিল। একঘণ্টা পরে শুনা গেল, ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল চাম্পিয়ন আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

এই দ্বিতীয়বারের কোলাহল একটু থামিলে পর আবার জগদম্বা বেগম অযোধ্যার বেগমদ্বয়কে ডাকিয়া বলিলেন,—'আর সময় নাই, এখনও ঠিক কর কোথায় হাফেজ-নন্দিনীকে পাঠাইতে হইবে।'

কিন্তু এখন আর সত্য সত্যই সময় নাই। বেগমদ্বয় আসন গ্রহণ করিবার পূর্বেই নবাবসৈন্যের অগ্রভাগ ফয়েজাবাদ আসিয়া পৌঁছিল। দুইবার সমুদয় লোক 'নবাব আসিয়াছেন' 'নবাব আসিয়াছেন' বলিয়া চীৎকার করিয়া নিরাশ হইয়াছে। এবার সত্য সত্যই নবাব আসিয়াছেন। দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত রণবাদ্য আরম্ভ হইল। দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত লোক চীৎকার করিতে লাগিল। ঘোর কোলাহল উপস্থিত হইল। সময় থাকিতে কাজ না করিলে, এ সংসারে লোক কখনো কর্তব্য সাধন করিতে পারে না। সময় কাহারও নিমিত্ত অপেক্ষা করে না।

চতুর্দশ অধ্যায়

পিতৃবৈরী বিনাশ

বেলা প্রহরেক থাকিতে, নবাব সুজাউদ্দৌলা রাজধানী আসিয়া পৌঁছিলেন। বাড়ির দরবার গৃহ বিশেষরূপে সুসজ্জিত হইয়াছিল। গৃহে প্রবেশপূর্বক নবাব সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। দেওয়ান, বকশী, উজীর এবং অন্যান্য আমলা সকলেই করজোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া আছেন। গৃহের বাহিরে গায়িকা নর্তকী বাদ্যকর প্রভৃতি আপন আপন পারদর্শিতার পরিচয় প্রদানার্থে তুমুল সংগ্রাম করিতেছে। প্রত্যেকেই অন্যান্য সকলকে পশ্চাতে রাখিয়া নবাবের দৃষ্টিপথে আসিয়া দাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে।

নবাব প্রধান প্রধান কর্মচারিদিগের সহিত কিঞ্চিৎ আলাপ করিয়া, উজীর-পাত্র-মিত্রসহ নেমাজ পড়িবার নিমিত্ত মসজিতে চলিলেন। আজ ছোট বড় সকল লোকেরই একটু নেমাজ পড়িবার ইচ্ছা হইল। হিন্দু আমলা এবং কর্মচারিগণ এখন আর নবাবকে অনুসরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা গায়িকা ও নর্তকীদিগের মনোরঞ্জনার্থ গীত, বাদ্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন! এদিকে অত্যুৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সুসজ্জিত, আতর মাখা রুমাল হাতে, মুসলমানের দল বক্ষস্ফীত করিয়া, একবার খোদার কাছে হাজিরা দেখাইতে চলিলেন। এই সকল মুসলমান কুলতিলক হাসিতে হাসিতে যেরূপ দ্রুতপদে চলিয়াছেন, তাহাতে বোধহয় যেন খোদা অনেকক্ষণ পর্যন্ত রেজিস্টারি হাতে করিয়া মসজিদে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। ইহারা মসজিদে গেলেই তিনি হাজিরা লিখিতে আরম্ভ করিবেন।

নবাব রোহিলা-যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন, নিরাশ্রয় রোহিলা রমণীদিগের প্রতি ঘোর অত্যাচার করিয়াছেন, এ শুভ সংবাদটী খোদার কাছে অবশ্যই বলিতে হইবে।

প্রায় একঘণ্টা পরে নবাবের নেমাজ সমাপ্ত হইল। মসজিদ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আবার দরবার গৃহে কিছুকাল বসিলেন। এবা তাঁহার দরবার গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্বেই ভৃত্যেরা ঝাড় লণ্ঠন ইত্যাদি দ্বারা গৃহ আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল। নবাব এই সকল আয়োজন দর্শনে পরম

পরনাই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং চারিদণ্ড রাত্রের সময় বেগমদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত বড় অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে অন্দরের মধ্যে বেগমগণ নবাবের বাহির বাটী পৌছিবার অব্যবহিত পরেই নেমাজ-গৃহে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। এই অন্দরবাসিনী বেগমদিগের মধ্যে কখনো কোরাণ পাঠ করিবার প্রয়োজন হইলে, নবাব [illegible] মের স্ত্রীকেই সকলে পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেন। বউবেগম [illegible] তাঁহার অনুসন্ধানার্থ অকস্মাৎ হাফেজ-নন্দিনীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন হাফেজ-নন্দিনীর মুখ-কমল ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সেই বিষাদ পরিপূর্ণ মুখের দিকে চাহিলেও, সে মুখ-কমলের অপূর্ব কিরণ সে সময় দর্শনে সকলের মনই মোহিত হইত। বউবেগম ইঁহার সেই অপরূপ রূপলাবণ্য দেখিয়া, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, যে, নবাব ইঁহাকে নিকা করিলে ইনি নিশ্চয়ই প্রাধান্য বেগম হইবেন।

এই চিন্তা তাঁহার মনে বিশেষ কষ্ট প্রদান করিতে লাগিল। তিনি স্থির নেত্রে হাফেজ-নন্দিনীর মুখের দিকে একবারও চাহিতেও পারিলেন না। কিন্তু প্রকাশ্যে কিছুই বলিলেন না। মনের ভাব গোপন পূর্বক মীরকাসিমের পত্নীকে সঙ্গে করিয়া নেমাজ-গৃহে চলিলেন। ইঁহারা দুইজন প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইবার সময়, প্রকোষ্ঠ দ্বারে জগদম্বার সহিত সাক্ষাৎ হইল। বউবেগম জগদম্বাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আপনি নেমাজ-গৃহে যাইবেন না?'

জগদম্বা বলিলেন,—'খোদার সমুদয় কার্য অগ্রে সম্পন্ন না করিলে, তাঁহার নিকট গেলে, তিনি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন।'

বউবেগম এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন; এবং জগদম্বাকে বলিলেন,— 'খোদার কি কি কার্য করিতে বাকি রহিয়াছে?'

জগদম্বা বলিলেন,—'হাফেজ-নন্দিনীকে সুজার হস্ত হইতে রক্ষা করাই তো এক কার্য দেখিতে পাই।'

বউবেগম এই কথা শুনিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

জগদম্বা আবার বলিলেন,—'নবাব আলিবর্দির মুখে শুনিয়াছি, যে, সংসারে দুই প্রকার নবী আছেন; আম-নবী এবং খাস-নবী। তিনি বলিতেন মহম্মদ আমাদের সকলেরই আম-নবী। মহম্মদ পৃথিবীর সমুদয় লোককে ধর্ম্মোপদেশ দিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু এ সংসারে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের খাস-নবী। একজন যখন অপরের ভ্রম দেখাইয়া দিতেছেন, একজন যখন অন্যের

কর্তব্যের পথ দেখাইয়া দিতেছেন, তখন তিনি খাস-নবীর কার্য করেন। এ সংসারে আম-নবীর বাক্য প্রতিপালন করিবার পূর্বে খাস-নবীর কথা পালন করিতে হইবে। আজ আমি তোমার খাস-নবী। এখনও সময় থাকিতে হাফেজ-নন্দিনীর একটা সদুপায় কর। আমার এই অনুরোধটি রক্ষা কর। এই কর্তব্য সম্পন্ন না করিয়া খোদার কাছে গেলে, তিনি সন্তুষ্ট হইবেন না।'

বউবেগম মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন এখন আর তাহার সময় নাই। তিনি জগদম্বার কথার প্রত্যুত্তরে কিছু না বলিয়া, মীরকাসিমের স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া অন্দরের মধ্যস্থিত নেমাজ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। সেখানে সায়দউন্নিসা বেগম তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

নেমাজ পড়িতে বসিবার পূর্বে মীরকাসিমের স্ত্রী কোরান হইতে পাঠ করিলেন,—

'ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করিলে, সংসারে কেহই তোমার কোনো অনিষ্ট করিতে পারিবে না। কিন্তু ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিলে, তুমি অবলম্বন রহিত, মূল-শূন্য শুষ্ক তৃণের ন্যায় সংসারের-বায়ু দ্বারা কেবল, এদিক-ওদিক পরিচালিত হইবে। অতএব তুমি সর্বদা কেবল ঈশ্বরের উপরই নির্ভর কর।'

কোরান পাঠের পর ইঁহারা একত্র হইয়া নেমাজ করিতে লাগিলেন। নেমাজ সমাপ্ত করিয়া বাহিরে আসিবার অব্যবহিত পরেই নবাব সুজাউদ্দৌলা অন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

নবাব কিছুকাল স্বীয় জননীর সহিত বাক্যালাপ করিয়া, বউবেগমের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। বউবেগম পূর্ব হইতেই মনে মনে স্থির করিয়া বসিয়াছেন যে রোহিলখণ্ড নবাবের রাজাভুক্ত হইলে, রোহিলাদিগের দুই-একখানি জায়গির স্বামীর নিকট হইতে চাহিয়া লইবেন। কিন্তু প্রায় একমাস কি দেড়-মাসের পর আজ তাঁহার স্বামী গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন; আজই স্বীয় প্রার্থনা প্রকাশ করা উচিত কি না, তাহাই ভাবিতেছিলেন।

হাফেজ-নন্দিনীর প্রতি সুজা কোনো প্রকার অত্যাচার না করেন, সেই বিষয় অনুরোধ করিতে জগদম্বা বউবেগমকে পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন। বউ-বেগমও সুজার নিকট এই অনুরোধ করিবেন বলিয়া, জগদম্বার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। ইহাদিগের নেমাজের পর জগদম্বা দেখিলেন যে, হাফেজ-নন্দিনীকে আর স্থানান্তরিত করা হইল না; তখনই বউবেগমের

নিকট এই শেষ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বউবেগম স্বামীর নিকট জায়গিরের বিষয় আজই বলিবেন কি না, সেই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অন্য সকল কথাই বিস্মৃত হইলেন। হাফেজ-নন্দিনীর বিষয়ে সুজার নিকট কোনো কথা বলিতে আর তাঁহার স্মরণ হইল না। অর্থ-চিন্তা অর্থ-প্রলোভন নিবন্ধন মানুষ সর্বদাই আপন কর্তব্য বিস্মৃত হয়।

সুজা রোহিলখণ্ড হইতে প্রত্যাবর্তনকালেই মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছেন যে ফায়েজাবাদ পেঁছিয়াই হাফেজ-নন্দিনীকে নিকা করিবেন। হাফেজ-নন্দিনীর সেই অপরূপ রূপলাবণ্য তাঁহাকে ক্ষিপ্তপ্রায় করিয়া তুলিয়াছে। পথে পুনঃ পুনঃ কেবল হাফেজ-নন্দিনীর মুখ-কমল তাঁহার স্মৃতিপথারূঢ় হইত।

এখন বেগমের সহিত দুই-চারি কথা বলিয়াই শয়ন প্রকোষ্ঠে গমন করিয়া বাঁদীদিগকে হাফেজ-নন্দিনীকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন।

বাঁদীগণ সহাস্য মুখে হাফেজ-নন্দিনীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশপূর্বক নবাবের আদেশ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিল। তিনি বাঁদীদিগের কথায় কোনো প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

বাঁদীগণ আবার তাঁহাকে নবাবের আদেশ জ্ঞাপন করিল। তিনি এবারও কোনো উত্তর প্রদান করিলেন না।

বাঁদীগণ নবাবের নিকট যাইয়া বলিল,—'হাফেজের কন্যা আপনার হুকুম শুনেন না।'

নবাব সহাস্যমুখে বলিলেন,—'তাহাকে বলপূর্বক ধরিয়া আন।'

বাঁদীগণ আবার হাফেজ-নন্দিনীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্বক নবাবের এই দ্বিতীয় আদেশ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিল।

হঠাৎ হাফেজ-বালার কোরানের সেই কথা স্মৃতিপথারূঢ় হইল। তিনি মনে করিতে লাগিলেন,—মানুষকে সূর্যের ন্যায় তেজস্বী এবং চন্দ্রের ন্যায় নির্মল হইতে হইবে। হঠাৎ যেন তাঁহার অন্তরে পিতৃবৈর-নির্যাতনের আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইল। তিনি বাঁদীদিগের সঙ্গে সুজার শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই সুজা বাঁদীদিগকে স্থানান্তরে যাইতে বলিলেন।

বাঁদীগণ স্থানান্তরে চলিয়া গেলে পর, সুজা হাফেজ-নন্দিনীকে স্বীয় শয্যার পার্শ্বে উপবেশন করিতে বলিলেন। কিন্তু তিনি মৌনাবলম্বন পূর্বক দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সুজা আবার বলিলেন,—'তোমার কোনো ভয় নাই। আমি তোমাকে প্রধান বেগম করিব।'

হাফেজ-নন্দিনী প্রত্যুত্তর করিলেন না।

সুজা স্বয়ং শয্যা হইতে উঠিয়া, হাফেজ-বালাকে ধরিবার অভিপ্রায়ে একপদ অগ্রসর হইবামাত্র হাফেজ-নন্দিনী সক্রোধে বলিলেন,—'দুর্বৃত্ত, আমাকে স্পর্শ করিলে এখনই তোর মৃত্যু হইবে।'

সুজা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—'তোমার ভয় নাই। তুমি অযোধ্যার বেগম হইবে।'

হাফেজ-নন্দিনী। তোর অযোধ্যা আমি পদতলে দলন করি। যদি প্রাণের আশা থাকে কখনো আমাকে স্পর্শ করিস না।

সুজা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) তুমি আমার প্রাণ বিনাশ করিবে?

হাফেজ-নন্দিনী। তুই হারাম, তোর মুখ দর্শন করিলেও পাপ হয়।

সুজা। বাঁদী তুমি অযোধ্যার নবাবকে হারাম বলিতেছ? এত আস্পর্ধা!

হাফেজ-নন্দিনী। তুই নবাব নহিস্। তুই নিশ্চয়ই হারাম।

'কি আবার! এত আস্পর্ধা!' এই বলিয়া সুজা অগ্রসর হইয়া হাফেজ-নন্দিনীকে ধরিবার উপক্রম করিবামাত্র তিনি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তৎক্ষণাৎ কেশের মধ্যস্থিত সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া, সুজার বক্ষে আঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে আঘাত সুজার স্কন্ধের নিচে বাহুর উপর পড়িল। বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় বিষাক্ত ছুরিকার অগ্রভাগ সুজার শরীরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, তিনি চীৎকার করিয়া, ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। এ দিকে হাফেজ-বালা সেই ছুরিকা তৎক্ষণাৎ স্বীয় বক্ষে সংবিদ্ধ করিয়া আত্মহত্যা করিলেন।

সুজার চীৎকারের শব্দ শুনিয়া নিকটস্থিত প্রকোষ্ঠ হইতে বাঁদীগণ তৎক্ষণাৎ নবাবের শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। কিন্তু কি ভীষণ দৃশ্য! হাফেজ-বালার বক্ষে ছুরিকার অগ্রভাগ এখনো প্রবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। হাত-খানি বক্ষের উপর রহিয়াছে। তিনি ধরাশায়িনী হইয়া পড়িয়াছেন। এদিকে নবাব সুজাউদ্দৌলা ভূমিতলে গড়াগড়ি যাইতেছেন। তাঁহার সর্ব শরীর বিষের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে।

বাঁদীগণের মধ্যে কেহ কেহ তখন তালবৃন্ত হস্তে করিয়া সুজাকে বাতাস করিতে লাগিল। আর দুই-তিনজন দৌড়িয়া যাইয়া বউবেগম এবং নবাব-

উন্নিসা বেগমকে এই দুর্ঘটনার সংবাদ দিল। চারি-পাঁচ মিনিটের মধ্যে অন্দর মহল কোলাহলে পরিপূর্ণ হইল।

বেগমেরা নবাবের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াই দেখেন যে, সুজা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, তাঁহার বাহু হইতে অত্যন্ত শোণিত নির্গত হইয়াছে। এদিকে স্বর্ণপ্রতিমা হাফেজ-বালা ছুরিকা-বক্ষে পড়িয়া রহিয়াছেন।

বেগমেরা প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, যে সুজার কোনো অনিষ্ট হয় নাই; কেবল হাফেজ-বালাই আত্মহত্যা করিয়াছেন। কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত সুজাকে ছট্‌ফট্ করিতে দেখিয়া তাঁহাদের বিশেষ আশঙ্কা হইল। তাঁহারা মাতুর্জা খাঁ, হায়েদরবেগ খাঁ, আমিরবেগ খাঁ প্রভৃতি প্রধান প্রধান কর্মচারিদিগের নিকট বিশ্বস্ত খোজার দ্বারা গোপনে সংবাদ পাঠাইলেন। তাঁহারা সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র তৎক্ষণাৎ অন্দরের মধ্যে আসিয়া সকল বিষয় গোপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

স্বয়ং মাতুর্জা খাঁ হেকিম আমজেদ্‌আলি খাঁর ভবনে যাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। আমজেদ্‌আলি খাঁর জন্মস্থান পারস্য দেশের অন্তর্গত ইস্পাহান নগরে। ইনি স্বদেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া পূর্বে দিল্লীতে ছিলেন। সবদরজঙ্গের সময় হইতে অযোধ্যার উজীরের হেকিমের পদে নিযুক্ত হইয়া, তদবধি লক্ষ্মৌ নগরে অবস্থান করিতেছেন।

হেকিম আমজেদ্‌আলি, মাতুর্জা খাঁর সঙ্গে নবাবের শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া তাঁহার ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। নবাবের বাহুর উপর অত্যন্ত ক্ষুদ্র আঘাত লাগিয়াছিল। অর্দ্ধ ইঞ্চির অধিক ছুরিকা প্রবিষ্ট হয় নাই। কিন্তু এমন ক্ষুদ্র আঘাতে নবাব যে কেন এত ছট্‌ফট্ করিতেছেন, তাহা প্রথমতঃ বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। পরে হাফেজ-বালার বক্ষ হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া দেখিলেন, যে ছুরির অগ্রভাগ বিষাক্ত ছিল। সেই বিষ বিশেষ পরীক্ষা করিয়া আমজেদ্‌আলি বলিলেন,—'সর্বনাশ হইয়াছে। এই বিষ শরীরের রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে আর প্রাণ রক্ষা হয় না। এ বিষ শরীরের রক্ত সংস্পর্শ করিবামাত্র নবাবের মৃত্যু হইত। কিন্তু অত্যল্প পরিমাণ বিষ শরীরের রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। সুতরাং এখনো নবাবের মৃত্যু হয় নাই; নবাবকে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। নবাবের সমুদয় শরীর প্রথমে স্ফীত হইয়া শরীরের মাংস পচিতে থাকিবে। তখন ক্ষুধা তৃষ্ণা

বোধ থাকিবে না। ক্রমে সর্বাঙ্গ পচিয়া উঠিলেই নবাবের মৃত্যু হইবে। এখন আর নবাবের প্রাণ রক্ষার কোনো উপায়ই নাই।'

বেগমেরা হেকিমের এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন। নবাবের ছট্‌ফট্‌ নিবারণার্থে কেহ তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন, কেহ মস্তকে গোলাপ জল ঢালিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই শারীরিক যন্ত্রণা নিবারিত হইল না।

এদিকে মাতুর্জা খাঁ প্রভৃতি কর্মচারিগণ, অন্দরের বাঁদী এবং খোজাদিগকে ডাকিয়া সাবধান করিয়া বলিল, যে, এই সকল ঘটনা কেহ প্রকাশ করিলে, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। সকল বিষয়ই অতি গোপন রাখিতে হইবে।

হাফেজ-নন্দিনীর ক্ষুদ্র শরীরখানি এখনো ভূমিতলে পড়িয়া রহিয়াছে। সেই হাসিভরা সরলতা পরিপূর্ণ মুখখানি হইতে এখনো যেন মৃদু হাস্য বাহির হইতেছে। মাতুর্জা খাঁ প্রভৃতি উপস্থিত বিশ্বস্ত কর্মচারিগণ কয়েক জন বিশ্বাসী গোলামকে ডাকাইয়া আনাইয়া, রাত্রি অবসান হইবার পূর্বেই খোর্দ-মহলের পশ্চাৎস্থিত উদ্যানে সেই স্বর্ণ প্রতিমা সদৃশী হাফেজ-নন্দিনীর পবিত্র দেহ-কমল ভূগর্ভে লুকাইয়া রাখিতে বলিলেন। গোলামগণ হাফেজ-নন্দিনীর মৃত শরীর স্কন্ধে করিয়া, সেই নির্দিষ্ট স্থানে কবর দিতে চলিল।

হেকিম আমজেদ্ আলি খাঁ যখন নবাবের শয়ন প্রকোষ্ঠের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন মাতুর্জা খাঁ প্রভৃতি বিশ্বস্ত কর্মচারিগণ অন্দরের সমুদয় বাঁদী-দিগকে বাহিরে যাইতে আদেশ করিলেন। বাঁদীগণ মধ্যে অনেকেই পর্দার অন্তরালে থাকিয়া হেকিমের সমুদয় কথা শুনিয়াছিল।

বাঁদীদিগের মধ্যে পাঠকগণের পূর্ব পরিচিতা প্রেমিকা তোফানী আজ অমরসিংহকে স্ত্রীলোকের বেশে অন্দরের মধ্যে আনিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। কিন্তু এ উপস্থিত সাংঘাতিক ঘটনানিবন্ধন এখনো পর্যন্ত সে পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে যাইয়া অমরসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারে নাই। অমরসিংহ সেই পুষ্করিণীর পাড়ে আসিয়া তোফানীর জন্য অপেক্ষা করিতেছে। হেকিম আমজেদআলি খাঁ আসিলে পর মাতুর্জা খাঁ প্রভৃতি যখন বাঁদীদিগকে প্রকোষ্ঠের বাহিরে যাইতে বলিল, তখন তোফানী অমরসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিবে বলিয়া, মনে মনে স্থির করিল। সে প্রথমতঃ গোপনে পর্দার অন্তরালে থাকিয়া হেকিমের সমুদয় কথা শুনিল। কিন্তু ইহার পর মাতুর্জা খাঁ

বাঁদী ও খোজাদিগকে ডাকিয়া এই সকল কথা গোপন রাখিবার নিমিত্ত সাবধান করিয়া দিয়া, সকলকে আপন আপন শয়ন প্রকোষ্ঠে যাইতে বলিলেন। কেবল তিনজন খোজা এবং চারি-পাঁচজন বিশ্বস্ত বাঁদী যাহারা কখনো অন্দরের বাহির হয় না, তাহাদিগকেই নবাবের সেবা-শুশ্রূষার নিমিত্ত নিযুক্ত করিলেন।

তোফানী এখন বিদায় পাইয়া, তৎক্ষণাৎ অমরসিংহের অনুসন্ধানে পুষ্করিণীর পাড়ে চলিয়া গেল। অমরসিংহ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতচিত্তে তোফানীর জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

তোফানী পুষ্করিণীর পাড়ে উপস্থিত হইবামাত্র অমরসিংহ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিল,—

'আমি তোমার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম। এখন আর বিলম্ব না করিয়া, আমাকে শীঘ্র শীঘ্র অন্দরের মধ্যে লইয়া চল।'

তোফানী বলিল,—'আজ বড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। আজ কোনো প্রকারেই তোমাকে অন্দরের মধ্যে লইয়া যাইতে পারিব না।'

অমরসিংহ গোলযোগের কথা শুনিয়া আরও উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'কি গোলযোগ হইয়াছে?'

তোফানী বলিল,—'সে কথা প্রকাশ করিলে মার্তুজা খাঁ প্রভৃতি আমাদিগের মাথা কাটিয়া ফেলিবে। কিন্তু তুমি আমাকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালোবাস, আমিও তোমাকে আপনজনের মতো দেখি। তোমার নিকট বলিতে কোনো দোষ নাই। কিন্তু সাবধান এ সকল কথা কোন প্রকারে প্রকাশ না হয়।'

অমরসিংহ অপেক্ষাকৃত অধিকতর উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল,—'কি গোলযোগ হইয়াছে বল। আমি কখনো কাহারো নিকট প্রকাশ করিব না।'

তখন তোফানী বলিতে লাগিল,—'আজ রাত্রে নবাব খাস কামরায় যাইয়া সেই হাফেজ রহমত খাঁর মেয়েকে ডাকাইয়া নিয়াছিলেন। হতভাগিনীর কিসমতে সুখ নাই। সে নবাবের নজরে পড়িয়াছিল। নবাব তাহাকে নিশ্চয়ই নিকা করিতেন। কিন্তু সে নিজের কাছে অতি গোপনে একখানা বিষমাখা ছুরি লুকাইয়া রাখিয়াছিল। নবাব আদর করিয়া তাহাকে ধরিতে আসিবামাত্র সে সেই ছুরি দ্বারা নবাবের বাহুর উপর জখম করিয়া পরে নিজের বুকে বিদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অন্দরের মধ্যে এখনও মার্তুজা খাঁ, হায়দারবেগ খাঁ ও আমিরবেগ খাঁ বসিয়া আছেন। হেকিম আসরফের

আলি খাঁ নবাবের জখম দেখিয়া বলিয়াছেন, যে নবাব নিশ্চয়ই মরিবেন। নবাব পাঁচ-ছয় মাসের অধিক বাঁচিবেন না। নবাবের সমুদয় শরীরের মাংস পচিয়া উঠিবে। ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই থাকিবে না। নবাব এখনো সেই বিষের জ্বালায় ছটফট করিতেছেন।'

অমরসিংহ এই কথা শুনিয়া, একেবারে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া পড়িল। তাহার মুখে আর বাক্য নাই।

কিন্তু তোফানী বলিল,—'তুমি এতো দুঃখিত হইলে কেন? এ নবাব মরিয়া গেলে, আসফ্‌উদ্দৌলা নবাব হইবেন। আসফ্‌উদ্দৌলা জন্মিলে পর আমি তাহার নাড়ি কাটিয়াছিলাম। সে অবশ্য আমাকে পেয়ার করিবে।'

কিছুকাল পরে সাবধানে অমরসিংহ আপন হৃদয়ের সমুদয় ভাব গোপন করিয়া বলিল,—

'তুমি বলিয়াছিলে, হাফেজ রহমতের কন্যাকে জগদম্বা বেগম বড় ভালো বাসিতেন। তিনি তাহাকে বাঁচাইবার নিমিত্ত কোনো চেষ্টা করিলেন না কেন?'

তোফানী। সোবান আল্লা! সে কথা তোমার কাছে বলিতে তো ভুলিয়া গিয়াছি। আজ নবাব বাড়ি আসিবেন বলিয়া, যখন আমি, এরফানী আর লোতমানী আতরদান গোলাপদান সাফ করিতেছিলাম, তখন আমাদের বেগম এবং বুড়া বেগমের কাছে জগদম্বা বেগম আসিয়া বলিলেন যে আজ সুজা বাড়ি আসিবেন, হাফেজের মেয়েকে তফাৎ কর। বেগমরা তাঁহার কথা শুনিলেন না। তখন জগদম্বা বেগম কত কত কথা বলিল, তা সকল আমার মনেও নাই। তুমি সে দিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে কি না, যে তাহার জগদম্বা নাম হইল কেন? সেই কথাটা যখন বলিতে আরম্ভ করিল, তখন আমি কান দিয়া তাহা শুনিতে লাগিলাম। যে জন্য তাহার এই কাফেরি নাম হইয়াছে, তাহা এখন জানিতে পারিয়াছি।

অমরসিংহ। কি জন্য তাঁহার জগদম্বা নাম হইয়াছে?

তোফানী। ঐ জগদম্বা বেগমের পূর্ব নাম মেহেরউন্নিসা ছিল। বিবাহের সময় আর একটা কি নাম হইল। ওঁর স্বামী-পুত্রের সঙ্গে ওঁর মিল ছিল না। ওঁর পুত্রের নাম মীরণ মিঞা ছিল। সেই মীরণ মিঞা, জগদম্বা নামের একটা বুড়া বামনী আর জগদম্বার পুত্রবধূ এবং কন্যাকে গঙ্গার ঘাট হইতে ধরিয়া আনিয়াছিল। জগদম্বা বেগম সেই জগদম্বা বামনীর চীৎকার শুনিয়া তাহাকে এবং তাহার পুত্রবধূ এবং কন্যাকে মীরণের হাত হইতে বাঁচাইল।

মীরণ আর তাহাদিগের কিছু করিতে পারিল না। পরে সেই বুড়া বামনীর স্বামী, একটা বাঁদী দ্বারা বুড়া বামনীকে গলায় দড়ি দিয়া মরিতে বলিয়া পাঠাইল। বুড়া বামনীর স্বামী-পুত্র-জামাতা গঙ্গায় ডুবিয়া মরিল। বুড়া বামনী বলিল যে আমি গলায় দড়ি দিয়া কখনো মরিব না। আমার স্বামী-পুত্র-জামাতা গঙ্গায় ডুবিয়া মরিয়াছে। তাহার ভূত হইয়া পাছে পাছে থাকিবে। আমি বারবৎসর পরে তাহাদের পিণ্ড দিয়া মরিব। তৎপরে এই জগদম্বা বেগম, বুড়া বামনীকে তাহার কন্যা এবং পুত্রবধূসহ কাশীতে পাঠাইয়া দিল। তাহারা এখনো কাশীতে আছে। সেই বুড়া বামনী কাশী যাইবার সময় বলিয়াছিল, যে, আমি যদি সতী হই, তবে দুরাচার মীরণ বিনা-মেঘে বজ্রাঘাত হইয়া মরিবে। ইহার কয়েক দিন পরে সত্য সত্যই বিনা-মেঘে বজ্রাঘাত হইয়া মীরণের মৃত্যু হইল। তখন মীরণের মা মনে করিল যে, এই বামনী আসল খোদার বন্দা কি পেগম্বর হইবেন। সেই জন্য নিজের নাম ছাড়িয়া দিয়া, বুড়া বামনীর কাফেরি নাম নিজে নিয়াছে।

অমরসিংহ বিশেষ একাগ্রতার সহিত তোফানীর এই সকল কথা শ্রবণ করিতেছিল। তোফানীর বাক্যাবসানে সে স্পন্দহীন পুত্তলের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। এক একবার তাহার মনে হইতে লাগিল যে, 'এ স্বপ্ন। আমার জননী, স্ত্রী এবং ভগ্নী আপন আপন ধর্ম সংরক্ষণ পূর্বক পরম পবিত্র কাশীধামে অবস্থান করিতেছেন। এ জীবনেই আবার আমার তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। হাফেজ-বাবার উদ্ধারার্থ আমি প্রাণ বিসর্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম বলিয়াই কি ভগবান আমাকে তাহারই পুরস্কার প্রদান করিলেন? হা পরমেশ্বর তোমার ইচ্ছায় কি না হইতে পারে?'

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অমরসিংহের মনে বিবিধ ভাবের উদয় হইতে লাগিল। হঠাৎ তাহার ইচ্ছা হইল যে, সে একবার হাফেজ-নন্দিনীর মৃত-শব দেখিবে।

তোফানী অমরসিংহকে তদবস্থ দেখিয়া, বারম্বার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—'তুমি চুপ করিয়া রহিলে কেন?'

অমরসিংহ তোফানীর সে প্রশ্নের কোনো প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া, হাফেজ-নন্দিনীকে কোথায় সমাধিস্থ করিতে লইয়া গিয়াছে, তাহাই জিজ্ঞাসা করিল।

তোফানী বলিল, 'খোর্দমহলের পশ্চিমদিগের বাগিচায় তাহাকে কবর দিবে।'

অমরসিংহ। খোর্দমহলটা কোন্ দিকে?

তোফানী। (অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) ঐ যে বাড়ি দেখা যায়,—ঐটাই খোর্দমহল।

অমরসিংহ তোফানীকে আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া, তৎক্ষণাৎ খোর্দমহলের দিকে ধাবিত হইল।

তোফানী তাহাকে হঠাৎ এই প্রকার দ্রুতপদে চলিয়া যাইতে দেখিয়া, কতকদূর তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কিন্তু অমরসিংহের অনুসরণ করিবার সাধ্য তাহার হইল না। অমরসিংহ অত্যন্ত দ্রুতপদে চলিয়াছে। অত্যল্প সময় মধ্যে অমরসিংহ প্রায় অদৃশ্য হইল। তোফানী পশ্চাৎ হইতে প্রথমতঃ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,— 'কোথায় চলিলে ?'

কিন্তু অমরসিংহ একবারে অদৃশ্য হইলে পর, সে আপনা আপনি বলিতে লাগিল,—'সোবান্ আল্লা! এত কষ্ট করিয়া আজ এই গোলমালের মধ্যেও অন্দরের বাহিরে আসিলাম, কিন্তু আমাদের আসল কথাব কিছুই ঠিক হইল না।'

তোফানী অনেকক্ষণ পর্যন্ত পুষ্করিণীর পাড়ে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। এক একবার সে মনে করিতে লাগিল যে, হয় তো অমরসিংহ এখনই আবার প্রত্যাবর্তন করিবে। সে অমরসিংহের বর্তমান আচরণের মর্মভেদ করিতে সমর্থা হইল না। কিন্তু যখন দেখিল যে, এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টার মধ্যেও অমরসিংহ প্রত্যাবর্তন করিল না, তখন সে কোপাবিষ্ট হইল, এবং অমরসিংকে লক্ষ্য করিয়া গালি বর্ষণ করিতে করিতে অন্দরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আপন শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশানন্তর আপনা আপনি বলিল,—'শালা বামন্ আবার কাল বৈকালে যখন তুমি আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে, তখন বুঝিবে তোফেজ্জাল উন্নিসা কেমন লোক! তোমাকে আচ্ছা শাস্তি দিব।'

পঞ্চদশ অধ্যায়

উত্তেজিত মন

অমরসিংহের মন এখন অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছে। হর্ষ, বিষাদ, ঘৃণা, দয়া এবং বিদ্বেষ সকল প্রকারের বিরুদ্ধ হৃদয়াবেগে তাহার মন উদ্বেলিত হইতে লাগিল।

হাফেজ-নন্দিনীর মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণে তাহার মন বিষাদে পূর্ণ হইয়াছে।

কিন্তু সেই বিষাদের সঙ্গে সঙ্গে আবার হাফেজ-নন্দিনীর বীরত্বের বিষয় চিন্তা করিয়া মন আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল। হাফেজ-নন্দিনী পিতৃবৈরী বিনাশ করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন। মানব জীবনে ইহা অপেক্ষা আর অধিকতর সুখের বিষয় কি হইতে পারে?

সুজাউদ্দৌলার প্রতি তাহার বড় ঘৃণা উপস্থিত হইল। জগদম্বা বেগমের প্রতি অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা হইল। জগদম্বা বেগমের সাহায্যেই তাহার জননী ভগ্নী এবং স্ত্রী আপন আপন ধর্ম্মরক্ষণে কৃতকার্য হইয়া এখন পরম পবিত্র কাশী-ধামে বাস করিতেছেন। জগদম্বা বেগম তাহার জননীকে দেবতা বলিয়া মনে করেন। তাহার জননীর নাম পর্যন্ত ধারণ করিতেছেন। তাহার জননী সত্য সত্যই দেবী। তাঁহার অভিসম্পাতে বিনা-মেঘে বজ্রপাত হইয়া মীরণের মৃত্যু হইয়াছে। এখন কাশীধামে চলিয়া গেলেই আপন জননী ভগ্নী এবং স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে। কি সুখের বিষয়! এই চিন্তা অমরসিংহের অন্তরে আনন্দবারি বর্ষণ করিতে লাগিল।

এই সকল চিন্তার স্রোতে তাহার মন অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পড়িল। সেই উত্তেজিত মনে সে হাফেজ-নন্দিনীর মৃতদেহ দেখিবার নিমিত্ত দ্রুতপদে খোর্দমহলের পশ্চিমদিকের বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল। বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই চারি-পাঁচজন লোককে মৃত্তিকা খনন করিতে দেখিল। অমর-সিংহ সেই লোকদিগের নিকট যাইতে উদ্যত হইলে তাহাদের মধ্যে দুইজন লোক তাহাকে তাড়াইয়া দিবার নিমিত্ত সম্মুখে অগ্রসর হইল। কিন্তু তরবারি হস্তে অমরসিংহকে সিপাহীর পরিচ্ছদে সুসজ্জিত দেখিয়া গোলামদ্বয় সহসা তাহার গাত্রস্পর্শ করিতে সাহস করিল না। তাহারা দুইজন তাহা-দিগের সঙ্গী অন্য তিনজন লোকের নিকট যাইয়া বলিল,—'একজন সিপাহী আসিতেছে।'

তখন তাহারা পাঁচ-ছয়জন একত্র হইয়া অমরসিংহের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'তুমি কে, কি চাহ?'

অমরসিংহ বলিল,—'আমি কিছু চাই না। তোমরা গোপনে কাহার মৃতশব এখানে আনিয়াছ তাহা দেখিয়া যাইব।'

উপস্থিত লোকদিগের মধ্যে হোসেন খাঁ সকলের অগ্রে আসিয়া বলিল,—'নবাবের অন্দরের একজন বাঁদীর মৃত্যু হইয়াছে। তাহাকে আমরা কবর দিতে আনিয়াছি।'

অমরসিংহ। আমি সে বাঁদীকে একবার দেখিতে চাই।

হোসেন খাঁ। আমরা সে বাঁদীর লাস কাহাকেও দেখাইব না। ইহার লাস কাহাকেও দেখাইতে উজীর মাতুর্জা খাঁ নিষেধ করিয়াছেন।

অমরসিংহ। আমি উজীর মাতুর্জা খাঁর হুকুম মানি না। আমাকে এই মৃতের শব না দেখাইলে, (হস্তস্থিত তরবারি দেখাইয়া) এই তরবারি দ্বারা তোমাদের পাঁচজনেরই মাথা কাটিয়া ফেলিব।

অমরসিংহের কথা শুনিয়া, ভৃত্যদিগের একটু ভয় হইল। তাহারা বলিল,— 'আপনি তবে এই মরা বাঁদীটাকে একবার দেখিয়া শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া যাইবেন। মাতুর্জা খাঁ যেন ইহা জানিতে না পারেন। তিনি শুনিতে পাইলে নিশ্চয়ই আমাদের মাথা কাটা যাইবে।'

অমরসিংহ তখন কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া, হাফেজ-বালার মৃতদেহের নিকট যাইয়া দাঁড়াইল।

অলৌকিক রূপ-লাবণ্য-পরিপূর্ণ সেই ক্ষুদ্র দেহখানি ভূমিতলে পড়িয়া রহিয়াছে। প্রফুল্ল মুখ-কমল হইতে এখনো যেন মৃদু মৃদু হাসি বাহির হইতেছে। চন্দ্রের রশ্মিজাল সে মুখ-কমলে নিপতিত হইয়া শতগুণে তাহার লাবণ্য বৃদ্ধি করিয়াছে। যে হস্তখানি দ্বারা বুকে ছুরিকা বসাইয়া দিয়াছিলেন, সেই দক্ষিণ হস্তখানি এখনো বুকের উপরই রহিয়াছে। হেকিম আমজেদআলি খাঁ ছুরিখানি কেবল হাত হইতে খসাইয়া নিয়েছিলেন। কিন্তু হাতখানি সেইভাবেই পড়িয়া আছে।

অমরসিংহ অনিমেষ নেত্রে সেই স্পন্দহীন, বাক্যহীন মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার নয়নদ্বয় হইতে অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল।

কিছুকাল পরে হোসেন খাঁ আসিয়া বলিল,—'সিপাহী সাহেব আমাদের গর্ত খনন করা হইয়াছে। এখন আপনি চলিয়া যান। মাতুর্জা খাঁ জানিতে পারিলে আমাদের মাথা কাটিয়া ফেলিবেন।'

অমরসিংহ তখন আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া সেই স্থান হইতে চলিয়া গেল। দুই-চারিমিনিট পরেই সে প্রকাণ্ড রাস্তায় আসিয়া উঠিল। রাস্তায় উঠিয়াই ছত্রসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত দ্রুতপদে সেই ভগ্ন গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল।

অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে গৃহে আসিয়া পৌছিল। গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে ছত্রসিংহ সেখানে নাই। শূন্য গৃহ পড়িয়া রহিয়াছে। প্রথমতঃ

গৃহের এদিক ওদিক ছত্রসিংহের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু প্রায় একঘণ্টা অনুসন্ধান করিয়াও তাহাকে কোথাও পাইল না। তখন আবার গৃহের মধ্যে প্রবেশ পূর্বক একটু বিশ্রাম করিতে লাগিল।

অমরসিংহের মন এখনো বিবিধ চিন্তায় উদ্বেলিত হইতেছিল। এখনো পর্যন্ত তাহার উত্তেজিত মন সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, বরং ক্রমেই অপেক্ষাকৃত অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছে। অমরসিংহ ছত্রসিংহকে দেখিতে না পাইয়া, একবার মনে করিল যে, ছত্রসিংহের অনুসন্ধানে আবার বাহির হইবে। কিন্তু তারপর ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে সংকল্প পরিত্যাগ পূর্বক বিশ্রামার্থ একখানি কম্বল পাতিয়া শয়ন করিল। মনে করিল একটু নিদ্রা হইলেই শরীরের ক্লান্তি দূর হইবে।

কিন্তু আজ আর অমরসিংহের চক্ষে নিদ্রা নাই। শত চেষ্টা করিয়াও সে নিদ্রা যাইতে পারিল না। মন এইরূপ উত্তেজিত হইয়া পড়িলে মানুষের কখনো নিদ্রা হয় না। অমরসিংহ শয্যা হইতে আবার উঠিল। ভগ্ন গৃহের বারেন্দায় যাইয়া একবার এদিকে আবার ওদিকে হাঁটিতে লাগিল। এইরূপ হাঁটিতে হাঁটিতে তাহার উত্তেজিত মনে চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল,—

'এখন আর হাকেন্দ্র-নন্দিনীর বিষয় ভাবিলে কি হইবে? তিনি দেববালা ছিলেন। পিতৃবৈরী-বিনাশ এবং নারী-ধর্ম রক্ষা করিয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন। নিশ্চয়ই তিনি স্বর্গে গিয়াছেন। তাঁহার নিমিত্ত শোক করিবার কোনো কারণ নাই।

'কিন্তু কি আশ্চর্য? শ্রীনিবাস পণ্ডিতের একটি কথাও নিষ্ফল হইবার নহে। শ্রীনিবাস পণ্ডিত দেবতা। তিনি বলিয়াছেন, স্বার্থপরতা এবং কাপুরুষতা পরিহার পূর্বক সংসারের অপরাপর লোকের হিত সাধনার্থ জীবন বিসর্জন করিলেই মানুষ সকল সুখের অধিকারী হইতে পারে। আজ আমার জীবনে তাঁহার কথা সম্পূর্ণ ফলিয়াছে।

'আমি কোনো পুরস্কারের কামনা করিয়া, হাকেন্দ্র-নন্দিনীর নিমিত্ত প্রাণ-বিসর্জন করিতে উদ্যত হই নাই? শুদ্ধ কেবল তাঁহারই উপকারার্থ জীবন বিসর্জন করিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু এই সর্বাঙ্গপ্রায় মনে স্থান প্রদান করিয়াছিলাম বলিয়াই কি পরমেশ্বর আমাকে আশাতিরিক্ত সুখশান্তি প্রদান করিলেন? স্নেহময়ী মাতার শ্রীচরণ যে আর এ জীবনে কখনো দেখিতে

পাইব, এইরূপ আশা তো আমার মনে কোনোদিনও ছিল না। যে আশালতা সমূলে উৎপাটিত হইয়াছিল, আজ আবার তাহা ফল-ফুলে পুনর্জীবিত হইল। এখন কাশীধামে চলিয়া গেলে, বোধহয় নিশ্চয়ই জননী, ভগ্নী এবং স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তাঁহারা নরপিশাচের হাতে পড়িয়াও আপন আপন ধর্ম রক্ষা করিয়াছেন। পরম পবিত্র কাশীধামে এই চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত বাস করিতেছেন। জনকাত্মজা বৈদেহী রাক্ষসপতির হস্তে নিপতিত হইয়াও যদ্রূপে আপন সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন, আমার জননী, ভগ্নী এবং স্ত্রীও সেই প্রকারে ধর্মরক্ষণে কৃতকার্য হইয়াছেন। ইহা অপেক্ষাও আর আমার সুখের বিষয় কি হইতে পারে? রাজপদ প্রাপ্ত অপেক্ষাও এই শুভ সংবাদ আমাকে অধিকতর বিমলানন্দ প্রদান করিতেছে।

'ধন্য পিতা নেহালসিংহ! আমি তাঁহার চরণে বারম্বার প্রণিপাত করি। নেহালসিংহই আমার প্রকৃত পিতার কার্য করিয়াছেন। তিনি অস্ত্র শিক্ষা প্রদান না করিলে, তাঁহার উত্তেজনায় সাংগ্রামিক জীবন অবলম্বন করিতে না শিখিলে, আমার হৃদয়ের কাপুরুষতা এবং নীচাশয়তা কখনো বিদূরিত হইত না। আমি এই সুখ-শান্তি লাভের অধিকারী হইতে পারিতাম না।

'পিতা বাল্যকাল হইতে ষোড়শ বর্ষ পর্যন্ত সাহিত্য, ন্যায়, দর্শন, বেদ, বেদান্ত প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই আমাকে শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু সে শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা কি আমার হৃদয়ের কাপুরুষতা দূর হইয়াছিল?

'আমার সতেরো বৎসর বয়সের সময় আমার সাক্ষাতে আমার জননী, ভগ্নী এবং স্ত্রীকে নরপিশাচেরা ধরিয়া লইয়া গেল। আর আমি ভয় ও ত্রাসে চুপ করিয়া রহিলাম? কি ঘৃণিত জীবন! কি ঘৃণিত কার্যই করিয়াছিলাম!

'দূর হউক ন্যায়শাস্ত্র। অধঃপাতে যাউক দর্শন। ন্যায় ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা মানুষ কখনো মানুষ হইতে পারে না। এ সংসার হইতে ন্যায়, দর্শন, সাহিত্য, বেদ, বেদান্ত, বিলুপ্ত হউক,—বিনষ্ট হউক। ন্যায়-প্রণেতা দর্শন-প্রণেতা—তোমরা অধঃপাতে যাও। এ সংসারে যেন তোমাদের নাম কেহ শুনিতে না পায়। তোমরা ন্যায়, দর্শন প্রণয়ন করিয়া জগতের কি উপকার করিয়াছ?

'আমি আর ন্যায়-দর্শন স্পর্শও করিব না। ন্যায়শাস্ত্রের খাতা যেখানে পাইব পুড়াইয়া ফেলিব। দূর হউক শাস্ত্র। সংসারে শাস্ত্রের কোনো প্রয়ো-

জন নাই। সংসারে কেবল শস্ত্র চাই। শস্ত্র মস্তকে বহন করিব—শাস্ত্র পদতলে দলন করিব।'

অমরসিংহ মনে মনে এইরূপ বলিতে বলিতে, 'শাস্ত্র পদতলে দলন করিব' বলিয়া ভূমিতলে পদাঘাত করিবামাত্র ছত্রসিংহের গাঁজার কল্‌কি তাহার পদতলে পড়িয়া মড় মড় করিয়া ভাঙিয়া গেল। ছত্রসিংহ বোধহয় গৃহ হইতে বাহিরে যাইবার সময় গাঁজায় দম দিয়া কলকী ভুলক্রমে বারেন্দায় ফেলিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ সে কল্‌কি এখন অমরসিংহের পদতলে পড়িয়া ভাঙিয়া গেল।

কল্‌কি পদতলে পড়িব মাত্র অমরসিংহের চিন্তার স্রোতে একটু বাধা পড়িল, মনের উচ্ছ্বসিত বেগ একটু থামিল। অকস্মাৎ ছত্রসিংহের গাঁজা খাওয়ার অভ্যাস মনে পড়িয়া একটু ঘৃণা উপস্থিত হইল। তখন চিন্তার স্রোত আবার অন্যদিকে চলিল। অমরসিংহ একটু ইতস্ততঃ করিয়া আবার মনে মনে বলিতে লাগিল,—

'না, বড় অন্যায় কার্য করিয়াছি। অনর্থক শাস্ত্র প্রণেতাদিগকে নিন্দা করিলাম। উত্তেজিত মনের বেগ যে দিকে ধাবিত হয়, সেই দিকেই চলিতে থাকে। উত্তেজিত অবস্থায় মানুষ কোনো বিষয়ের পক্ষাপক্ষ দেখিতে পায় না। কেবল একপক্ষই দেখে।

'শাস্ত্র-শিক্ষা ভিন্ন কেবল শস্ত্র-শিক্ষা দ্বারা মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না। শাস্ত্র, শস্ত্র উভয়েরই প্রয়োজন রহিয়াছে। ছত্রসিংহ অস্ত্র-শিক্ষা করিয়াছে, তাহাব হৃদয়ও অত্যন্ত দয়াশীল, কিন্তু কর্তব্যাকর্তব্য তো সে কিছুই অবধারণ করিতে পারে না। সে একপ্রকার পশু-জীবন যাপন করিতেছে।

'আমি যদি বাল্যকালে শাস্ত্রাধ্যয়ন না করিতাম, তবে, পরে এই অস্ত্র শিক্ষা দ্বারা আমার জীবনে কি কি লাভ হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে সমর্থ হইতাম না।

'কি অন্যায় কার্য করিলাম। শাস্ত্র পদতলে দলন। আমার মুখ হইতে এই কথা বাহির হইল। এ সংসারের পাপ ও অত্যাচার সময়ে সময়ে মানুষকে এতদূর উত্তেজিত করে যে, মানুষ একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়ে। এ সংসারে অন্যের পাপ, অন্যের অত্যাচার আমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে।

'আজ সুজাউদ্দৌলার অত্যাচার আমাকে একদূর উত্তেজিত করিয়াছে যে, আমি আত্মবিস্মৃত হইয়া শাস্ত্রকারদিগকে নিন্দা করিলাম, শাস্ত্রেরও নিন্দা করিলাম। শাস্ত্রনিন্দা দ্বারা লোকের অধোগতি হয়। আমারও নিশ্চয়ই অধোগতি হইবে।

'হে শাস্ত্র প্রণেতা ঋষিগণ, আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন। আমি মনের উত্তেজনায় আপনাদিগকে নিন্দা করিয়াছি। ক্ষমা করুন,—ক্ষমা করুন—ক্ষমা করুন।'

অমরসিংহ যখন চিন্তায় একেবারে নিমগ্ন হইয়া ভগ্ন গাঁজার কলকির নিকট দাঁড়াইয়াছিল, তখন তাহার মুখ হইতে স্পষ্টরূপে ক্ষমা করুন—ক্ষমা করুন' এই শব্দ কয়েকটি আপনা-আপনি নির্গত হইতেছিল। সেই সময়ে অকস্মাৎ ছত্রসিংহ দ্রুতপদে সেখানে আসিয়া অমরসিংহের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল—

'ভাই তুমি এত দুঃখিত হইয়াছ কেন? তুমি বারম্বার আমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছ কেন? আমি যে তোমাকে জীবিতাবস্থায় দেখিতে পাইলাম সেই আমার পরম সৌভাগ্য। তুমি আমার পঞ্চাশটা গাঁজার কলকি ভাঙিলেও আমি তোমাকে ক্ষমা করিব। একটা গাঁজার কলকি না হয় ভাঙিয়াই গিয়াছে। তাহাতে আর কি ক্ষতি হইবে? তোমার প্রাণ বিনষ্ট করিয়া নবাবের লোকেরা তোমাকে কবর দিয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়াই আমি বড় ব্যস্ত হইয়া আসিয়াছি। তোমার মৃতদেহ কবর হইতে উঠাইবার নিমিত্ত কেবল কোদালি তল্লাশ করিতেছিলাম। কিন্তু আমি যাহা শুনিয়াছি সে সকলই মিথ্যা এখন তোমাকে দেখিতে পাইয়া আমার সকল দুঃখ দূর হইল।'

এই বলিতে বলিতে ছত্রসিংহ অমরসিংহকে আপন বুকের মধ্যে টানিতে লাগিল।

অমরসিংহ তাহার বর্তমান আচরণের মর্মভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া, অবাক হইয়া রহিল। কিছুকাল পরে অমরসিংহ, ছত্রসিংহকে জিজ্ঞাসা করিল,—'তুমি কোথায় গিয়াছিলে? আমি তোমার কথার তো কোনো অর্থই বুঝিতে পারিতেছি না।'

ছত্রসিংহ তাড়াতাড়ি বলিল,—'ভাই, আমি মনে করিয়াছিলাম, নবাব বাড়ির লোকেরা তোমার প্রাণবধ করিয়া, তোমাকেই গোরস্থানে নিয়া কবর দিয়াছে। তাই তোমার মৃত শব কবর হইতে উঠাইবার নিমিত্ত সমস্ত রাত্রি কেবল কোদালি তল্লাশ করিয়াছি। কিন্তু এখানে আসিয়াই তোমাকে দেখিতে পাইলাম। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তোমাকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত তোমার কাছে আসিলেই, তুমি আমার দিকে চাহিয়া 'ক্ষমা করুন—

ক্ষমা করুন,—বলিতেছিলে। তুমি বারম্বার ক্ষমা চাহিতেছ কেন? না হয় আমার একটা গাঁজার কলকি ভাঙিয়াই গিয়াছে। কলকিটা ভাঙিয়াছে বলিয়া কি আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করিব। কলকি ভাঙিয়াছে বলিয়া তোমার মনে বুঝি বড় ভয় হইয়াছিল যে, পাছে আবার সে বৎসরের ন্যায় এক কুরুক্ষেত্র কাণ্ড উপস্থিত হয়। ভাই, তোমার ভয় নাই। আমি তোমাকে কিছু বলিব না। সে বৎসর এরফান আলির সেই ছোকরা ইচ্ছা পূর্বক আমার কলকিটা ভাঙিয়াছিল। তাই সেই দুষ্ট ছোঁড়াকে এক চপেটাঘাতে প্রায় যমালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলাম।'

অমরসিংহ ছত্রসিংহকে আবার জিজ্ঞাসা করিল,—'তুমি কোথায় গিয়াছিলে? কাহার নিকট শুনিয়াছিলে যে নবাবের লোকেরা আমার প্রাণ বধ করিয়াছে?'

ছত্রসিংহ বলিল,—'তুমি প্রথম রাত্রে আমার নিকট হইতে চলিয়া গেলে পর, আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, আজ তো তুমি স্ত্রীলোকের বেশে নবাবের অন্দরের মধ্যে যাইয়া তাঁহার প্রাণ নষ্ট করিবে। কিন্তু অন্দরের মধ্য হইতে তুমি প্রাণ বাঁচাইয়া বাহির হইতে পার কি না, তাহাই জানিবার জন্ত বড় ইচ্ছা হইল। আমি সেই জন্ত তোমার পিছে পিছে নবাব বাড়ির দিকে গেলাম। তুমি বলিয়া গিয়াছিলে যে নবাব বাড়ির নিকটস্থ একটা পুষ্করিণীর পাড়ে তোমার সহিত সেই বাঁদীটার সাক্ষাৎ হইবে। আমি নবাব বাড়ির নিকট যাইয়া, সেই পুষ্করিণী তল্লাশ করিতে লাগিলাম। অবশেষে সদর রাস্তার দক্ষিণদিকে একটা পুকুর দেখিতে পাইয়া, সেই পুকুরের পাড়ে যাইয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু তোমাকে সেখানে দেখিতে পাইলাম না।'

অমরসিংহ ছত্রসিংহের কথায় বাধা দিয়া বলিল, সদর রাস্তার উত্তর দিকের পুষ্করিণীর পাড়ে যাইয়া আমি অপেক্ষা করিতেছিলাম। তুমি ভুলক্রমে দক্ষিণ দিকের পুষ্করিণীর পাড়ে গিয়াছিলে। তাহাতেই আমাকে দেখিতে পাও নাই।'

ছত্রসিংহ বলিল,—'তবে তাহাই হইবে। আমি সেই দক্ষিণ দিকের পুষ্করিণীর চারিপাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিন্তু কোথাও তোমাকে আর দেখিতে পাইলাম না। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে সেই পুষ্করিণীর নিকট দিয়া উজীর মাতুব্বা খাঁকে দক্ষিণ দিকে যাইতে দেখিলাম। মাতুব্বা খাঁর সঙ্গে মাত্র একটি লোক লণ্ঠন হাতে করিয়া যাইতেছিল। আমি বড় আশ্চর্য হইলাম।

মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, মার্তুজা খাঁ এইভাবে গোপনে কোথায় চলিয়াছে? মার্তুজা খাঁকে কোথাও যাইতে হইলে তাহার আগে-পাছে পঞ্চাশ জন লোক চলে।

'ইহার প্রায় একঘণ্টা পরে মার্তুজা খাঁ আর-একজন ভদ্রলোককে সঙ্গে করিয়া পুনর্বার নবাব বাড়ি ফিরিয়া চলিল।

"মার্তুজা খাঁর সঙ্গী সেই ভদ্র মুসলমানটিকে আমি আর কখনো দেখি নাই। সে কে তাহা আমি জানিতাম না। কিন্তু মার্তুজা খাঁ এবং সেই ভদ্রলোকটি চুপি চুপি কথা বলিতে বলিতে যাইতেছিল। পথে মার্তুজা খাঁ সেই ভদ্রলোকটিকে বলিল, হেকিম সাহেব, নবাবের শরীর তো বড অধিক জখম হয় নাই। একটু ক্ষুদ্র জখম হইয়াছে বুঝিতে পারি না, ইহাতে নবাব কেন এত ছট্‌ ফট্‌ করিতেছেন। আর যে জখম করিয়াছে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

'এই কথা শুনিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। আমি তখন মনে করিলাম যে, নবাবের প্রাণবধ করিতে যাইয়া, তুমি তাহার প্রাণ নষ্ট করিতে পার নাই, কেবল ক্ষুদ্র জখম করিয়াছ। কিন্তু তোমার প্রাণ তাহারা নষ্ট করিয়াছে।

'তোমার মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া, আমার চক্ষের জল পড়িতে লাগিল। কিন্তু তোমার মৃত শব দেখিবার নিমিত্ত বড় ইচ্ছা হইল। আমি সেই জন্য নবাব বাড়ির সদর দরজার বাহিরে যাইয়া দাঁড়াইলাম। মনে করিলাম, সদর দরজা দিয়াই তোমার মৃত শব বাহিরে লইয়া যাইবে। কিন্তু দুই-তিন ঘণ্টার মধ্যেও কাহাকে কোনো মৃত শব বাহিরে লইয়া যাইতে দেখিলাম না। তখন মনে করিলাম যে হয়তো প্রাতঃকালে তোমার মৃত শব বাহির করিবে।

'এইরূপ মনে করিয়া, আমি খোর্দমহলের নিকটস্থিত রাস্তা দিয়া সোজাপথে গৃহে আসিতেছিলাম। পথে দেখিলাম চারি-পাঁচজন লোক কোদালি হাতে করিয়া নবাব বাড়ির দিকে যাইতেছে। তাহাদের মধ্যে একটা লোক অন্যান্য সঙ্গী লোকের নিকট বলিল, এটা বুঝি কাফের ছিল। নাহলে কবর দেওয়ার সময় মোল্লা সাহেবকে আমাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দিত।—

'দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, কাফের না হইলে, গোরস্থানে কবর না দিয়া এই আমবাগানে কবর দিবে কেন?—'

'ইহাদের কথা শুনিয়া আমার নিশ্চয়ই বোধ হইল যে এই কয়েকজন লোক তোমার মৃত শরীর নিকটস্থিত আমবাগানের মধ্যে গর্ত করিয়া পুঁতিয়া রাখিয়াছে।

'আমি তখন খোর্দমহলের পশ্চিমদিকের আমবাগানের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। মৃত্তিকা খনন পূর্বক যে সেখানে নূতন গর্ত করিয়াছে, তাহার চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। সেই গর্তই তোমার কবর মনে করিয়া, তাহার পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। কিন্তু হঠাৎ আমার মনে হইল যে, তুমি নিজের প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়াও বক্সারের যুদ্ধের সময় আমার প্রাণ বাঁচাইয়াছিলে। আর এখন আমি কি তোমার মৃত শরীর দাহ না করিয়া, এইভাবে ফেলিয়া যাইব? আমি মনে মনে স্থির করিলাম যে, কবর হইতে তোমার মৃত শরীর উঠাইব। পরে গঙ্গার পাড়ে তোমার শরীর জ্বালাইয়া দিয়া এখান হইতে চলিয়া যাইব।

'এই স্থির করিয়াই একখান কোদালি লইয়া যাইতে এখানে আসিয়াছি। কিন্তু এখানে আসিয়াই তোমাকে দেখিতে পাইলাম। তুমি বুঝি আমার গাঁজার কলকিটি ভাঙিয়া অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছ। ভাই, তোর ভয় নাই। তুই নবাবকে জখম করিয়া যে আপন প্রাণ বাঁচাইয়া আসিয়াছিস্ সেই আমার সুখের বিষয়। এখন চল, আমরা এই রাত্রেই পলায়ন করি; নহিলে আবার কাল সকালে তোমাকে ধৃত করিতে আসিবে।'

অমরসিংহ ছত্রসিংকে আশ্বস্ত করিয়া বলিতে লাগিল,—'তোমার ভয় নাই। আমি নবাবকে জখম করি নাই। নবাবের অন্দরের মধ্যে আমি প্রবেশ করিতেও পারি নাই। নবাব রাত্রে শয়নপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্বক হাফেজ-নন্দিনীকে সেখানে আনাইয়াছিল। ইন্দ্রিয়াসক্ত নরপিশাচ হাফেজ-বালার হস্ত ধরিতে উদ্যত হইলে, তিনি আপন কেশরাশির মধ্য হইতে একখানি বিষাক্ত ছুরিকা বাহির করিয়া তদ্দ্বারা প্রথমতঃ নবাবকে আঘাত করিলেন, তৎপরে সেই ছুরি স্বীয় বক্ষে সংবিদ্ধ করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। খোর্দমহলের পশ্চিমদিকের আমবাগানে তুমি যে নূতন কবর দেখিয়া আসিয়াছ, সে হাফেজ-বালার সমাধিস্থান। আমি স্বচক্ষে হাফেজ-বালার মৃতদেহ সেখানে দেখিয়া আসিয়াছি।'

ছত্রসিংহ অশিক্ষিত হইলেও তাহার হৃদয় অত্যন্ত কোমল। হাফেজ-বালার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে তাহার হৃদয় বড়ই বিগলিত হইল। সে কিছু উত্তেজিত হইয়া বলিল,—'তবে শালা উজীরের মৃত্যু হয় নাই? শালাকে খুন না করিয়া, আমরা এখান হইতে যাইব না। এমন সুন্দরী মেয়েটি মরিয়া গেল। এই শালার জন্যই তো মেয়েটি মরিল! শালাকে অবশ্য

খুন করিতে হইবে। ভাই অমর, এবার শালা উজীরকে খুন করিবার ভার আমি লইলাম। তোমাকে কিছু করিতে হইবে না। তোমার অল্প বয়স। তুমি বাঁচিয়া থাক। আমার বাট বৎসর বয়স হইয়াছে, আমার স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, আমি না হয় এখন মরিব।'

অমরসিংহ ছত্রসিংহকে থামাইয়া, বলিল যে, 'উজীর সুজাউদ্দৌলাকে আর খুন করিতে হইবে না। হাফেজ-নন্দিনীই তাঁহার পিতৃবৈরী বিনাশ করিয়া গিয়াছেন। যে ছুরিকা দ্বারা তিনি নবাবকে জখম করিয়াছেন, সে ছুরির অগ্রভাগে বিষ ছিল। হেকিম আমজেদ্ আলি খাঁ সে বিষ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, ছয় কি সাত মাসের অধিককাল উজীর বাঁচিবেন না। ছুরিকার অগ্রভাগের বিষ শরীরের রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে তখন সাপের বিষের ন্যায় কার্য করে; আর বিষের পরিমান অল্প হইলে শরীরের সমুদয় মাংস ক্রমে পচিয়া যায়। নবাবের শরীরের মাংস ক্রমে ক্রমে পচিতে থাকিবে, পরে তাঁহার মৃত্যু হইবে।'

অমরসিংহের এই কথা শুনিয়া ছত্রসিংহ বলিল,—'তবে ভালোই হইয়াছে। কিন্তু এখন কি করিবে বল।'

অমরসিংহ বলিল,—'দাদা, ভগবান আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে এখন সকল সুখেরই অধিকারী করিয়াছেন। এই বর্তমান ঘটনা উপলক্ষে আমি জানিতে পারিয়াছি যে, আমার জননী ভগ্নী এবং স্ত্রী জীবিত আছেন। তাঁহারা সকলেই আপন আপন ধর্ম রক্ষা করিয়া, পরম পবিত্র কাশীধামে বাস করিতেছেন। এখন প্রথমতঃ প্রয়াগে যাইয়া দিদি চাঁদকুমারীকে সঙ্গে করিয়া কাশীধামে চলিয়া যাইব। আর এই অর্থলোভী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে চাকরি করিব না। চল, রাত্রি প্রভাতেই আমরা এখান হইতে চলিয়া যাই।'

ইহার পর ছত্রসিংহ অমরসিংহের নিকট আদ্যোপান্ত সমুদয় বিবরণ শ্রবণ করিল। উভয়েই অত্যন্ত আনন্দিত হইল। ইহারা দুইজনে চাকরি পরিত্যাগ পূর্বক চলিয়া যাওয়াই স্থির করিল। ইহাদের কথোপকথনে রাত্রি অবসান হইল। অন্ধকার নিশাবসানের সঙ্গে সঙ্গে অমরসিংহের জীবনের অমানিশা অবসান হইল। তাঁহার জীবন-গগনে পারিবারিক-সম্মিলন-সুখ-সূর্যের উদয় হইল। এ সুখ-সূর্য জীবন থাকিতে কখনো অস্ত যায় না। সদাচারী ধর্মনিষ্ঠ গৃহস্থের জীবনে এ সুখ-সূর্যের মধ্যাহ্নও নাই অপরাহ্ণও নাই।

সর্বদাই প্রভাত-সূর্য বলিয়া বোধ হয়। এ প্রভাত-সূর্য হইতে সর্বদাই হৃদয় প্রফুল্লকর প্রভাত-রশ্মি বিকীর্ণ হইতে থাকে। সেই চির-প্রভাত-রশ্মি নিবৃত্তি-সম্ভূত শান্তিস্বরূপ প্রভাত-সমীরণ সহ সম্মিলিত হইলেই, গৃহীর জীবন সর্বদা আনন্দের হিল্লোলে ভাসিতে থাকে।

ষোড়শ অধ্যায়

বারাণসী

অষাঢ় মাস। বর্ষাকাল সমুপস্থিত হইয়াছে। গঙ্গা বেগে প্রবাহিত হইতেছে। বরুণা জলশূন্য ছিল। আজ কাল বরুণাও জলে পরিপূর্ণ। এখন দিন দিনই গঙ্গার বেগ বৃদ্ধি হইতেছে। গঙ্গার পশ্চিম পার্শ্বে পঞ্চ ক্রোশী কাশী। কাশীতে গঙ্গারপাড়ে স্থানে স্থানে প্রস্তর এবং ইষ্টক নির্মিত শত শত ঘাট রহিয়াছে। এখন গঙ্গার তট পর্যন্ত জল পূর্ণ। নদীর গর্ভস্থ এবং উভয় পার্শ্বস্থিত চর সকল জলে ডুবিয়া গিয়াছে। ইষ্টক ও প্রস্তর নির্মিত ঘাটের নিম্নের সমুদয় সিঁড়িই জল নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। কেবল দুই-একটি সিঁড়ি জলের উপরে দেখা যায়।

ফাল্গুন চৈত্রমাসে নদী হইতে উপরে উঠিতে হইলে, সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে হয়। মনে হয় যেন নিম্ন ধরাতল হইতে পর্বতে উঠিতেছি। কিন্তু বর্ষাকালে নদীর জল বৃদ্ধি হইয়াছে। নদী হইতে পাড়ে উঠিতে হইলে এখন আর সিঁড়ি বাহিতে হয় না।

প্রাতঃকালে কাশীর প্রত্যেক ঘাটই লোকারণ্যে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। এ লোকারণ্যের কোলাহল বেলা দশ ঘটিকার পূর্বে আর শেষ হয় না। কেহ স্নান করিয়া উঠিয়া, পিতৃ-পিতামহের তর্পণ করিতেছেন। কেহ স্নানের পর ঘাটে বসিয়া স্তব পাঠ করিতেছেন। কোনো কোনো ঘাটে বসিয়া পণ্ডিতগণ এবং বৈদিকগণ বেদ অধ্যয়ন করিতেছেন; নানাছন্দোবন্দে সামবেদ গান করিতেছেন। কেহ বা উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র পাঠ করিতেছেন। ইহাদের কাহারও মুখের উচ্চারিত কথা স্পষ্ট রূপে বুঝিবার সাধ্য নাই। গঙ্গার পাড়ে দাঁড়াইলে, কেবল বিবিধ প্রকারের অস্পষ্ট শব্দ কর্ণের মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু সেই অস্পষ্ট শব্দ এক প্রকার সঙ্গীতের ন্যায় বোধ হয়। সে এক মনোহর সঙ্গীত।

বায়ুতে ভিন্ন ভিন্ন লোকের উচ্চারিত শব্দ সংমিলিত হইয়া এক মধুর সঙ্গীত উৎপাদন করিতেছে। বিশেষ চিন্তা এবং মনোযোগ পূর্বক এ সঙ্গীত শ্রবণ করিলে, এই কয়েকটি কথা ইহার মধ্যে সুস্পষ্টরূপে শুনিতে পাওয়া যায়—'তিনি আছেন—মানব মণ্ডলীর এই সম্মিলিত স্তব-স্তুতি-বায়ু তাঁহারই আদেশে তাঁহার নিকট বহন করিতেছে।'

পরমপবিত্র পুণ্যক্ষেত্র বারাণসী অতি প্রাচীন স্থান। সার্ধ দুই সহস্র বৎসর পূর্বে মহর্ষি গৌতম এখানে বসিয়া নির্বাণমুক্তি-প্রতিপাদক-মত প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু গৌতমের মত প্রচারের পূর্বেও কাশী পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া ভারতে পরিচিত ছিল।

যখন বৌদ্ধদিগের মধ্যে মতের বিভিন্নতা জন্মিল, তখন আবার প্রাচীন হিন্দুধর্ম কাশীতেই আশ্রয় গ্রহণ করিল। পঞ্চ ক্রোশী কাশী যে কেবল ভারতবাসিদিগের নিকট পরিচিত ছিল, তাহা নহে। বার শত বৎসর পূর্বে চীন দেশীয় বৌদ্ধগণ তীর্থ ভ্রমণ উপলক্ষে এখানে আসিয়া অবস্থান করিতেন। তখন অন্যূন ত্রিশটি বৌদ্ধাশ্রম এবং শতাধিক প্রাচীন হিন্দু দেবালয় দ্বারা এই পরম পবিত্র স্থান সুশোভিত ছিল। কিন্তু মুসলমানদিগের আক্রমণের পর হইতে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। এখন খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে কি কাশীর আর সেই পূর্বের অবস্থা আছে? পূর্বের শত শত দেবমন্দির, শত শত বৌদ্ধাশ্রম, দীর্ঘকাল যাবৎ ভূগর্ভে কিম্বা নদীগর্ভে নিহিত হইয়া রহিয়াছে।

ধর্মের নামে, সত্যের নামে, এখানে কত শত সংগ্রাম হইয়া গিয়াছে। প্রায় এগার শত বৎসর পূর্বে শঙ্করাচার্য কাশী হইতে বৌদ্ধধর্মের সকল চিহ্ন লোপ করিয়া, শৈবধর্ম সংস্থাপন করিলেন। সেই সময় হইতেই বরুণার উত্তর পার্শ্বে কাশী সংস্থাপিত হইল, বৌদ্ধাশ্রম সকল দক্ষিণ পার্শ্বে রহিল।

বরুণার উত্তর পার্শ্বস্থিত এই নব কাশীতে ১৭৭৪ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসের প্রারম্ভে, অর্থাৎ বাংলা আষাঢ় মাসের শেষভাগে, একদিন প্রাতঃকালে একজন সম্ভ্রান্ত রমণী প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া অপর তিনটি ভদ্র মহিলার সমভিব্যাহারে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছেন। প্রাগুক্ত ভদ্রমহিলাত্রয় ভিন্ন এই সম্ভ্রান্তা রমণীর সঙ্গে আর চারি-পাঁচজন দাসীও ছিল। রাস্তার অন্যান্য লোক ইহাদিগকে দেখিলেই, রাস্তার একপার্শ্বে সরিয়া যাইয়া, সম্ভ্রান্তা রমণীর গমন-পথ পরিষ্কার করিয়া দিত। যদি রাস্তার কোনো লোক এই রমণীর গমন-পথ হইতে সরিয়া না যাইত, তবে তৎক্ষণাৎ রাস্তার অন্যান্য লোক এবং রাস্তার

পার্শ্বস্থিত দোকানী পসারিগণ তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিত,—'আহাম্মক, চক্ষু নাই ? কে যাইতেছেন দেখ্ না ? পথ ছাড়িয়া দে।'

এ রমণী প্রত্যহ প্রাতঃকালেই এই প্রকার প্রাগুক্ত ভদ্রমহিলাত্রয় এবং চারি-পাঁচজন দাসী সমভিব্যাহারে গঙ্গায় প্রাতঃস্নান করিতে যাইতেন। শহরে বিশেষ কোনো গোলযোগ উপস্থিত না হইলে, কোনো পুরুষ ইহার সঙ্গে স্নানের সময় গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত যাইত না। গঙ্গার ঘাটে যাইবার সময় রাস্তার সমুদয় লোক এবং রাস্তার পার্শ্বস্থিত দোকানী-পসারিগণ ইহাকে দেখিবামাত্র করযোড়ে প্রণাম করিত। কেহ কেহ কখনোও কখনোও সম্মুখে আসিয়া ইহার চরণতলে লুটাইয়া পড়িত। ইহার পরিচ্ছদ কাশী এবং প্রয়াগ অঞ্চলের স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদের ন্যায় ছিল। কিন্তু ইহার সঙ্গের অপর তিনটি ভদ্রমহিলার পরিচ্ছদ দেখিলে, তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই বঙ্গদেশের স্ত্রীলোক বলিয়া বোধ হইত।

রমণী এবং তাঁহার সঙ্গিনিগণ মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিয়া সেই সিক্ত বসনেই বরাবর উত্তরদিকে চলিলেন। প্রথমতঃ অন্নপূর্ণার মন্দিরে যাইয়া, মন্দিরদ্বারে প্রণাম পূর্বক সকলে সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে আবার মন্দিরদ্বারে প্রণাম করিয়া, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে চলিলেন। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরেও এই প্রকার প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া অন্য এক দেবালয়ে চলিলেন। এইরূপে ক্রমে সমুদয় দেবালয় প্রণাম এবং প্রদক্ষিণান্তে আবার মণিকর্ণিকা ঘাটে আসিয়া, গঙ্গায় ডুব দিয়া উঠিলেন, এবং সিক্ত বসনেই গৃহাভিমুখে চলিলেন।

গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় কখনো কখনো এই সম্ভ্রান্তা রমণী আপন সঙ্গিনিদিগের সঙ্গে নানা কথাবার্তা বলিতেন। আজ তিনি আপন সঙ্গিনিদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনা রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

'আপনি কি তবে স্বামী পুত্রের পিণ্ড প্রদানার্থ গয়া যাইবেন বলিয়া নিশ্চয়ই স্থির করিয়াছেন ?—'

প্রাচীনা। মা, আমি কিছুই ঠিক করিতে পারি না। আমার শ্বশুরের কথা কখনোও মিথ্যা হয় নাই। তিনি পরম পণ্ডিত এবং বড় ধার্মিক লোক ছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, আমার পুত্র বিশ্ববিজয়ী হইবেন, আমার পুত্রবধূ বীরমাতা হইবেন। কিন্তু আজ চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত স্বামী-পুত্রের আশাপথ চাহিয়া রহিয়াছি। তাঁহারা যদি সত্য সত্যই আত্মহত্যা করিয়া

থাকেন, তবে গয়ায় পিণ্ড না পড়িলে তো আর তাঁহাদের মুক্তি নাই। আর কতদিন বিলম্ব করিব। জানি না পূর্বজন্মে কত পাপ করিয়াছিলাম। আমার শ্বশুরের কথা কখনো মিথ্যা হয় নাই। কিন্তু আমার অদৃষ্টক্রমে তাহাও মিথ্যা হইল।

সম্ভ্রান্তা স্ত্রী। আপনি মহাদেবের মন্দির-দ্বারে আর একবার ধরনা দিয়া দেখুন।

প্রাচীনা। একবার তো ধরনা দিয়াছিলাম। তখন স্বপ্নাবেশে আমার পুত্রকে সিপাহির বেশে দেখিতে পাইলাম? কিন্তু স্বামীর আকৃতি দেখিয়াই আমি শিহরিয়া উঠিলাম। রক্ত মাংস শূন্য যেন কয়েকখানা হাড়, দেখিলে মানুষ বলিয়া বোধ হয় না, প্রেতযোনি বলিয়া বোধ হয়। তাহাতেই আমার সন্দেহ হয় যে স্বামী হয়তো আত্মহত্যা করিয়া প্রেতযোনিত্ব লাভ করিয়াছেন। এখন গয়ায় পিণ্ড না পড়িলে আর তাঁহার উদ্ধার নাই।

সম্ভ্রান্তা। তোমার জামাতাকে স্বপ্নে দেখিতে পাইলে না?

প্রাচীনা। মা, তাহাকেও দেখিয়াছিলাম। কিন্তু সে কথা আমি মুখে আনিতে পারি না।

এইকথা বলিবামাত্র প্রাচীনার দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল। তিনি তখন বাষ্পাকুলকণ্ঠে বলিলেন,—'মা জামাতার মৃতদেহ গঙ্গায় মধ্যে ভাসিতে দেখিলাম।'

প্রাচীনা রমণীকে অশ্রুবিসর্জন করিতে দেখিয়া, সেই সম্ভ্রান্তা রমণীরও চক্ষের জল পড়িতে লাগিল। তিনি তখন ইচ্ছাপূর্বক এই সকল কথোপকথন পরিত্যাগ করিয়া, অন্য বিষয়ে কথা বলিবার অভিপ্রায়ে প্রাচীনাকে বলিলেন,—

'আপনি আর দুইমাস বিলম্ব করুন। দুইমাসের মধ্যে যদি স্বামী-পুত্রের কোনো সংবাদ না পান, তবে পরে গয়ায় যাইবেন। আমি সম্প্রতি চেৎসিংহ এবং সুজনসিংহের মঙ্গল কামনা করিয়া একটি ব্রতাবলম্বন করিয়াছি। এই আরব্ধ ব্রত উদ্‌যাপন কালে চেৎসিংহ সুজনসিংহের নিমিত্ত যেরূপ মঙ্গল কামনা করিব, আপনার পতি-পুত্র-জামাতার মঙ্গলের নিমিত্তও সেইরূপ বর প্রার্থনা করিব। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, এই ব্রত প্রতিপালন করিতে পারিলে লোক সিদ্ধকাম হয়; আমি শারীরিক নানা কষ্ট সহ্য করিয়া এ ব্রতপালন করিব; আর ব্রত প্রতিষ্ঠাকালে ভগবান ভূতভাবন পার্বতীনাথের নিকট যে বর প্রার্থনা করিব, তাহাই তিনি প্রদান করিবেন।'

সম্রান্তা রমণীর বাক্যাবসানে প্রাচীনা সজলনয়নে বলিতে লাগিলেন,— 'মা, আমরা আপনার ঋণ আর কখনোও পরিশোধ করিতে পারিব না। আজ দুই বৎসর পর্যন্ত আপনি আমাদিগকে অন্ন-বস্ত্র প্রদান করিয়া, প্রতিপালন করিতেছেন। আমার চির দুঃখিনী কন্যা এবং পুত্রবধূকে আপনি আপন কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেছেন। আমাকে আপন জ্যেষ্ঠা সহোদরার ন্যায় সম্মান করিতেছেন। আমি তো আপনার দাসীরও উপযুক্ত নহি। আপনি রাজরানী, আমি ভিখারিণী। আমি আপনার কথা কখনোও অমান্য করিব না। বোধহয় আপনার পুণ্যবলে আমি পতি-পুত্র-জামাতার মুখ দর্শন করিতে পারিব। পরমেশ্বর কেবল আপনাকে দয়া-মায়া দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনার সপত্নী পুত্র চৈৎসিংহ ও সুজনসিংহ অন্যের কুপরামর্শ শ্রবণ করিয়া, আপনাকে গৃহ বহিষ্কৃতা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! আপনি এখনোও অহর্নিশ কেবল তাহাদেরই মঙ্গল কামনা করেন। আমার শ্বশুর বলিতেন, যাহার দ্বেষ-হিংসা নাই তিনিই দেবতা। আপনার শরীরে কোনো প্রকার দ্বেষ-হিংসা নাই, আপনি নিশ্চয়ই দেবতা।—'

পাঠক ও পাঠিকাগণ বোধহয় এই প্রাচীনা রমণী কে তাহা এখন সহজেই বুঝিতে পারিবেন। এই প্রাচীনা রমণী অমরসিংহের গর্ভধারিণী জগদম্বা দেবী। ইনি এই উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়ের উল্লিখিত বাণেশ্বর ভট্টাচার্যের স্ত্রী। ইহাকে এবং ইহার কন্যা ও পুত্রবধূকে দুর্বৃত্ত মীরণ অসৎ অভিপ্রায়ে ধৃত করিয়া নিয়াছিল। কিন্তু মীরণের মাতা নবাব মীরজাফরের স্ত্রী ইহাদিগকে মীরণের হস্ত হইতে রক্ষা করিলেন। পরে ইহারা যেরূপে কাশীতে আসিয়াছেন, তাহা পূর্ববর্তী অধ্যায়েই বিবৃত হইয়াছে। কাশীতে আসিবার পর কয়েক বৎসর ইহারা অতিকষ্টে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। তৎপর বিগত দুই বৎসর পর্যন্ত মহারাজ বলবন্তসিংহের প্রধান স্ত্রী মহারানী গোলাপ-কুমারী আপন গৃহে ইহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন। যে সম্রান্তা রমণীর সমভিব্যাহারে ইহারা গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিলেন তিনিই মহারানী গোলাপকুমারী। বলবন্তসিংহের মৃত্যুর এক বৎসর পরেই রানী গোলাপ-কুমারী রাজপ্রসাদ পরিত্যাগ পূর্বক কাশীতে আসিয়া বাস করিতেছেন। ইহার বদান্যতা নিবন্ধন কাশীবাসী দীন দরিদ্রদিগের এখন আর বড় অন্ন কষ্ট হয় না।

সপ্তদশ অধ্যায়

মহারানী গোলাপকুমারী

ভারতবর্ষ মুসলমানদিগের করতলস্থ হইলে পরও বারাণসী বরাবরই হিন্দু রাজগণের শাসনাধীনে ছিল। বারাণসী বা কাশী হিন্দুদিগের একটি পরম পবিত্র তীর্থস্থান। এই স্থানে যাহাতে যবনদিগের শাসনপ্রণালী কিম্বা যাবনিক আচার-ব্যবহার কোনো প্রকারে প্রবর্তিত না হয়, তজ্জন্য হিন্দুগণ সর্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন। কখনোও কোনো কোনো দিল্লীর বাদসাহ বারাণসীতে মুসলমান সুবাদার নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেই বারাণসী জনশূন্য হইবার উপক্রম হইয়া উঠিত—কাশীবাসী পণ্ডিতগণ, ধর্মার্থিগণ ও ব্যবসায়িগণ কাশী পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেন। সুতরাং দিল্লীর বাদশাগণ বারাণসী বরাবরই জনৈক করপ্রদ হিন্দুরাজার শাসনাধীনে রাখিয়া দিতেন। আওরঙ্গজীব দিল্লীর সম্রাট হইলে পর, তিনি কাশীর সমুদয় হিন্দু দেবালয় ভগ্ন করিয়া মস্জিদ নির্মাণের আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দু দেবালয় ভগ্ন করিতে আরম্ভ করিবামাত্র, কাশী জনশূন্য হইয়া পড়িল। তখন তিনিও বুঝিতে পারিলেন যে বারাণসী হিন্দুরাজার শাসনাধীনে না রাখিলে, এই প্রাচীন শহর একেবারেই জনশূন্য হইয়া পড়িবে, সুতরাং তাঁহাকেও স্বীয় সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইল।

নাদের শাহার ভারত আক্রমণ পর্যন্ত কাশীর রাজা দিল্লীর বাদসাহকে বৎসর বৎসর কিঞ্চিৎ কর প্রদান পূর্বক রাজ্য ভোগ করিতেছিলেন। কিন্তু নাদের সাহার ভারত আক্রমণের পর দিল্লীর বাদসাহের ক্ষমতা ও প্রভুত্ব একেবারে হ্রাস হইল। তখন অযোধ্যার উজীর সুযোগ পাইয়া বারাণসী স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিলেন। এই সময় হইতে বারাণসীর রাজা অযোধ্যার উজীরের অধীনে করপ্রদ রাজা হইয়া পড়িলেন। রাজা মানসরামসিংহের সময়েই বারাণসী অযোধ্যার উজীরের অধীন হইল।

১৭৪০ খৃঃ অব্দে মানসরামসিংহের মৃত্যু হইলে পর তাঁহার পুত্র বলবন্তসিংহ কাশীর রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। বলবন্তসিংহের সহধর্মিণীর নামই মহারানী গোলাপকুমারী। শান্ত প্রকৃতি, সুশীলা, পরমাসাধ্বী গোলাপকুমারী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের প্রভাবেই বলবন্তসিংহ তৎকাল-প্রচলিত বিবিধ পাপ ও কুকার্য হইতে বিরত থাকিতেন।

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের হিন্দুরাজগণও মুসলমান নবাবদিগের ন্যায় বহু-বিবাহ করিতেন। ইঁহারাও শত শত কুলকামিনীকে উপপত্নী স্বরূপ অন্দরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন; কিন্তু পতিপ্রাণা গোলাপকুমারী স্বীয় পতি বলবন্তসিংহকে এই সকল কুকার্য হইতে বিরত রাখিতে কৃতকার্য হইলেন।

বলবন্তসিংহ একমাত্র গোলাপকুমারীর প্রতিই অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার আর দ্বিতীয় পত্নী ছিল না। আর তিনি কখনোও কোনো উপপত্নীও রাখিতেন না।

কিন্তু সমাজ-প্রচলিত পাপ, দুর্নীতি এবং ঘৃনিত আচার-ব্যবহার অস্পষ্ট এবং অজ্ঞাতসারে প্রত্যেক নরনারীর হৃদয় মন কলুষিত করে। সিদ্ধপুরুষ না হইলে সমাজ প্রচলিত পাপের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। সমাজের মধ্যে যে সকল পাপ ও কুপ্রথা প্রচলিত থাকে, তাহা লোকের নিকট পাপ কিম্বা কুপ্রথা বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। বরং সেই সকল পাপ এবং কুপ্রথা যাঁহারা সমর্থন করেন, তাঁহারা কখনো কখনো দেশহিতৈষী বলিয়া সমাজের মধ্যে পরিগণিত হয়েন।

ভারতবর্ষের রাজা এবং নবাবদিগের মধ্যে প্রাচীন কাল হইতে একটি ঘৃণিত প্রথা প্রচলিত আছে। রাজা এবং নবাবদিগের দরবারে বৃত্তিভোগিনী বহুসংখ্যক গায়িকা, এবং নর্তকী থাকে। এই সকল কুচরিত্রা রমণী রাজা কিম্বা নবাব-দরবারের একটি অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয়। দিনান্তে সায়ংকালে যখন মানুষের হৃদয় স্বতঃই ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়; দিবা-রাত্রের মধ্যে যে সময়টি ঈশ্বরকে স্মরণ করিবার বিশেষ উপযোগী, ভারতবর্ষের রাজা এবং নবাবগণ দেশ-প্রচলিত কুপ্রথা অনুসারে সেই সায়ংকালেই প্রাগুক্ত বৃত্তিভোগিনী গায়িকা এবং নর্তকী লইয়া আমোদ-প্রমোদ করিতে বসেন। কোনো কোনো রাজা কিম্বা নবাব সর্বদাই ইঁহাদিগের কুসংসর্গে কাল যাপন করেন, রাজকার্যে কখনোও মন নিবেশ করেন না।

রাজা বলবন্তসিংহের দরবারেও এইরূপ গায়িকা এবং নর্তকী ছিল। তাঁহাকেও প্রায় প্রত্যেক দিন সায়ংকালে এই সকল কুচরিত্রা রমণীদিগের সংসর্গে কাল যাপন করিতে হইত। তিনি সর্বদাই ইঁহাদিগের গীত-বাদ্য শ্রবণ করিতেন; কিন্তু অন্যান্য রাজগণের ন্যায় তিনি কামাসক্ত ছিলেন না। সুতরাং ইঁহাদের মধ্যে কেহ তাঁহার উপপত্নী ছিল না।

রাজগণের মধ্যে এইরূপ গায়িকা ও নর্তকী রাখিবার প্রথা প্রচলিত থাকিলেও ভক্তচিত্তা গোলাপকুমারীর নিকট বলবন্তসিংহের এই আচরণ

অসহনীয় হইয়া উঠিল। তিনি বলবন্তসিংহকে সর্ব্বদাই ইহাদিগের গীত-বাদ্য শ্রবণ করিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু গীত-বাদ্যের প্রতি বলবন্তসিংহের অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। গোলাপকুমারী বুঝিতে পারিলেন যে, অন্দরের মধ্যে বলবন্তসিংহের মনোরঞ্জনার্থ গীত-বাদ্যের আয়োজন করিতে না পারিলে, এই কুকার্য হইতে তাঁহাকে বিরত রাখিতে সমর্থা হইবেন না। গোলাপকুমারী তখন মনে মনে স্থির করিলেন, ভদ্রবংশজাতা দশ কি বার বৎসরের একটি কন্যা আনাইয়া তাহাকে গীত-বাদ্য শিক্ষার সুবিধা করিয়া দিবেন। সে গীত-বাদ্য এবং নৃত্য শিক্ষা করিয়া, অনায়াসে অন্দরের মধ্যে তাঁহার নিজের প্রকোষ্ঠে বসিয়া, তাঁহার স্বামীর মনোরঞ্জনার্থ গীত-বাদ্য করিতে পারিবে। এইরূপ বন্দোবস্ত হইলে, তাঁহার স্বামীকে আর কুচরিত্রা স্ত্রীলোকদিগের সংসর্গে সময়াতিপাত করিতে হইবে না।

মনে মনে এই প্রকার স্থির করিয়া, গোলাপকুমারী আপন পরিচারিকা-দিগকে ভদ্রবংশজাতা দশ-বার বৎসরের একটি বালিকার অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। তাঁহার পরিচারিকাগণের মধ্যে একটা অতি জঘন্য চরিত্রের স্ত্রীলোক ছিল। সে অধিক পুরস্কার লাভ করিবার আশায় আপন উপপতির সাহায্যে একজন পরম ধার্মিক মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিতের দ্বাদশ বৎসর বয়স্কা কন্যাকে গোপনে অপহরণ করিয়া আনিয়া দিল। কন্যাটি অত্যন্ত পিতৃবৎসলা ছিল। পিতা ভিন্ন সে আর কিছুই জানিত না। পিতাই তাহার প্রাণ, পিতাই তাহার সর্বস্ব ছিল। সুতরাং গোলাপকুমারীর নিকট তাহাকে আনিবামাত্র সে আপন পিতার নিমিত্ত ক্রন্দন করিতে লাগিল। গোলাপকুমারী তাহার প্রমুখাৎ শুনিতে পাইলেন যে, তাহার পিতার অগোচরে তাহাকে বলপূর্ব্বক ধৃত করিয়া আনিয়াছে। তাহার পিতার নাম শ্রীনিবাস পণ্ডিত।

কোন ভদ্রবংশজাতা কন্যাকে তাহার পিতামাতার অসম্মতিতে বলপূর্ব্বক ধৃত করিয়া আনিতে গোলাপকুমারী কখনোও আদেশ করেন নাই। সুতরাং তাঁহার পরিচারিকা এইরূপ কুকার্য করিয়াছিল বলিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাকে গৃহবহিষ্কৃতা করিয়া দিলেন। কন্যাটিকে তাহার পিতার হস্তে প্রত্যর্পণ করিবেন বলিয়া শ্রীনিবাস পণ্ডিতের অনুসন্ধানে কাশীর স্থানে স্থানে লোক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দুই মাস পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার প্রেরিত লোকেরা শ্রীনিবাস পণ্ডিতের কোথাও অনুসন্ধান পাইল না। কন্যা অপহৃত হইলে পর শ্রীনিবাস পণ্ডিত শোকে উন্মত্তপ্রায়

হইয়া, কন্যার অনুসন্ধানে বঙ্গদেশে চলিয়া গিয়াছিলেন। বাঙালী যাত্রিগণ তাঁহার কন্যাকে চুরি করিয়াছে বলিয়া, তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল।

এ দিকে কন্যাটিকে গোলাপকুমারী মাতার ন্যায় সস্নেহে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। দুই মাসের মধ্যেও যখন ইহার পিতার কোনো অনুসন্ধান পাওয়া গেল না, তখন গোলাপকুমারী মনে করিলেন, যে হয় তো ইহার পিতা ইহাকে বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন। বিশেষতঃ গোলাপকুমারীর পরিচারিকাও গোলাপ-কুমারীর নিকট তাহাই বলিয়াছিল।

দুই মাস পরে গোলাপকুমারী এই কন্যাটির গীত-বাদ্য শিক্ষার সুবিধা করিয়া দিলেন। গীত-বাদ্যে লোকের মন সহজেই আকৃষ্ট হয়। সঙ্গীতের আসক্তির ন্যায় আর প্রবল আসক্তি দেখা যায় না। বালিকাটি গীত-বাদ্যে এতদূর আসক্ত হইল যে, সে অত্যল্পকাল মধ্যেই আপন পিতাকে বিস্মৃত হইল; এবং বিশেষ সুখ-স্বচ্ছন্দতা সহকারে বলবন্তসিংহের অন্দরে বাস করিতে লাগিল।

প্রায় প্রত্যহই গোলাপকুমারীর শয়ন প্রকোষ্ঠে বসিয়া এই বালিকা বলবন্ত-সিংহের মনোরঞ্জনার্থ গীত-বাদ্য করিত। এখন আর বলবন্তসিংহকে বৃত্তিভোগিনী গায়িকা ও নর্তকীদিগের সংসর্গে সময়াতিপাত করিতে হইত না। এইরূপে একক্রমে চারি বৎসর গত হইলে পর বালিকার পূর্ণ যৌবনকাল উপস্থিত হইল। গোলাপকুমারী ইহাকে কোনো ভদ্রসন্তানের সঙ্গে বিবাহ দিবেন বলিয়া মনে মনে স্থির করিলেন।

এই বালিকাটির নাম পূর্ণিমা। পূর্ণিমার মুখখানি ঠিক পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় প্রফুল্ল। চন্দ্রাননা পূর্ণিমার পূর্ণ ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে পর তাহার রূপলাবণ্য দর্শনে পুরুষের কথা দূরে থাকুক, স্ত্রীলোকদিগেরও পর্যন্ত মন মোহিত হইত। বলবন্তসিংহ পূর্ণিমার অলৌকিক রূপ-লাবণ্য দর্শনে একেবারে মোহিত হইয়া পড়িলেন। পূর্ণিমার দিকে তাঁহার মন দিন দিন আকৃষ্ট হইতে লাগিল। গোলাপকুমারী পূর্ণিমার বিবাহের প্রস্তাব করিলেই বলবন্তসিংহের মুখ বিষণ্ন হইত। অবশেষে আর তিনি আপন মনের ভাব গোপন করিতে সমর্থ হইলেন না। পূর্ণিমাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত গোলাপকুমারীর অনুমতি চাহিলেন।

পতিপ্রাণা গোলাপকুমারী বলিলেন,—'নাথ, একমাত্র তোমাকে সুখী করিবার নিমিত্ত আমি জীবন ধারণ করিতেছি। এ প্রাণ বিসর্জন করিয়াও যদি তোমাকে সুখী করিতে পারি, তবে প্রাণ বিসর্জন করিতেও আমি

কুণ্ঠিত নহি। আমি পূর্ব হইতেই তোমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছি। পূর্ণিমাকে বিবাহ করিলে যদি তোমার সুখ-শান্তি বৃদ্ধি হয়, তবে তুমি তাহাকে ধর্ম-পত্নী-স্বরূপ গ্রহণ কর। আমি পিতৃ ক্রোড় হইতে এই বালিকাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিয়াছি, সে পাপের ফল আমাকে নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে। এখন যদি তুমি ইহাকে ধর্ম-পত্নী-স্বরূপ গ্রহণ না করিয়া উপপত্নী কর, তবে তাহাতে আমার আরও পাপ হইবে। আজ হইতে আমি পূর্ণিমাকে পতি দান করিলাম। আমি আর তোমার শয্যাভাগিনী হইব না। পূর্ণিমাকে বিবাহ করিতে আমি তোমাকে অনুমতি প্রদান করিতেছি।

এই কথা বলিয়াই গোলাপকুমারী স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্বক অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। বলবন্তসিংহ ইহার পর পূর্ণিমাকে বিবাহ করিলেন *। বিবাহের পর পূর্ণিমা, পান্না নামে সর্বত্র পরিচিত হইলেন।

পান্নার গর্ভে বলবন্তসিংহের ক্রমে দুইটি পুত্র জন্মিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম চৈৎসিংহ ও কনিষ্ঠের নাম সুজনসিংহ রাখিলেন। গোলাপকুমারীর গর্ভজাত কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁহার একটি মাত্র কন্যা ছিল। বলবন্ত-সিংহ জীবিত থাকিতেই সেই কন্যাকে দুর্বিজয়সিংহের সহিত বিবাহ দিলেন।

গোলাপকুমারী সপত্নী-পুত্র চৈৎসিংহ এবং সুজনসিংহকে আপন সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। পান্নার সন্তানাদি প্রতিপালনের আর অব-কাশ হইত না। তিনি সর্বদাই গীত-বাদ্য-নৃত্য ইত্যাদিতে নিযুক্ত থাকিতেন।

চৈৎসিংহ এবং সুজনসিংহের জন্মের পাঁচ-ছয় বৎসর পরে, রাজা বলবন্ত-সিংহ দিল্লির বাদশাহ এবং অযোধ্যার উজীর সুজাউদ্দৌলার সমভিব্যাহারে মীরকাসিমের সাহায্যার্থ সসৈন্যে বঙ্গদেশে যাত্রা করিলেন। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে মীরকাসিম পরাজিত হইলে পর, দিল্লির বাদশাহ সাহআলম এবং রাজা বলবন্তসিংহ সুজাউদ্দৌলাকে পরিত্যাগ পূর্বক ইংরাজদিগের পক্ষাবলম্বন করিলেন। ইহারা ইংরাজদিগকে বঙ্গদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার অভি-প্রায়ে বঙ্গে আসিয়াছিলেন। কিন্তু এখন ইংরেজদিগের চক্রান্তে পড়িয়া প্রতা-রিত হইলেন; এবং সুজাউদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে ইংরেজ-দিগের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

সুজাউদ্দৌলা অনন্যোপায় হইয়া পড়িলেন। তিনি মীরকাসিমকে সঙ্গে

---

* ইংরাজ ইতিহাস লেখক পূর্ণিমাকে (Ponnah) বলবন্তসিংহের উপপত্নী বলিয়াছিলেন। কিন্তু মার্কহ্যাম সাহেবের পত্র পাঠ করিলে এ সংস্কার দূর হইবে।

করিয়া পলায়ন পূর্বক স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এদিকে ইংরেজ সৈন্ত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া অযোধ্যা পর্যন্ত আক্রমণ করিল।

ইংরাজেরা সুজাউদ্দৌলার সমুদয় রাজ্য দিল্লীর বাদশাহকে প্রদান করিবেন বলিয়া তাঁহাকে আশা প্রদান করিলেন। দিল্লীর বাদশাহও বারাণসী এবং গাজিপুর ইংরাজদিগকে প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। এ পর্যন্ত বলবন্তসিংহ সুজাউদ্দৌলাকে কর প্রদান পূর্বক বারাণসীতে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান প্রস্তাবানুসারে বলবন্তসিংহের দেয় কর ইংরাজেরা পাইবেন বলিয়া অবধারিত হইল। বলবন্তসিংহ ইংরাজদিগের অধীনে করপ্রদ রাজা হইবেন বলিয়া সুস্থির হইল।

এই সকল প্রস্তাব বিলাতে পৌঁছিলে, কোর্ট অব ডিরেক্টর এ সমুদয়ই অগ্রাহ্য করিলেন। সুতরাং সুজাউদ্দৌলাকে আর রাজ্যচ্যুত করা হইল না; বলবন্তসিংহের রাজ্য পূর্বে যেরূপ সুজাউদ্দৌলার অধীনে ছিল এখনও সেই অবস্থায় রহিল।

ইংরাজেরা বলবন্তসিংহের সঙ্গে মিত্রতা সংস্থাপন করিলেন, বলবন্তসিংহের রাজ্যকে মিত্র-রাজ্য বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান সময় কাবুলের আমীরের সঙ্গে ইংরাজদিগের যেরূপ সম্বন্ধ, বক্সারের যুদ্ধের পর বলবন্তসিংহের সঙ্গে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ঠিক সেইরূপ সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইল। ইংরাজ-রাজ্যের পশ্চিম-সীমা কর্মনাশা নদী। কর্মনাশার পশ্চিম পারে বলবন্তসিংহের রাজ্যের অন্তর্গত। সুতরাং পশ্চিম হইতে ইংরাজ-রাজ্য কেহ আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিলে, বলবন্তসিংহের রাজ্যের মধ্য দিয়া তাহাকে আসিতে হয়। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এইজন্য বলবন্তসিংহের সঙ্গে মিত্রতা রক্ষার্থ সর্বদাই চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং অন্যান্য সমুদয় শত্রুর আক্রমণ হইতে বলবন্তসিংহের রাজ্য রক্ষা করিবেন বলিয়া, ঈস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রতিশ্রুত হইলেন।

১৭৭০ খ্রীঃ অব্দে বলবন্তসিংহের মৃত্যু হইল। তিনি মৃত্যুকালে সমুদয় রাজ্যভার জ্যেষ্ঠা মহিষী গোলাপকুমারীর হস্তে প্রদান করিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর উজীর সুজাউদ্দৌলা তাঁহার উত্তরাধিকারিদিগকে রাজ্যচ্যুত করিতে উদ্যত হইলে, ঈস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি আত্মরক্ষার্থ সুজাউদ্দৌলাকে এই দুরভিসন্ধি হইতে বিরত রাখিলেন। ইহার পর ১৭৭৩ খৃঃ অব্দে যখন হেস্টিংসের সঙ্গে সুজাউদ্দৌলার বারাণসীতে সাক্ষাৎ হইল, তখন আবার সুজাউদ্দৌলা

বারাণসী একেবারে আপন শাসনাধীনে আনিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু হেস্টিংসের আশঙ্কা হইল যে, সুজাউদ্দৌলার রাজ্য বিস্তৃত হইলে উত্তরকালে সে ইংরাজদিগকে দেশবহিষ্কৃত করিয়া দিবার চেষ্টা করিবে। সুতরাং বারাণসী সন্ধির সময়ও বলবন্তসিংহের রাজ্য পূর্বাবস্থায়ই রহিল।

রাজ্য বিনাশের মূল কারণ প্রায়ই গৃহবিচ্ছেদ। এই গৃহবিচ্ছেদ না হইলে সহজে রাজ্য নষ্ট হয় না। বলবন্তসিংহের মৃত্যুর পর গোলাপকুমারী বিশেষ কার্যদক্ষতা সহকারে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অনেকানেক অসচ্চরিত্র কর্মচারিগণ গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। চৈৎসিংহ এবং সুজনসিংহ নাবালক ছিলেন। তাঁহারা তখন রাজকার্য কিছুই বুঝিতেন না। দুই-চারিজন অসচ্চরিত্র কর্মচারী মনে করিলেন যে, গোলাপকুমারীকে চৈৎসিংহের দ্বারা গৃহ বহিষ্কৃতা করাইয়া দিলে অনায়াসেই রাজ-সংসার লুণ্ঠন করিতে পারিবেন।

এই সকল বিশ্বাসঘাতক কর্মচারী ক্রমাগত চৈৎসিংহ, সুজনসিংহ এবং পান্নার নিকট বলিতে লাগিল, যে, গোলাপকুমারী সত্বরই এই রাজ্য আপন গর্ভজাত কন্যাকে প্রদান করিবেন, গোলাপকুমারীর হাতে রাজকার্যের ভার থাকিলে, চৈৎসিংহ এবং সুজনসিংহের রাজ্যলাভের আশা নাই।

পান্না বাল্যাবস্থা হইতে কেবল গীত-বাদ্যই শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজকার্য কিম্বা অন্য বিষয় সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। চৈৎসিংহ, সুজনসিংহ এখনও বালক। সুতরাং সহজেই তাঁহারা কর্মচারিদিগের কুমন্ত্রণায় প্রতারিত হইলেন, এবং গোলাপকুমারীকে গৃহ বহিষ্কৃতা করিবা দিবার চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। সহৃদয়া গোলাপকুমারী ইহাদিগের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, একদিন পান্নাকে আপন প্রকোষ্ঠে ডাকাইয়া আনিয়া, বলিতে লাগিলেন যে, রাজপদ এবং রাজ্য অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। রাজপদ অপেক্ষা বহু মূল্যবান যে রত্ন নারীর অধীন,— নারী প্রাণ থাকিতে যে রত্ন দান করিতে পারে না,—সেই অমূল্য নিধিই আমি তোমাকে দান করিয়াছি। এখন কি আমি অধর্মাচরণ করিয়া চৈৎসিংহকে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিব? চৈৎসিংহ রাজ্যরক্ষণে অসমর্থ বলিয়াই আমি রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছি।

কিন্তু গোলাপকুমারীর এই সকল কথায় পান্নার বিশ্বাস হইল না। তিনি আপন পুত্রদ্বয় এবং কর্মচারিদিগের সঙ্গে গোলাপকুমারীকে গৃহ বহিষ্কৃতা করিয়া দিবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ইহাদিগের আন্দোলন বৃথা [illegible]

কুমারীর মনে অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া রাজকার্য সমুদয় পরিত্যাগ পূর্বক কাশীতে চলিয়া গেলেন। চৈৎসিংহ এক্ষণ রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। গোলাপকুমারী আজ প্রায় দুই বৎসর পর্যন্ত কাশীতে অবস্থান করিতেছেন। এখনোও তিনি সর্বদা চৈৎসিংহ এবং সুজনসিংহের মঙ্গল কামনা করেন।

গোলাপকুমারী কাশীতে আসিবার দুই-তিনদিন পরে, স্নানোপলক্ষে গঙ্গার ঘাটে যাইয়া দেখেন, তিনটি স্ত্রীলোক অনাহারে মৃতপ্রায় হইয়া ঘাটে পড়িয়া রহিয়াছে। ইহাদিগকে এইরূপ দুরবস্থাপন্না দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ ইহাদিগকে সঙ্গে করিয়া, আপন বাড়িতে লইয়া আসিলেন। পরে ইহাদিগের সমুদয় দুরবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া আপন গৃহে আশ্রয় প্রদান করিলেন।

এই তিনটি স্ত্রীলোকের মধ্যে বৃদ্ধা রমণীর নাম জগদম্বাদেবী। ইনি বাণেশ্বর ভট্টাচার্যের স্ত্রী, অমরসিংহের গর্ভধারিণী। দ্বিতীয়ার নাম তিলোত্তমা, ইনি অমরসিংহের ভগ্নী। আর তৃতীয়া স্ত্রীলোকটির নাম সুরুচি। ইহার বয়স এখন প্রায় পঁচিশ বৎসর হইয়াছে। ইনি অমরসিংহের স্ত্রী।

ইহারা তিনজনই এই দুই বৎসর হইতে গোলাপকুমারীর গৃহে অবস্থান করিতেছেন। তিলোত্তমা এবং সুরুচিকে গোলাপকুমারী আপন কন্যার ন্যায় স্নেহ করেন। জগদম্বাকে তিনি জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায় সম্মান করেন। প্রায় চৌদ্দ বৎসর হইল জগদম্বা স্বামী-পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন। স্বামী, পুত্র এবং জামাতার সহিত তাঁহার যে আর সাক্ষাৎ হইবে, সে আশা এখন দিন দিনই হ্রাস হইতেছে। ইতিপূর্বে স্বামী-পুত্র-জামাতার পিণ্ড প্রদানার্থ গয়া যাইবেন বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু গোলাপকুমারীর অনুরোধে গয়া যাইবার সঙ্কল্প আপাততঃ দুই মাসের নিমিত্ত স্থগিত রাখিয়াছেন, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

একাদশ অধ্যায়

মাতৃচরণ দর্শন

প্রয়াগ হইতে শত শত পথিক কাশীতে যাইতেছে। পূর্বে পথিকেরা রাত্রে গমনাগমন করিতেও ভয় করিত না। কিন্তু এখন সেপথের [illegible] নির্জন থাকে লোক বড় গমনাগমন করে না। চোর ডাকাতের ভয় অত্যন্ত

বৃদ্ধি হইয়াছে। দেশের সমুদয় লোক অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা পূর্বে সাধু লোক বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহারাও এখন চোর ডাকাতের ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে। নিরবচ্ছিন্ন দেশের অর্থ শোষণ হইতে থাকিলে এইরূপ অবস্থাই সমুপস্থিত হয়।

কাশী হইতে পশ্চিমে তিন-চারিক্রোশ দূরস্থিত একটি বাজারে সায়ংকালে চারিটি পথিক আসিয়া রাত্রে বিশ্রাম করিতেছিল। ইহাদের মধ্যে তিনটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক। রাত্রি একপ্রহর থাকিতে ইহাদের মধ্যে একজন জাগ্রত হইয়া, অপর তিনজনকে বলিতেছে,—'তোমরা এখন শীঘ্র শীঘ্র উঠ। এখন রওনা হইলে অতি প্রত্যূষে কাশীতে পৌঁছিতে পারিব। রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র কাশীতে পৌঁছিতে না পারিলে, আজ সমুদয় দিনই নষ্ট হইবে।'

অপর তিনজনের মধ্যে একজন বৃদ্ধ পুরুষ বলিয়া উঠিল,—'এত রাত্রি থাকিতে কোথায় যাইব? ঠিক প্রত্যূষে পৌঁছিতে না পারি, দুইদণ্ড বেলা হইলে তো পৌঁছিতে পারিব?'

প্রথম ব্যক্তি। ঠিক প্রত্যূষে পৌঁছিতে না পারিলে, অদ্য কোনো কাজই হইবে না। সমুদয় দিবসই আমাদের বৃথা যাইবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। কেন বৃথা যাইবে?

প্রথম ব্যক্তি। মা কাশীতে কোন্ স্থানে কি ভাবে আছেন, তাহা তো কিছুই জানি না। তল্লাশ করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করা দুঃসাধ্য। এত বড় শহর হইতে কি অপরিচিত লোক খুঁজিয়া বাহির করা যায়? কিন্তু তিনি কাশীতে থাকিলে, প্রাতঃকালে একবার নিশ্চয়ই দেবালয়ে প্রণাম করিতে আসিবেন। আমি প্রাতঃকালে কাশীতে পৌঁছিয়াই বিশ্বেশ্বরের মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিব। যে সকল স্ত্রীলোক ঠাকুর দর্শন করিতে মন্দিরে প্রবেশ করিবেন, একে একে তাঁহাদের সকলকেই দেখিতে পাইব। এই উপায় ভিন্ন মাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার আর কোনো উপায় নাই।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। তুমি রাত্রে কেবল এই চিন্তা করিতেছিলে নাকি?

প্রথম ব্যক্তি। ভাই সমস্ত রাত্রের মধ্যেও আমার নিদ্রা হয় নাই। কেবল আজ কেন? ফয়েজাবাদ হইতে রওনা হইবার পর চক্ষে আর নিদ্রা নাই। কেবলি আশঙ্কা হইতেছে যে যদি মা কাশী পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তবে সকল পরিশ্রম বৃথা হইবে। এ জীবনে আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। যতই কাশীর নিকটে আসিতেছি, ততই আমার এই আশঙ্কা বৃদ্ধি হইতেছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। তবে এখনই চল। মহাবীরকে আমাদের বিছানা-পত্র বাঁধিতে বল। আমি একবার গাঁজার আয়োজন করি ; নহিলে রাত্রে হাঁটিতে পারিব না।

এই চারিটি লোকের মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তি পাঠকগণের পূর্ব-পরিচিত অমরসিংহ। দ্বিতীয় ব্যক্তি বৃদ্ধ ছত্রসিংহ। ইহারা ফায়েজাবাদ হইতে রওনা হইয়া, প্রথমতঃ প্রয়াগে আসিয়া পৌঁছিল। প্রয়াগ হইতে চাঁদকুমারী এবং তাঁহার পুত্রকে সঙ্গে করিয়া কাশীতে চলিয়াছে। পূর্ব দিবস সায়ংকালে এই বাজারে পৌঁছিয়াছে। এখন একপ্রহর রাত্র থাকিতেই এই স্থান হইতে রওনা হইবার উদ্যোগ করিতেছে।

মহাবীর সমুদয় বিছানা-পত্র বাঁধিয়া মস্তকে লইল। অমরসিংহ কতক বিছানা-পত্র নিজে বহন করিবে বলিয়া, তাহার নিকট চাহিল। কিন্তু সে বীর বালক বলিল,—'এমন সাতটা মোট মাথায় করিয়া, আমি পঞ্চাশ ক্রোশ চলিয়া যাইতে পারি।'

বালকের বীরত্বের কথা শুনিয়া অমরসিংহ চাঁদকুমারীর দিকে চাহিয়া বলিল,—'এমন তেজস্বী বালককে তুমি সাংগ্রামিক জীবন হইতে বঞ্চিত রাখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলে ?'

একপ্রহর রাত্র থাকিতে ইহারা রওনা হইয়া প্রভাতে কাশীতে আসিয়া পৌঁছিল। অমরসিংহ আপন সঙ্গী ছত্রসিংহ, মহাবীরসিংহ এবং চাঁদকুমারীকে একটি বৃক্ষতলে বসাইয়া রাখিয়া, নিজে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের দিকে চলিল। প্রভাতে কাশীতে অনেক ষাঁড় ছুটিতে থাকে। কাশীতে বড় ষাঁড়ের ভয়। একটি স্ত্রীলোকের দিকে একটা ষাঁড় ধাবিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকটি প্রাণের ভয়ে চীৎকার করিতেছে। অন্যান্য লোক স্ত্রীলোকটাকে রক্ষা করিবার কোনো চেষ্টা না করিয়া, আপন আপন প্রাণের ভয়ে পলায়ন করিতেছে। কিন্তু মহাবীর স্ত্রীলোকটির চীৎকার শুনিয়া তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া অকুতোভয়ে ষাঁড়ের শৃঙ্গ ধরিয়া রাখিল। চতুর্দিকস্থ লোক ইহার সাহস দর্শনে আশ্চর্য হইল। স্ত্রীলোকটি ইহাকে আশীর্বাদ করিতে করিতে গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে চলিয়া গেল।

এদিকে অমরসিংহ বিশ্বেশ্বরের মন্দিরদ্বারে যাইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে শতশত স্ত্রী-পুরুষ মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ পূর্বক প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিতেছে। সে সতৃষ্ণ-নয়নে প্রত্যেক স্ত্রীলোকের মুখের দিকে চাহিতেছে। তাহার

হৃদয়ের সে চির-অধিষ্ঠাত্রী স্নেহময়ী জননীর প্রতিমূর্তি আর দেখিতে পায় না। তাহার হৃদয় মন কাঁপিয়া উঠিল। ভাবিতে লাগিল, হয়তো জননী কাশীধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। অমরসিংহ ক্রমে নিরাশ হইতে লাগিল। ক্রমে সে চেতনা-শূন্য হইবা পড়িল। মুহূর্তকালে নয়ন মুদ্রিত করিয়া বলিল,—'হে দেবাদিদেব মহাদেব ভূতভাবন কৈলাসপতি, এ চিরদুঃখীর দুঃখ বিমোচন কর; আর এ দুঃখের জীবন ধারণ করিতে পারি না।'

এই বলিয়া অমরসিংহ ভূমিতলে বসিয়া পড়িল। সহসা দেখে যে হাফেজ-নন্দিনী স্বর্ণ-বিনির্মিত-রথে স্বর্গ হইতে তাহার নিকটে আসিতেছেন। রথ হইতে অবতরণ পূর্বক তাহার হাত ধরিয়া উঠাইতেছেন। মৃদু-হাস্য-প্রস্ফুটিত বদনে বলিতেছেন,—'ভয় নাই! একবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখ।' অমরসিংহ পশ্চাতে চাহিয়া দেখে যে একজন অতি সম্ভ্রান্তা রমণী ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে আসিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে পাঁচ-ছয়জন স্ত্রীলোক। সে চেতনা লাভ করিয়া আর হাফেজ-নন্দিনীকে দেখিতে পাইল না। হাফেজ-নন্দিনী অদৃশ্য হইলেন। অমরসিংহ ভাবিতে লাগিল, কি আশ্চর্য! আবার সেই সম্ভ্রান্তা রমণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিল। কিছুই ঠিক করিতে পারে না। ক্রমে সম্ভ্রান্তা রমণী মন্দিরের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিলেন। সম্ভ্রান্তা রমণীর পশ্চাতে যে কয়েকজন স্ত্রীলোক ছিল, তন্মধ্যে তিনজনের পরিচ্ছদ বাঙালী রমণীর পরিচ্ছদের ন্যায়। কিন্তু তাহারা তিনজনই সম্ভ্রান্তা রমণীর পশ্চাতে ছিল। অমরসিংহ এখন পর্যন্তও তাহাদের কাহারও মুখ দেখিতে পায় নাই।

এই নবাগত স্ত্রীলোকগণ ভূমিষ্ঠ হইয়া মন্দির দ্বারে প্রণাম করিল। ইহাদিগের মধ্যে একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক প্রণাম করিয়া উঠিবার সময় করজোড়ে সজল নয়নে বলিতে লাগিল, 'ভগবান, এ দুঃখিনীকে একবার দয়া কর। স্বামী-পুত্র জামাতৃ-শোক আর সহ্য করা যায় না। আমার ভুবনেশ্বরকে আমার ক্রোড়ে আনিয়া দাও।'

'ভুবনেশ্বর' এই শব্দ অমরসিংহের কর্ণে প্রবেশ করিলে সে সম্মুখে এক-পদ অগ্রসর হইবামাত্র দেখে যে, তাহার জননী করজোড়ে বিশ্বেশ্বরের মন্দির-দ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রু নিপতিত হইতেছে। অমরসিংহ আর একপদ অগ্রসর হইয়াই আত্ম-বিস্মৃতের ন্যায় জননীর চরণতলে লোটাইয়া পড়িয়া বলিল,—'মা, এই তোমার হতভাগ্য ভুবনেশ্বর।'

রাণী গোলাপকুমারী এবং তাঁহার সঙ্গিনী অন্যান্য স্ত্রীলোক সকলেই

একেবারে চমকিয়া উঠিলেন। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী এখন পর্যন্ত অমরসিংহের মুখ দেখিতে পান নাই। সৈনিক-পরিচ্ছদ-ধারী একজন পুরুষ তাঁহার পদতলে পড়িয়া রহিয়াছে। সে এখন সংজ্ঞা-শূন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। রানী গোলাপকুমারীকে চমকিয়া উঠিতে দেখিয়া, নিকটে দণ্ডায়মান অন্য একটি পুরুষ ভূতলশায়ী অমরসিংহকে ধরিয়া উঠাইল। জননীর দৃষ্টি তাহার মুখের উপর পড়িবামাত্র বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী,—'এই যে আমার বাছা' এই বলিয়া পুত্রের গলা জড়াইয়া ধরিলেন। মুহূর্তেক পরে অমরসিংহেরও চেতনা হইল। সে সম্মুখে আপন জননী, ভগ্নী এবং স্ত্রীকে দেখিতে পাইয়া আনন্দাশ্রুতে ভাসিতে লাগিল।

জগদম্বাদেবী এবং তাঁহার কন্যা ও পুত্রবধূর হৃদয়ের বর্তমান অবস্থা কে ভাষা দ্বারা প্রকাশ করিতে পারে? সে বিষয় বর্ণনা করিবার চেষ্টা বৃথা। সহৃদয় পাঠক অনায়াসে তাহাদিগের বর্তমান অবস্থা কল্পনা করিতে সমর্থ হইবেন।

আজ বৃদ্ধা জননী পুত্রের গলা ধরিয়া, মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া, একত্রে আবার পুত্রের সঙ্গে ভূমিষ্ঠ হইয়া মহাদেবকে প্রণাম করিলেন।

অমরসিংহ জননীর সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় দেবালয় প্রদক্ষিণ করিয়া, একত্রে গঙ্গার ঘাটে আসিল। পরে রানী গোলাপকুমারীর একজন ভৃত্যকে সঙ্গে করিয়া ছত্রসিংহ এবং চাঁদকুমারীর নিকটে চলিল। তাহারা এতক্ষণ অমরসিংহের অপেক্ষা করিতেছিল। অমরসিংহ তাহাদের নিকট সমুদয় বিবরণ বিবৃত করিল। তাহারা সকলে যারপরনাই আনন্দ লাভ করিল এবং অমরসিংহের সঙ্গে একত্রে রানী গোলাপকুমারীর গৃহাভিমুখে চলিল।

অমরসিংহের ভগ্নীপতির মৃত্যু সম্বন্ধে এখন আর তাহার ভগ্নীর কোনো সন্দেহ রহিল না। তিনি ভ্রাতাকে সঙ্গে করিয়া গয়ায় যাইয়া স্বামীর পিণ্ড প্রদান করিলেন। অমরসিংহের জননী চাঁদকুমারীকেও আপন গর্ভজাত কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিলেন। এখন তাঁহার বিশ্বাস হইল যে, তাঁহার শ্বশুরের কোনো কথাই নিষ্ফল হইবে না। কিন্তু এই সুখ-দুঃখ-পরিপূর্ণ সংসারে কাহারও নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগ হয় না। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী পুত্রমুখ দর্শনে যার-পর-নাই আনন্দ লাভ করিলেন বটে, কিন্তু জামাতার শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। রানী গোলাপকুমারী সর্বদাই বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতেন।

চাঁদকুমারী, তাঁহার পুত্র মহাবীর এবং ছত্রসিংহও রানী গোলাপকুমারীর বাড়িতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইহাদিগের আগমনে গোলাপকুমারীর একটি নূতন পরিবার গঠিত হইল। তিনি সকলকে সন্তানের ন্যায় যত্নে রক্ষি-

তেন। ইহারাও সকলে তাঁহাকে মা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কেহ কখনোও তাঁহাকে 'মা' না বলিয়া, মহারানী বলিলে, তিনি একটু অসন্তুষ্ট হইতেন।

কয়েকদিন পরে অমরসিংহ তাঁহার পিতার অনুসন্ধানে চলিয়া যাইবেন বলিয়া, রানী গোলাপকুমারীর অনুমতি চাহিলেন। বুদ্ধিমতী রানী গোলাপকুমারী তাহাকে কাশী পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

'বাছা, ভগবান পার্বতীনাথের ইচ্ছা লইলে, এখানেই তোমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। কাশী পরম পবিত্র স্থান। চিরকাল এখানে সাধু মহর্ষি-দিগের সমাগম হইতেছে। তোমার পিতা কোথায় আছেন, এবং জীবিত আছেন কিনা, তাহাও কিছু নিশ্চয় জানিতে পার নাই। এ অবস্থায় তুমি কোথায় যাইয়া অনুসন্ধান কবিবে? বরং ভগবানের প্রতি নির্ভর করিয়া এখানেই অবস্থান কর।'

অমরসিংহ গোলাপকুমারীর উপদেশানুসারে কাশীতেই অবস্থান করিতে লাগিল।

'উল্লঙ্ঘন' নামক প্রথম খণ্ড এখানে সমাপ্ত হইল। 'প্রায়শ্চিত্ত' নামক দ্বিতীয় খণ্ডে—পুরাতন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দেশীয় যে সকল লোকের সাহায্যে ভারতে রাজ্যবিস্তার করিলেন, তাহাদিগের উপকারেব যেরূপ প্রতিদান করিয়াছিলেন,—দেশীয় রাজা এবং নবাবগণ আপন আপন প্রতিবেশীর রাজ্য অপহরণার্থ ইংরাজের সাহায্য গ্রহণ করিয়া, চরমে যে গতি লাভ করিলেন,—নিরপরাধিনী, নির্মল-হৃদয়া হাফেজ-নন্দিনীর শোণিতের নিমিত্ত নবাব সুজা-উদ্দৌলাকে, তাঁহার স্ত্রী-পুত্রকে এবং তৎসঙ্গে-সঙ্গে সমুদয় অযোধ্যাবাসি-দিগকে যেরূপে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল,—এই পবিত্র হৃদয়া যুবতীর শোণিত সম্ভূত অনল সমগ্র অযোধ্যা যেরূপে ভস্মীভূত করিল; চৈৎসিংহ অসৎ লোকের কুপরামর্শে লক্ষ্মীস্বরূপা আপন বিমাতা মহারানী গোলাপকুমারীকে গৃহবহিষ্কৃতা করিয়া, যেরূপে রাজ্যনাশের বীজ বপন করিলেন,—অমরসিংহ পরোপকারার্থ জীবন বিসর্জনে প্রস্তুত হইয়া, যেরূপে পুরস্কৃত হইলেন,—তৎসমুদয় বিবৃত হইবে।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রায়শ্চিত্ত

ঊনবিংশ অধ্যায়

মৃত্যু শয্যা

পাপ, কুকার্য এবং কর্তব্য-লঙ্ঘন ধীরে ধীরে মানুষকে বিনাশের দিকে পরিচালন করে। এ সংসারে প্রত্যেকেই আপন কুকার্য এবং কর্তব্য-লঙ্ঘন-সম্ভূত ঘটনাবলীর স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে, চরমে ঘোর বিপদসাগরে নিমগ্ন হয়। কিন্তু সংসারের মোহান্ধকারে পড়িয়া মানুষ বুঝিতে পারে না, যে, বর্তমান কুকার্য তাহার ভবিষ্য-বিপদের বীজ বপন করিতেছে। সংসারের কোলাহল তাহার কর্ণকে বধির করে, সংসারাসক্তির যবনিকা তাহার ভবিষ্যদৃষ্টিকে অবরোধ করে।

শারীরিক রোগের ন্যায় মানসিক এবং নৈতিক রোগও অস্পষ্টভাবে এবং অজ্ঞাতসারে মানব জীবনে প্রবেশ করে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তি স্বরূপ নির্ণয় করিয়া বলিতে পারে না যে, গত জীবনের কোন্ মুহূর্তে এই বর্তমান রোগের বীজ তাহার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, বিপন্ন ব্যক্তিও সেই প্রকার কখনোও অবধারণ করিতে পারে না যে, কোন্ দিনের কর্তব্য-লঙ্ঘন তাহাকে এ বিপদ্-সাগরে নিমগ্ন করিয়াছে।

অর্থলোভী ইংরাজদিগের সাহায্যগ্রহণ পূর্বক উজীর সুজাউদ্দৌলা নিরপরাধ রোহিলাদিগকে বিনাশ করিয়া, নিরপরাধা রোহিলা-রমণীদিগের প্রতি ঘোর অত্যাচার করিয়া, যে আপন মৃত্যুবাণ প্রস্তুত করিয়াছেন, অযোধ্যার রাজপদ বিনাশের যে বীজ বপন করিয়াছেন, তাহা কি পূর্বে তাঁহার বুঝিবার সাধ্য ছিল। একে তো ভবিষ্যতের গর্ভে যাহা-কিছু নিহিত রহিয়াছে তাহা

কাহারও জানিবার সাধ্য নাই ; অধিকন্তু কর্তব্যা-কর্তব্যজ্ঞান বিবর্জিত মনুষ্য আপন আপন হৃদয়স্থিত মোহান্ধকার নিবন্ধন সর্বাই ভ্রমজালে নিপতিত হইয়া রহিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগল-সাম্রাজ্য বিনষ্ট হইলে পর ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় রাজগণ ও নবাবগণ আপন আপন রাজ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই ইংরাজ বণিক-দিগের সাহায্য গ্রহণপূর্বক প্রতিবেশীয় রাজ্য হরণ করিবার অভিপ্রায় করিলেন। তখন ইঁহারা সকলেই মনে করিতেন, যে, ইংরাজেরা কেবল বাণিজ্যার্থ এদেশে আগমন করিতেছে, কিছুকাল ইহারা বাণিজ্য করিয়া পরে স্বদেশে চলিয়া যাইবে ; সুতরাং ইহাদিগকে আপন আপন রাজ্যমধ্যে স্থান প্রদান পূর্বক ইহাদিগের সাহায্যে প্রতিবেশীয় রাজ্য অপহরণ করিলে রাজ্য বিনাশের কোন সম্ভব নাই। কিন্তু ইংরাজ কি পদার্থে নির্মিত তাহা একবার ভ্রমেও চিন্তা করিলেন না। অর্থ-গৃধ্নুতা, স্বার্থপরতা এবং অকৃতজ্ঞতা যে তাহাদের জাতীয় ধর্ম তাহা তখন বুঝিতে পারিলেন না।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রাজগণ মধ্যে মহারাজ বলবন্তসিংহ, অযোধ্যার উজীর সুজাউদ্দৌলা এবং তৎকালের নিস্তেজ দিল্লীর সম্রাট—এই তিনজনই সর্বাগ্রে ইংরাজের কুহকে পড়িয়া প্রতারিত হইলেন। চরমে ইঁহাদের তিন জনেরই রাজ্য বিনষ্ট হইল।

বিগত আষাঢ় মাসে অর্থাৎ ১৭৭৪ খৃঃ অব্দের জুন মাসে, হাফেজ-নন্দিনী বিষাক্ত ছুরিকা দ্বারা সুজাকে আঘাত করিয়া তৎপরে আত্মহত্যা করিলেন। পিতার শত্রুকে যথোচিত দণ্ড প্রদান পূর্বক তিনি স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সুজাউদ্দৌলা সেই আঘাত প্রাপ্তির পর ছয় মাস কাল স্বীয় কুকার্যের ফলভোগ করিতেছেন। এখন মাঘমাসের প্রারম্ভে তিনি অচৈতন্যাবস্থায় মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া রহিয়াছেন।

বিষাক্ত ছুরিকার আঘাত প্রাপ্তির পর দিন দিন সুজার শরীর স্ফীত হইতেছিল। বিষের যন্ত্রণায় সর্বদাই তাঁহার শরীর ছট্-ফট্ করিত। কিন্তু শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ—এই পাঁচ মাস পর্যন্ত তিনি অতি-কষ্টে কখনোও কখনোও বাহির বাড়ি যাইয়া দরবারে বসিতেন। এই কয়েক মাসের মধ্যে তাঁহার শারীরিক অবস্থা একেবারে প্রকাশ হইয়া পড়িল না। আপন শারীরিক যন্ত্রণা গোপন করিবার নিমিত্ত তিনি চেষ্টা করিতেন। কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও রাজকার্যে মনোনিবেশ করিতে পারিতেন না।

শারীরিক যন্ত্রণানিবন্ধন সকল কার্যেই যার-পর-নাই বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিতেন। কেহ কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিলে অতি কর্কশ ভাষায় তাহার উত্তর প্রদান করিতেন। এই সময়ে মহম্মদ ইরাজ খাঁ, রাজা সুরৎসিংহ, রাজা সুরৎসিংহের জামাতা রাজা জগন্নাথ প্রভৃতি অযোধ্যা-দরবারের প্রধান প্রধান কর্মচারী ছিলেন। কিন্তু ইঁহাদের তিনজনের মধ্যে কেহই নবাবের বর্তমান অবস্থার মূল কারণ জানিতেন না। নবাবের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী নবাব আসফউদ্দৌলার বিশেষ প্রিয়পাত্র মার্তুজা খাঁ এবং অপর দুই-চারিজন মুসলমান কর্মচারীই কেবল সুজার বর্তমান রোগের প্রকৃত অবস্থা পরিজ্ঞাত ছিলেন। অযোধ্যার জনসাধারণ মার্তুজা খাঁকে প্রধান অমাত্য বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু বৃদ্ধ মহম্মদ ইরাজ খাঁই এই সময়ে সর্বপ্রধান অমাত্যের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

মহম্মদ ইরাজ খাঁ সুজাউদ্দৌলার স্বভাব মধ্যে ঈদৃশ পরিবর্তন দর্শনে নবাবের সঙ্গে অধিক কথা বার্তা বলিতে শঙ্কা করিতেন। সুজা দরবারে আসিয়া বসিলে, প্রায় সমুদয় কর্মচারীই নির্বাক থাকিতেন। নবাব নিজে কাহাকেও কোনো কথা জিজ্ঞাসা না করিলে আপনা হইতে কেহই নবাবকে কিছু বলিতে সাহস করিতেন না।

মহম্মদ ইরাজ খাঁ এবং রাজা সুরৎসিংহ প্রভৃতি মনে করিতে লাগিলেন যে, নবাবের মানসিক অবস্থা পরিবর্তনের মূল কারণ আর কিছুই নহে, কলিকাতা কৌন্সিলের হেস্টিংস সাহেবের সঙ্গে নবাগত ফ্রান্সিস ফিলিপ প্রভৃতির অনৈক্য নিবন্ধন রোহিলা যুদ্ধ সম্বন্ধে নানা প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। রোহিলখণ্ডের অধিকাংশ ভূমি আবার নবাব ফায়েজউল্লাকে প্রত্যর্পণ করিবার প্রস্তাব হইতেছে; সুতরাং উজীর সুজাউদ্দৌলা এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়াই অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। রোহিলা-যুদ্ধে তাঁহার রাজকোষ শূন্য হইয়াছে। এখনোও ইংরাজ সৈন্যদিগের ব্যয় বহন করিতে হইতেছে। এই কষ্ট-লব্ধ-রাজ্য আবার হস্তবহির্ভূত হইবার আশঙ্কাই তাঁহার বর্তমান স্বভাব পরিবর্তনের মূল কারন * হইবে।

নবাব সুজাউদ্দৌলা এই প্রকারে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে রোহিলা যুদ্ধের পর ছয় মাস গত হইল। ক্রমে হেমন্ত অবসানে

* কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন যে কলিকাতা কৌন্সিলের মেম্বরদিগের গোলযোগই সুজাউদ্দৌলার রোগের কারণ ছিল।

শীত ঋতুর সমাগম হইল। এদিকে পৌষ মাসের প্রারম্ভ হইতেই সুজাউদ্দৌলা উত্থান-শক্তি রহিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শরীরের মাংস স্থানে স্থানে পচিতে আরম্ভ হইল। পৌষ মাসের প্রারম্ভে সর্বত্র প্রচার হইয়া পড়িল যে নবাব সুজাউদ্দৌলা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার জীবনের বড় আশা নাই।

শীতকালে লোকের বড়-একটা বসন্ত রোগ হয় না। বিশেষতঃ নবাবের রাজধানী এই সময়ে সরযূ নদীর তীরবর্তী ফায়েজাবাদে ছিল। ফায়েজাবাদের ন্যায় স্বাস্থ্যকর এবং মনোহর স্থান বোধহয় ভারতবর্ষের আর কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। এই মনোরম পবিত্র স্থানের অধিবাসিদিগের শরীরে সহজে রোগ প্রবেশ করিতে পারে না। অকালে নবাবের বসন্ত রোগ হইয়াছে, এইরূপ জনরব প্রচার হইবামাত্র নগরবাসিদিগের মধ্যে নবাবের পীড়ার কথা সম্বন্ধে বিশেষ কাণাকাণি হইতে লাগিল। নবাব এবং রাজপরিবারের ঘরের আসল কথা প্রায়ই অব্যক্ত থাকে। কিন্তু রাজ্যের প্রজাগণ মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই আপন আপন প্রকৃতি এবং মানসিক ভাব অনুসারে রাজপরিবারের গুপ্তকথা সম্বন্ধে এক এক প্রকার সিদ্ধান্ত করেন, এক একটা অদ্ভুত অনুমান করেন। তাহাদিগের সেই সকল সিদ্ধান্ত এবং অনুমান ভাবী বংশাবলীর নিকট ইতিহাসাকারে পরিণত হয়। সুতরাং ইতিহাস এবং উপন্যাস ইহার মধ্যে বড় অধিক বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় না। ইংরাজ ইতিহাস লেখকদিগের ন্যায় সাহস থাকিলে অনায়াসে উপন্যাসকে ইতিহাস কারে জনসমাজে প্রচার করা যাইতে পারে।

দিনের-পর-দিন মাসের-পর-মাস ক্রমেই গত লাগিল। পৌষ মাসও দেখিতে দেখিতে গত হইল। আজ ১৫ই মাঘ। আজ সুজাউদ্দৌলার চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা প্রভৃতি সমুদয় ইন্দ্রিয়ের কার্যই রহিত হইয়া পড়িয়াছে। শ্বাস প্রশ্বাসের প্রবাহ ভিন্ন আর তাঁহার মধ্যে জীবনী শক্তির কোনো কার্যই পরিলক্ষিত হয় না। আজ পাঁচদিন পর্যন্ত সুজা এইরূপ অচৈতন্যাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন। বউবেগম পতির গলিত মস্তক ক্রোড়ে করিয়া শিয়রে বসিয়া আছেন। তিনি আজ এক-মাস-কাল মুহূর্তের জন্যও পতির শয়ন প্রকোষ্ঠ পরিত্যাগ করেন নাই। গৃহের অন্যান্য লোক মনে করে যে টাকার লোভে বউবেগম এইরূপ করিতেছেন। কিন্তু আসল কথা তাহা নহে।

ইহার একমাস পূর্ব হইতেই সুজার শয়ন-প্রকোষ্ঠ দুর্গন্ধময় হইয়া পড়ি-

য়াছে। অহর্নিশ প্রকোষ্ঠ মধ্যে আতর ছিটান হইতেছে। বাঁদীগণ কলসে কলসে গোলাপ জল ঢালিতেছে। খোজা জহরালি, মহরালি, দারাবালি খাঁ কত প্রকার সুগন্ধ দ্রব্যাদি প্রকোষ্ঠ মধ্যে আনিয়া রাখিতেছে। কিন্তু কিছুতেই দুর্গন্ধ দূর হয় না। বাঁদীদের মধ্যে দুই-একজন ভিন্ন প্রায় সকলেই অনিচ্ছা পূর্বক প্রকোষ্ঠ মধ্যে যাইয়া নবাবের সেবা শুশ্রূষা করে। অন্দরস্থিত ভদ্র মহিলাগণ মধ্যে স্বয়ং বউবেগম, নবাব-মাতা মতীবেগম (অর্থাৎ সায়দ উন্নিসা বেগম) জগদম্বা বেগম এবং কাসিম আলির স্ত্রী ভিন্ন আর কাহাকেও বড় নবাবের প্রকোষ্ঠে যাইতে দেখা যায় না। একান্ত বাধ্য হইয়া যে সকল বাঁদীকে নবাবের সেবা-শুশ্রূষার্থ প্রকোষ্ঠ-মধ্যে থাকিতে হইত, তাহারা সময়ে সময়ে নবাবকে একাকী ফেলিয়া প্রকোষ্ঠান্তরে চলিয়া যাইত। কিন্তু বউবেগমকে প্রকোষ্ঠ-মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিলেই তাড়াতাড়ি আবার প্রকোষ্ঠ-মধ্যে আসিয়া বসিত। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের উল্লিখিত প্রেমিকা তোফানী বাঁদী এই সময় নবাবগৃহ হইতে পলায়ন পূর্বক স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছিল। বাহিরের অনেক লোক তোফানীর মুখেই নবাবের ব্যাধির প্রকৃত কারণ জানিতে পারিয়াছিল। তোফানী প্রেমিকা ছিল। স্থানে স্থানে প্রেমিকদিগের সঙ্গে তাহার এই সকল কথাবার্তা হইত।

অদ্য হইতে প্রায় বিশ-পঁচিশদিন পূর্বে একদিন বেগম নবাবের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে একজন বাঁদীও সেখানে উপস্থিত নাই। নবাবের সমস্ত শরীরের উপর মক্ষিকা পড়িয়া রহিয়াছে। নবাব ক্ষীণস্বরে জল চাহিতেছেন। তাঁহার কণ্ঠ একেবারে শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে। এই সময় পর্যন্ত নবাবের বিলক্ষণ জ্ঞান ছিল। লোক দেখিলে তিনি অনায়াসে চিনিতে পারিতেন। বেগমকে শয্যাপার্শ্বে দেখিবামাত্র নবাব সজল নয়নে বলিতে লাগিলেন,—'আমেতু * যাহার বিপদের কথা শুনিয়া তুমি লজ্জা, ভয়, কুল, মান এবং জীবনের আশা পর্যন্ত পরিত্যাগ পূর্বক বক্সারে গিয়াছিলে, এখন মৃত্যুকালে কি তাহাকে একবিন্দু জলও দিবে না? আমার গলা শুকাইয়া গিয়াছে। হা পরমেশ্বর, একটু জল চাহিয়াও পাইতেছি না। এ সংসারে লোকের যখন শক্তি থাকে, পদ থাকে তখনই অনেক বন্ধু মিলে। স্ত্রী-পুত্র সকলই বৃথা।'

---

* বউবেগমের প্রকৃত নাম 'আমেতু জোহার'। কিন্তু কোনো ইতিহাসে কিম্বা কোনো কাগজ-পত্রে এ নাম প্রকাশ নাই। ইংরাজদিগের কাগজপত্রে বউবেগম নামে তিনি পরিচিত।

স্বামীর ঈদৃশ কাতরোক্তি শ্রবণে বেগমের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে নবাবের মস্তক স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া, তাঁহার মুখে একটু একটু সরবৎ প্রদান করিতে লাগিলেন।

নবাব সরবৎ পান করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন,—'আমেতু, এ সংসারে আমার কেহ নাই। মৃত্যুকালে আমাকে সকলেই পরিত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু তুমি যে পরিত্যাগ করিবে তাহা কখনোও মনে করি নাই। তুমি প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া আমার উদ্ধারার্থ গৃহত্যাগ করিয়াছিলে।' আবার স্বামীর এই কঠোর বাক্য শ্রবণে বেগম অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তিনি নির্বাক রহিলেন। তাঁহার মুখ হইতে কোনো কথা বাহির হইল না। দুইবার চেষ্টা করিয়াও কথা বলিতে পারিলেন না। কথা বলিতে আরম্ভ করিবামাত্র শোক ও দুঃখে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া পড়িত। তিনি তখন আর ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না। প্রায় একঘণ্টা পরে আত্মসংযম এবং শোকাবেগ সম্বরণপূর্বক সজল নয়নে বলিতে লাগিলেন :—

'জাঁহাপনা, সংসারের লোকে মনে করে যে আমি ঋণদাত্রী তুমি ঋণগ্রহীতা। তোমার এবং আমার মধ্যে শুদ্ধ কেবল ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতার সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর লোক যাহাই কেন মনে করুক না, তাহাতে আমার মনে কখনোও কোনো কষ্ট হয় না। আজ তোমার মুখে এই কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখ হইতেছে। এই শরীরের চর্ম দ্বারা তোমার পাদুকা প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি। আমি কি সত্য সত্যই কেবল অর্থের নিমিত্ত তোমাকে ভালোবাসি।

বেগম এই পর্যন্ত বলিবামাত্র তাঁহার শোকাবেগ উথলিয়া উঠিল। তাঁহার মুখ হইতে আর কোনো কথা বাহির হইল না। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই তখন অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে বেগম আবার বলিতে লাগিলেন,—'যে জন্য আমি অর্থ সঞ্চয়ে এত যত্ন করিতেছি, তাহা কি তুমি বুঝিতে পার না? একবার নবাব কাসিম আলির দুরবস্থা স্মরণ করিয়া দেখ না কেন। রাজপদ চিরকাল স্থায়ী নহে। বিপদে পড়িলে কে তোমার পিতৃ-পিতামহের শত শত পত্নী-পুত্রদিগকে অন্ন প্রদান করিবে? তখন ইহাদিগের কি গতি হইবে। এই শত শত অনাথা স্ত্রীলোক এবং ইহাদের সন্তান-সন্ততির তখন আর অন্ন মিলিবে না।'

বেগমের মুখ হইতে নবাব মীর কাসিমের নাম বাহির হইবামাত্র স্বজা-

উদ্দৌলা,—'হা কাসিম আলি—হা কাসিম আলি'—এই বলিয়া নয়ন মুদ্রিত করিলেন এবং একেবারে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন।

বেগম নবাবকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া আপন ক্রোড় হইতে তাঁহার মস্তক নামাইলেন এবং স্বয়ং দাঁড়াইয়া স্বহস্তে নবাবের মস্তকে জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। দুই তিন মিনিটের মধ্যে নবাব চেতনা লাভ করিয়া অত্যন্ত শোকদগ্ধ হৃদয়ে আপনাকে ভৎ'সনা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

'আমার পাপে সমুদায় হিন্দুস্থান নষ্ট হইবে। হায়! আগে বুঝিলাম না। কি অশুভক্ষণেই এলাহাবাদ-সন্ধিপত্রে দস্তখত করিলাম। আমার কি দুর্মতি হইল। বেনারস সন্ধিপত্রই আমার সর্বনাশের মূল। কেনই বা রোহিলাদিগকে বিনাশার্থ ইংরাজ সৈন্য আনিলাম। আর আমার রাজ্য রক্ষার কোনো উপায় দেখি না। কোরানের একটি কথাও মিথ্যা নহে। আমি মুসলমান হইয়া, মুসলমানকে পরিত্যাগ পূর্বক কাফেরের সঙ্গে মিল করিলাম। নবী, রসুল, পয়গম্বর সকলেই বলিয়াছেন—কোরানেও লেখা আছে—আপন স্বধর্মীকে ছাড়িয়া বিধর্মীর সঙ্গে মিল করিবে না। আমি কেন কাসিম আলিকে পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজের আশ্রয় লইলাম। এই ছয় মাস কাল এই রোগশয্যায় পড়িয়া যতই চিন্তা করি ততই কেবল আপন কুকার্য দেখিতে পাই। রাজ্যশোকে কাসিম আলি এখন ক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। রাজ্যনাশের চিন্তা আমার পরমায়ু শেষ করিতেছে। দূর হউক ইসমায়েল-বেগ খাঁ। মুসলমান কেবল সৈন্যাধ্যক্ষের কার্য করিতে পারে। মুসলমানের মন্ত্রির-কার্য করিবার ক্ষমতা নাই মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু মন্ত্রী ভালো। মুসলমান কিসে যে কি হয় তাহা বোঝে না। কেন তখন রাজা সুরতসিংহের কথা শুনিলাম না। কেনই বা রাজা রামনারায়ণের পরামর্শ তখন অগ্রাহ্য করিলাম। ইহারা দুই জনেই সন্ধির প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিল। স্বধর্মাবলম্বী আপন আশ্রিত কাসিমকে পরিত্যাগ করিয়া কাফেরের সঙ্গে মিল করিলাম। ধিক্ আমার জীবনে, ধিক্ আমার রাজত্বে।

নবাব এইরূপে আত্ম-ভৎ'সনা করিতে করিতে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। কণ্ঠ শুষ্ক হইল। তিনি বেগমের নিকট জল চাহিলেন এবং জল পান করিয়া একটু সুস্থ হইবামাত্র পুনর্বার বলিতে লাগিলেন—'

'অযোধ্যাই বোধহয় হিন্দুস্থানের বিনাশের কারণ হইবে। সমগ্র হিন্দুস্থানের বিনাশের নিমিত্তই সুবে আউদের সৃষ্টি হইয়াছে।'

নবাব পুনর্বার এইরূপ কথা কহিতে আরম্ভ করিলে বেগম বলিলেন,—'তুমি

কথা বলিতে বলিতে আবার ক্লান্ত হইয়া পড়িবে। ইহাতে তোমার রোগ বৃদ্ধি হইবে। এ সকল চিন্তা পরিত্যাগ কর।'

নবাব। আমি শত চেষ্টা করিয়াও এ সকল চিন্তা মন হইতে দূর করিতে পারিতেছি না এই রোগ-শয্যায় সর্বদাই এই সকল চিন্তা আমার অন্তরে উদয় হইতেছে। এখন আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে ইংরাজদিগের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াই রাজ্যনাশের বীজ বপন করিয়াছি *।'

বেগম। তুমি এখন এ সকল চিন্তা পরিত্যাগ কর। পরমেশ্বর যদি তোমাকে এ রোগ হইতে উদ্ধার করেন, তবে ইংরাজদিগকে আমাদের এ রাজ্যে আর স্থান প্রদান করিব না। ইংরাজ সৈন্যদিগকে তখন চলিয়া যাইতে বলিলেই হইবে। তাহারা তো তোমার বেতনভোগী চাকর। তাহাদের বেতন বন্ধ করিয়া দিবে।

নবাব। আমেতু, ইংরাজ-সৈন্য দেশ হইতে তাড়াইবার আর সাধ্য নাই। ইংরাজ যেখানে প্রবেশ করে সেখানে জোঁকের ন্যায় লাগিয়া থাকে। আমার মৃত্যু হইলে ইহারা আমার দেশ লুণ্ঠন করিবে, আমার প্রজাদিগের সর্বস্ব হরণ করিবে। আমার রাজ্যকে লোক হিন্দুস্থানের উদ্যান বলিয়া প্রশংসা করে। এ উদ্যানে বন্য মহিষ প্রবেশ করিয়াছে। এ উদ্যান নিশ্চয়ই উৎসন্ন হইবে—পামাল হইবে—ছারখার হইবে, উদ্যানের চিহ্নও থাকিবে না। আমার আর বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই, মৃত্যুই ভালো। বাঁচিয়া থাকিলে কাসিম আলির যে দশা হইয়াছে আমারও তাহাই হইবে। হায়! হায়! কাসিম আলি রাজ্যশোকে ক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

বেগম। কাসিম আলি ক্ষিপ্ত হইয়াছেন তোমাকে কে বলিল? তুমি এখন একটু চুপ করিয়া থাক। এ সকল কথা বলিবার এ সময় নহে। আমি শুনিয়াছি কাসিম আলি সৈন্য সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত নেপালে গিয়াছেন। তিনি এখনোও বোধহয় নেপালে আছেন।

নবাব। কাসেম আলির প্রকৃত অবস্থা তুমি কিছুই জান না। সে সকল

---

* আরউইন সাহেব তাঁহার (Garden of India) অযোধ্যার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে নবাব সুজাউদ্দৌলার মৃত্যুর দুইটি কারণ উল্লিখিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন ফরাক্কাবাদের নবাব-কন্যার (হাফেজ-নন্দিনীর) প্রদত্ত আঘাত। আর কেহ কেহ বলেন ইংরাজদিগের অবৈধ আচরণ ও অর্থ শোষণ চেষ্টা। (Vide Irwin's Garden of India.)

কথা আমি তোমার নিকটও প্রকাশ করি নাই। কাসিম আলি একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া না পড়িলে কি আর তাঁহার শাশুড়ী কখনোও ফয়েজাবাদে আসিতেন। কাসিম আলি আমাকে হারাম বলিয়া মনে করেন। তিনি ক্ষিপ্তাবস্থাপন্ন না হইলে প্রাণান্তেও তাঁহার স্ত্রী এবং শাশুড়ীকে বাড়ি আসিতে দিতেন না। এলাহাবাদ-সন্ধিপত্র লেখা-পড়া হইবার পূর্বে ইংরাজেরা কাসিম আলিকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিল। আমি তখন অগত্যা ইংরাজদিগের নিকট প্রকাশ করিলাম যে, কাসিম আলি পলায়ন পূর্বক নেপালে গিয়াছেন।

বেগম। তবে কাসিম আলি নেপালে যান নাই।

নবাব। তিনি রোহিলখণ্ডে পৌঁছিয়াই রাজ্যশোকে একেবারে পাগল হইয়া পড়িলেন। ক্ষিপ্তাবস্থায় আপন শাশুড়ী এবং স্ত্রীর প্রাণবিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন। আমি তখন মাকে কাসিম আলির স্ত্রী এবং শাশুড়ীর আশ্রয় প্রদানার্থ কোনো উপায় অবলম্বন করিতে বলিলাম। কাসিম আলির স্ত্রী এবং শাশুড়ী প্রাণান্তেও আমার গৃহে আশ্রয় লইতে সম্মত হন নাই। কিন্তু মা অনেক কৌশল করিয়া, অনেক প্রকারে বলিয়া-কহিয়া, ইঁহাদিগকে এখানে আনিয়াছেন। মা তখন ইঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে তিনিও আমার গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক ইঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া মক্কা শরীফ যাইবেন।

বেগম। তবে কাসিম আলি এখন কোথায় আছেন? তিনি কি এখনও ক্ষিপ্তাবস্থায় আছেন?

নবাব। এখন অপেক্ষাকৃত কিছু সুস্থ হইয়াছেন। কিন্তু শাশুড়ী এবং স্ত্রীর প্রাণবিনাশ করিবার সঙ্কল্প বোধহয় এখনো তাঁহার মন হইতে দূর হয় নাই। সেই জন্যই তাঁহার শাশুড়ী এবং স্ত্রী তাঁহার নিকটে থাকিতে সাহস করেন না। দিল্লীর প্রধান উমরা নজফ খাঁ তাঁহার ভরণ-পোষণের ব্যয় বহন করিতেছেন। দিল্লী হইতে বিশ ক্রোশ দূরে পলবালে তিনি এখন সন্তানাদি সহ অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু নিজের আহারাদি স্বহস্তে প্রস্তুত করেন। কাহারোও উপর তাঁহার বিশ্বাস নাই। পৃথিবীর সকল লোককেই শত্রু বলিয়া মনে করেন *। আমি এখন স্পষ্টই দেখিতেছি যে,

* Cosaim Ally Khan, after several adventures and flyig from one place to another, has at last taken up his residence at Plawall, a small town 20 kosh from hence on the high road from Agra to Delhi. There, in a mis-

আমার বিশ্বাসঘাতকা তাঁহার ক্ষিপ্তাবস্থার মূল কারণ। এখন তিনি আপনার শাশুড়ী এবং আপন স্ত্রীকেও বিশ্বাস করেন না। কিন্তু তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, এক-দিন না এক-দিন তিনি দিল্লীর বাদসাহ হইয়া ইংরাজদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে সমর্থ হইবেন।

নবাবের সমুদয় কথা শেষ হইবার পূর্বেই তিন-চারিজন বাঁদী বউবেগমকে নবাবের প্রকোষ্ঠে দেখিয়া তাড়াতাড়ি প্রকোষ্ঠ মধ্যে আসিল। ইহারা নবাবকে একাকী ফেলিয়া প্রকোষ্ঠান্তরে যাইয়া গল্প করিতেছিল। বউবেগম ইহাদিগকে অত্যন্ত তিরস্কার করিতে লাগিলেন, এবং এই দিবস হইতে বেগম নিজে সর্বদাই নবাবের শিয়রে বসিয়া থাকিতেন। আজ প্রায় বিশ-পঁচিশদিন হইল তিনি আহার নিদ্রা সমুদয় পরিত্যাগ করিয়াছেন। নবাবের মাতা, কিম্বা মীরকাসিমের স্ত্রী অথবা জগদম্বা বেগমকে প্রকোষ্ঠে না রাখিয়া কখনেও প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হন না। কিন্তু অন্যান্য লোকেরা বলিতেছে যে নবাবের সমুদয় ধন-সম্পত্তি আত্মসাতৎ করিবার অভিপ্রায়েই বউবেগম সর্বদা নবাবের প্রকোষ্ঠে বসিয়া থাকিতেন, কোন্ কোন্ স্থানে টাকা-কড়ি মজুত রহিয়াছে তাহারই তত্ত্ব লইতেছেন।

এই ঘটনার পর ক্রমই দিন দিন নবাবের রোগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আজ পাঁচদিন হইল নবাব অচৈতন্যাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন। আজ প্রায় সর্বশরীর অবশ হইয়াছে। বউবেগম পূর্ব হইতেই নবাবের শিয়রে বসিয়া থাকিতেন, আজও নবাবের শিয়রে বসিয়া আছেন। তিন-চারিজন বাঁদী তালবৃন্ত হস্তে করিয়া নবাবের শরীর হইতে মক্ষিকা তাড়াইতেছে। মীর কাসিমের স্ত্রী বেগমের পার্শ্বে বসিয়া কোরান হইতে সুর-আলা পাঠ করিতেছেন---

erable tent, surrounded by a couple of tattered walls, does he with a suite of about fifty attendants drag on a wretched life. He has, I believe a small pension from Najhaf Khan, though not openly, and lives on that, and on some effects which he from time to time disposes of. Part of his time is taken up in dressing his own victuals (which office he trusts to no body else.)

By the stars does he regulate all his conduct; and he is fully persuaded that from their influence, and from a due knowledge of it, he will be enabled, one day or another, to remount the musnad either of Bengal or of Delhi, no matter which, with tenfould power and glory.—Vide Asiatic Annual Register for 1800, Miscellaneous Tracts P. 35.

'দাতা ও দয়াময় পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া প্রবৃত্ত হইতেছি—হে মানব, মহোচ্চ প্রতিপালক যিনি, তাঁহার নাম স্মরণ কর; তাঁহার উপর নির্ভর কর। যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি শস্প উৎপন্ন করিয়া পরে তাহা শুষ্ক ও মলিন করিতেছেন, তাঁহাকে জানিতে চেষ্টা কর ইত্যাদি।'

কোরান পাঠ শেষ-হইতে-না-হইতেই জগদম্বা বেগম নবাবের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্বক বউবেগমকে বলিলেন,—'আমেতু, তুমি এখন আহার করিতে যাও, আমি সুজার শিয়রে বসিয়া বাতাস করিব।

ইতিপূর্বে জগদম্বা বেগম বউবেগমকে এতদূর আত্মীয়তা সহকারে সম্বোধন করিতেন না। কিন্তু সুজার এই বর্তমান ব্যারামের সময় জগদম্বা বেগম সর্বদাই বউবেগমের সঙ্গে একত্র হইয়া নবাবের পরিচর্যা করিতেছেন। এই ব্যারাম উপলক্ষে ইহাদের মধ্যে ঠিক যেন মাতা এবং কন্যার সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছে। বউবেগম এখন জগদম্বা বেগমকে মা বলিয়াই সম্বোধন করেন।

জগদম্বা বেগম, বউবেগমকে আহারার্থ চলিয়া যাইতে বলিলে তিনি বলিলেন,—'মা আজ আর আমার আহারাদি করিতে ইচ্ছা হয় না। আজ অন্য কাহারও শয্যাপার্শ্বে বসিবার সাধ্য নাই। নবাবের শরীর পূর্বাপেক্ষা অধিকতর দুর্গন্ধ হইয়া পড়িয়াছে।'

জগদম্বা। সাধ্য না থাকিলে তুমি কিরূপে বসিয়াছ?

বউবেগম। আমার স্বামী। আমি ইহার এই গলিত অঙ্গে চুম্বন করিতেও পারি। কিন্তু অন্য লোকের অবশ্য ঘৃণা হইতে পারে।

জগদম্বা। সুজাকে আমি আপন সন্তানের ন্যায় মনে করি। সুজার গলিত অঙ্গ স্পর্শ করিতে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও ঘৃণা বোধ হইবে না। দাম্পত্য প্রেম অপেক্ষাও মাতৃস্নেহই ঘৃণার ভাব অধিকতর পরিমাণে দূর করে। রমণীগণ মা হইলেই সন্তান পালন উপলক্ষে তাঁহাকে সকল ঘৃণা পরিত্যাগ করিতে হয়।

বউবেগম। মা, আপনার মন যে কতদূর সরল তাহা আমি পূর্বে কিছুই বুঝিতে পারি নাই। কুটিলতা বোধহয় আপনার অন্তরে কখনো প্রবেশ করিতে পারে না। আপনি পূর্বে নবাবের অনেকানেক কুকার্য দর্শনে কোপান্বিত হইতেন। আমি তখন মনে করিতাম, যে সর্বদাই আপনি নবাবকে বিদ্বেষনেত্রে দর্শন করেন। আমি তখন নবাবের কুকার্যের পক্ষপাতী হইয়া আপনাকে শত্রু বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু সে পাপের ফল এখন হাতে হাতে পাইলাম। নবাবের এই দুরবস্থার সময় তাঁহার গর্ভধারিণী অপেক্ষাও আপনি

সমধিক স্নেহসহকারে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেছেন। সর্ব প্রকার ঘৃণার ভাব পরিত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে একত্রে তাঁহার গলিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করিয়া দিতেছেন। আপনি সত্য সত্যই স্বর্গীয় দূত। পূর্বে আপনাকে আমি সর্বদাই বিদ্বেষ-নেত্রে দর্শন করিয়াছি। জোনাবে আলিয়া * আপনাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন বলিয়া তাঁহার উপর বিরক্ত হইতাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে আপনার প্রতি আমি অত্যন্ত অন্যায়াচরণ করিয়াছি। মা, তুমি আমাকে ক্ষমা করিবে। তোমার উপদেশ না শুনিয়াই আজ আমার এই দুর্দশা হইয়াছে। আজ আমার রাজ্যবিনাশের উপক্রম হইয়াছে। কর্তব্য উল্লঙ্ঘনের প্রায়শ্চিত্ত নিশ্চয়ই আমাকে করিতে হইবে।

জগদম্বা। আমি তো তোমাকে বরাবরই আপন কন্যার ন্যায় মনে করি। আমি তো কখনো মনে করি নাই যে তুমি আমাকে বিদ্বেষ নেত্রে দর্শন কর। কিন্তু সে সকল কথার আপাততঃ কোনো প্রয়োজন নাই। এখন তুমি স্নান আহার করিতে যাও।

বউবেগম। আপনার অত্যন্ত সরল মন তাহাতেই আমার মনের কুটিল ভাব আপনি অনুভব করিতে পারেন নাই। হাফেজ-নন্দিনীকে যে দিন আপনি স্থানান্তর করিতে বলিয়াছিলেন, সে দিন আপনাকে আমি যে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তাহা কি আপনার স্মরণ আছে? হা পরমেশ্বর তখন আপনার কথামতো কায করিলে কি আমার এ দুর্দশা হইত?

জগদম্বা। কি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?

বউবেগম। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে নবাব জাফর আলিকে সিংহাসনচ্যুত করিবার নিমিত্ত আপনি কি নবাব কাসিম আলির সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছিলেন?

জগদম্বা। হাঁ, সে বিষয়ে তো কাসিম আলির সঙ্গে অনেক বার পরামর্শ করিয়াছিলাম। সে তো সত্য কথা।

বউবেগম। আপনি যে কাসিম আলিকে তদ্রূপ পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা আমি তৎপূর্বেও শুনিয়াছিলাম। কিন্তু সেই কথাটা আপনার নিজের মুখে জোনাবে আলিয়াকে শুনাইবার নিমিত্ত, সে দিন আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আপনার মন অত্যন্ত সরল। আপনি তখন আমার দুরভিসন্ধি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই।

* বউবেগম আপন শাশুড়ীকে জোনাবে আলিয়া বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

জগদম্বা। ইহার মধ্যে তোমার কি দুরভিসন্ধি ছিল ?

বউবেগম। আমার কিরূপ দুরভিসন্ধি ছিল তাহা এখন আমি অনায়াসে আপনার নিকট প্রকাশ করিতে পারি এখন সাহস করিয়া সকল কথাই আপনাকে বলিতে পারি। এখন দেখিতেছি যে আপনি মানুষ নহেন। আপনি স্বর্গীয় দেবী। আমি অন্যায় করিয়া থাকিলেও আপনি আমার উপর কোপাবিষ্ট হইবেন না। আপনার স্বামীর সঙ্গে আপনার বিবাদ ছিল বলিয়াই সর্বদা আপনাকে পতিঘাতিনী বলিয়া মনে করিতাম। আপনি যে স্বামীর অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাই জোনাবে আলিকে শুনাইবার নিমিত্ত চক্রান্ত করিয়া সেইদিন ঐরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি যে আপনার ন্যায় সদাশয়া পবিত্র-হৃদয়া রমণীর সঙ্গে জাফর আলির কখনোও মিল হইতে পারে না। স্বর্গ এবং নরকে কখনোও মিল হয় না।

জগদম্বা। বাছা! সংসারের লোক হয় তো চিরকালই আমাকে পতি ঘাতিনী বলিয়া মনে করিবে। কিন্তু আমার বিবাহের পর অন্যূন দশ বৎসর আমি পতিকে সৎপথে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। পতি-পুত্র যদি আমার উপদেশ শ্রবণ করিত, তবে আর আমাদের বঙ্গদেশে এইরূপ উৎসন্ন হইত না। পতি-পুত্রের পাপও কুকার্যের পক্ষপাতিনী হইয়া তাহাদিগের ভালোবাসা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলে স্থদ্ধ কেবল তাহাদিগকে বিনাশের দিকে পরিচালন করা হয়।

বউবেগম। মা, আমার অদৃষ্টে তাহাই হইয়াছে। আমি নিজেই স্বামীকে বিনাশের দিকে পরিচালিত করিয়াছি। নবাবের ভালোবাসা বজায় রাখিবার জন্য আমি কখনোও তাঁহার কোনো কুকার্যে প্রতিবাদ করি নাই। আমি সর্বদাই মনে করিতাম যে যাহাতে তিনি সুখী হন তাহাই আমি করিব। তাঁহার কোনো সুখের বাধা দিব না কিন্তু এখন দেখিতেছি যে তাঁহাকে কুকার্য হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা না করিয়া তাঁহার ঘোর অনিষ্ট সাধন করিয়াছি।

জগদম্বা। ইহাদিগকে কুকার্য হইতে বিরত রাখা সহজ ব্যাপার নহে। পুরুষ স্বভাবতঃই বড় নিষ্ঠুর। ইহারা বোঝে না যে, পরস্ত্রীতে আসক্ত হইলে, কিম্বা বহুবিবাহ করিলে, পতিপ্রাণা পত্নীর হৃদয়ে অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হয়। কিন্তু তোমার পতিভক্তি দর্শনে আমি আশ্চর্য হইলাম। মুন্না যেরূপ

ব্যভিচারাসক্ত, তাহাতে সে কখনোও কোনো পতিপ্রাণা রমণীর ভালোবাসা প্রত্যাশা করিতে পারে না। কিন্তু তাহার প্রতি তোমার প্রগাঢ় ভক্তি ইহাতেও হ্রাস হয় নাই। আমি পূর্বে মনে করিতাম যে তুমি কেবল অর্থের জন্য স্বামীর প্রতি কাল্পনিক অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাক। কিন্তু এখন বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি যে, তোমার সম্বন্ধে আমারও এই মহাভ্রম ছিল। তুমি সত্য সত্যই পতিপ্রাণা।

বউবেগম। মা, আমি যে অর্থসংগ্রহার্থ এত চেষ্টা করি, তাহা কি আমার নিজের জন্য। অর্থাভাবে বক্সারে ইহাদিগের কি অবস্থা হইয়া ছিল, তাঁহা আপনি জানেন না। আপনারা বোধহয়, সে সময় রোটাসের কেল্লায় ছিলেন।

জগদম্বা। বক্সারে কি হইয়াছিল?

বউ বেগম। বক্সারের যুদ্ধে ইংরাজদিগের জয়লাভ হইলে পর স্বয়ং বাদশাহ এবং বলবন্তসিংহ আপন আপন সৈন্য সহ ইংরাজদিগের তাঁবুতে চলিয়া গেলেন। তাঁহারা উভয়েই ইংরাজদিগের পক্ষাবলম্বন করিলেন। নবাবের যে কিছু অর্থ সঙ্গে ছিল তাহা পূর্বেই ব্যয় হইয়াছিল। নবাব তখন ঘোর বিপদে পড়িলেন। আপন সৈন্য সহ তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার উপায় রহিল না। তিনি তখন নবাব কাসিম আলির সঙ্গে যে কিছ মূল্যবান মণিমুক্তা ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবার হুকুম দিলেন। নবাব সৈন্যগণ বলপূর্বক কাসিম আলির তাঁম্বু হইতে তাঁহার মণিমুক্তা বাহির করিতে লাগিল। কাসিম আলি তখন আপন তাম্বু হইতে বাহির হইয়া রাজপরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্বক ফকিরের বেশ ধারণ করিলেন। * এদিক নবাবের এই দুরবস্থার সংবাদ ফায়েজাবাদে পৌছিল। নবাবের কর্মচারিগণ দুই-তিনদিনের মধ্যেও টাকা পাঠাইলেন না। তখন আমি আমার সমুদয় গাত্রাভরণ বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ পূর্বক খোজা জহর আলি, বহর আলি এবং দারাব আলি খাঁকে সঙ্গে করিয়া ছদ্মবেশে বক্সারে চলিয়া গিয়াছিলাম। † আমি

* As a last resource, Meer Kossim Khan endeavoured to work upon the feelings of shame in the breast of Shoojan-oo-dowlah and assuming the grab of a Fakeer, he seated himself outside the tent--Broome's History of the Bengal Army, P. 465.

† বউবেগম বক্সারের যুদ্ধের পর যে স্বামীকে উদ্ধারার্থ বক্সারে চলিয়া গিয়াছিলেন তাহা স্যারিডনের বক্তৃতার মধ্যেও উল্লিখিত হইয়াছে।

তখন বক্সারে চলিয়া না গেলে নবাবের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবার আশা ছিল না। নিশ্চয়ই তিনি শত্রু-হস্তে নিপতিত হইতেন। যে দিন আমি বক্সারে পৌঁছিলাম তাহার পূর্বদিবস নবাব কাসিম আলি ফকিরের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছিলেন। আমার অনুরোধে নবাব তাঁহাকে ধৃত করিয়া আনিয়া বাধ্য করিয়া আবার রাজ-পরিচ্ছদ পরিধান করাইলেন। মা, রাজকোষে অর্থ না থাকিলে সময় সময় রাজ্যনাশের উপক্রম হয়। আবার এদিকে স্বয়ং নবাব এবং তাঁহার পিতৃপিতামহের অন্যূন দুই হাজার স্ত্রীলোক ভিন্ন ভিন্ন খোর্দমহলে পড়িয়া রহিয়াছে। আমার হাতে টাকা না থাকিলে এই সকল অনাথা স্ত্রীলোকের এবং তাহাদিগের সন্তানাদির কি উপায় হইবে বল দেখি? আমি যে টাকা সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত এত চেষ্টা করি সে কি নিজের বিলাসের নিমিত্ত?

জগদম্বা বেগম এবং তাহার কন্যা মীর মাসিমের স্ত্রী, বউবেগমের কথা শুনিয়া একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া পড়িলেন। বউবেগম যখন এই সকল কথা বলিতেছিলেন, তখন তাঁহারা উভয়েই একাগ্রচিত্তে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার প্রত্যেক কথা অত্যন্ত আগ্রহাতিশয়-সহকারে শুনিতে লাগিলেন। বউবেগমের কথা শেষ হইলে পর জগদম্বা কিছুকাল সচিন্ত্যমনে নির্বাক থাকিয়া পরে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

'আমেতু, তোমার এই সকল কথা আমার অদ্ভুত স্বপ্নের ন্যায় মনে হয়। আমরা মুসলমানের কন্যা, নবাবের ঘরের বেগম। চন্দ্র সূর্যের মুখ দেখিতে পাই না। সর্বদাই অন্দরের মধ্যে আবদ্ধ থাকি। আমাদের মনে কি এই-রূপ সাহসের সঞ্চার হইতে পারে? এখন বুঝিলাম যে হৃদয়ের মধ্যে ভালোবাসা থাকিলে, অন্তরের মধ্যে প্রেম থাকিলে, মানুষ অসাধ্য সাধন করিতে পারে, অগ্নেতে ঝাঁপ দিতে পারে, পর্বত উল্লঙ্ঘন করিতে পারে। কি আশ্চর্য! তুমি স্বামীর উদ্ধারার্থ একাকিনী সংগ্রামক্ষেত্রে পর্যন্তও গিয়াছিলে। পূর্বে জানিতাম যে তুমি কেবল নবাবের মহাজন। নবাবকে কেবল টাকা ধার দিয়াই তাঁহাকে বাধ্য করিয়া রাখিয়াছ। কিন্তু আজ জানিলাম যে তুমি সেই কাফেরদিগের সীতা। হিন্দুদিগের সীতার গল্প শুনিয়াছ তো? সে সীতা রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া স্বামীর সঙ্গে বনে গিয়াছিলেন।'

বউবেগম। সীতার বাড়ি যে এখান হইতে দেখা যায়। সীতার বাড়ির এত নিকটে থাকিয়া কি আর আমি তাঁহার কথা শুনি নাই।

বউবেগম গবাক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন ঐ,—'যে বটগাছ দেখিতেছেন ঐ স্থানেই সীতার মন্দির ছিল বলিয়া হিন্দুরা বলে।' *

জগদম্বা বেগম কিছু-কাল সচিন্তমনে নির্বাক থাকিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

'আমেতু, আজ তোমার কথা শুনিয়া আমার চক্ষু খুলিল। আজ আমার নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলাম। নবাব আলিবর্দি খাঁর যে কাফের পণ্ডিতের কথা তোমাদিগের নিকট বলিয়াছিলাম, সে কাফের সর্বদাই বলিত যে স্ত্রীলোক যদি আপন ঈশ্বর প্রদত্ত প্রকৃতি সংরক্ষণ করিতে পারে, তবে তাহার স্বামী যত কেন নিষ্ঠুর এবং পাপাচারী হউক না, সে নিশ্চয়ই আপন স্বামীর মন বান্ধিয়া রাখিতে পারিবে। কাফের পণ্ডিতের এই কথা আমি বিশ্বাস করিতাম না। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে কাফের সত্য কথাই বলিয়াছিল। সুজা যে এত ব্যভিচারী ছিল তথাপি সে কখনো তোমার অবাধ্য ছিল না। তুমি যখন যাহা বলিতে সে তাহাই করিত। আমি মনে করিতাম যে সুজা সময়ে সময়ে তোমার নিকট হইতে টাকা ধার লইতেছে সেই জন্যই সে তোমার এত বাধ্য। কিন্তু এখন বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি যে ভালোবাসার শৃঙ্খলেই তুমি সুজাকে বান্ধিয়া রাখিয়াছিলে। হায় হায় তুমি সে দিন মনে করিলে আয়াসে হাফেজ-নন্দিনীর প্রাণরক্ষা করিতে পারিতে।'

জগদম্বা বেগমের এই সকল কথা শুনিয়া বউবেগম বলিতে লাগিলেন,—

'মা, আমারও এখন সে বিষয়ে চক্ষু খুলিয়াছে। সে সময় আমি আপনাকে সর্বদাই বিদ্বেষনেত্রে দর্শন করিতাম। সেই জন্য আপনার কোনো উপদেশ, কোনো পরামর্শই আমার ভালো লাগিত না। অনর্থক আপনাকে পতিঘাতিনী বলিয়া মনে করিতাম। বোধহয় মানুষ, মানুষের বিরুদ্ধে মনে মনে এইরূপ বিদ্বেষভাব পোষণ করিলে তাহার পদে পদে ভ্রম হয়। আমরা তো আর কাহারও মনের কথা জানি না। মানুষের একটা দুইটা কার্য দেখিয়াই সে ভালো লোক কি মন্দ লোক তাহা অবধারণ করি।

জগদম্বা। ঠিক কথাই বলিয়াছ। মানুষের পদে পদেই ভ্রম হয়। আমারও এ জীবনে অনেক ভ্রম হইয়াছে। বোধহয় আমি ক্রোধ এবং অভিমান

---

* ফায়েজাবাদস্থিত নবাবের প্রাসাদ হইতে অযোধ্যানগরের অনেক পুরাতন মন্দিরের চূড়া দেখা যাইত। ফায়েজাবাদ হইতে রামের অযোধ্যা তিন-ক্রোশের অধিক দূর নহে।

যদি একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিতাম, তবে নবাব জাফর আলি এবং আমার হতভাগ্য মীরণকেও সৎপথে আনিতে পারিতাম। যখন মীরনের কুক্রিয়া দর্শনে আমার চক্ষের জল পড়িত, তখন মীরনের মনও একটু নরম হইত। দুই এক সময় আমার চক্ষের জল পড়িতে দেখিয়া সে কুকার্য হইতে বিরত হইত। কিন্তু তোমাকে একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করি, আমাকে তুমি ঘৃণার চক্ষে দেখিতে, সেই জন্যই যেন আমার পরামর্শমত হাফেজ-নন্দিনীকে স্থানান্তর করিলে না। কিন্তু তোমার স্বামী যে আবার একটি নতুন স্ত্রী গ্রহণ করিবেন সে জন্য তোমার মনে কি একটুও কষ্ট হয় নাই?

বউবেগম। আমার বিবাহের পর প্রথম প্রথম আমার মনে ইহাতে বড়ই কষ্ট হইত। তখন গোপনে বসিয়া ক্রন্দন করিতাম; আর ভাবিতাম, যে নবাবেরা বোঝেন না যে, তাঁহারা দিন দিন নূতন স্ত্রী গ্রহণ করিলে তাঁহাদের বেগমের কত কষ্ট হয়। কিন্তু নবাব যখন ক্রমে একটি-দুইটি-তিনটি—পরে শত শত স্ত্রীলোক আনিয়া খোর্দমহল পূর্ণ করিতে লাগিলেন তখন ক্রমে ক্রমে আমার সে মনোদুঃখ হ্রাস হইতে লাগিল। আসফউদ্দৌলার জন্মিবার পরে আমি সে বিষয়ে আর ভ্রূক্ষেপও করিতাম না। নবাব নিজে সুখে থাকেন তাহাই কেবল আমার ইচ্ছা।

বেগম এই কথা বলিয়া অচৈতন্যাবস্থায়-শায়িত নবাব সুজাউদ্দৌলার গলিত মুখের উপর আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে লাগিলেন। সতৃষ্ণ নয়নে সেই মুখ-খানির দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিছু কাল সকলেই নির্বাক থাকিলেন। পরে জগদম্বা আবার বলিতে লাগিলেন,—

'আমেতু, তুমি যথার্থ কথাই বলিয়াছ। পাপাচার ও ব্যভিচার দেখিতে দেখিতে পাপকে পাপ বলিয়া বোধ হয় না; ব্যভিচারকে ব্যভিচার বলিয়া বোধ হয় না। সকলই ক্রমে সহ্য হইয়া যায়। কিন্তু আমার মনে হয় যে সংসারের পাপ এবং ব্যভিচারের উপর চিরকাল ঘৃণার ভাব পোষণ না করিলে সেই পাপ ও কলঙ্কের মধ্যে ডুবিতে হয়। যতদিন পাপ ও কলঙ্কের প্রতি মানুষকে ধীরে ধীরে ঘৃণার ভাব থাকে, তত দিন পর্যন্ত মানুষ পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক থাকে সুজার ব্যভিচারের প্রতি যদি তোমার পূর্বের ন্যায় ঘৃণার ভাব পরেও থাকিত, তবে সে দিন নিশ্চয়ই তুমি হাফেজ-নন্দিনীকে স্থানান্তর করিবার চেষ্টা করিতে। তাহা হইলে আর আজ এ বিপদ উপস্থিত হইত না। এ সংসারের কার্যকলাপ দেখিয়া আমি এই স্থির করিয়াছি 'যে পাপ ও কলঙ্কের

উপর চিরকাল ঘৃণার ভাব পোষণ করিব। তাহা না করিলেই মানুষকে পাপের স্রোতে ভাসিয়া ক্রমে বিপদসাগরে নিমগ্ন হইতে হয়।'

বউবেগম। আমি তো এখন সেই বিপদসাগরে ভাসিতেছি। আমি এখন আপনাকে স্বর্গের দেবতা বলিয়া মনে করি আমি যদি সে দিন চেষ্টা করিতাম, তবে অনায়াসে হাফেজ-নন্দিনীর প্রাণ রক্ষা করিতে পারিতাম। এ নারীহত্যার পাপ নবাবের নহে। আমি ইচ্ছা করিয়া নারী হত্যা নিবারণ করি নাই, তখন এ সমুদয় আমার দোষ। আপনার কোনো কথা মিথ্যা হয় না। আপনার সে দিনের কথা স্মরণ হইলে আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। আপনি বলিয়াছেন যে হাফেজ-নন্দিনীর হত্যার নিমিত্ত রাজ্য বিনাশের সকল লক্ষণই দেখিতে পাইতেছি। নবাবের এখন আর প্রাণের আশা একেবারেই নাই। আসফউদ্দৌলা কি রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবেন?

বউবেগম এই বলিয়া স্বামীর মস্তকের উপর হস্ত রাখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। জগদম্বা বেগম তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে নবাব মাতা মতীবেগম স্বয়ং আসিয়া পুত্রবধুর হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে স্নান আহার করাইবার নিমিত্ত প্রকোষ্ঠান্তরে লইয়া গেলেন। সুজার শরীর পচিতে আরম্ভ হইলে পর অন্যান্যলোক মতীবেগমকে সুজার শয়ন-প্রকোষ্ঠে বড় প্রবেশ করিতে দিতেন না। পুত্রের স্বর্ণ কান্তি শরীর এইরূপ বিকৃতাবস্থায় দেখিলেই জননীর হৃদয় বিদীর্ণ হইত। তিনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিতেন।

বিংশতিতম অধ্যায়

নূতন সন্ধি

পূর্ব্ব অধ্যায়ের উল্লিখিত ঘটনার দুই দিবস পরেই অযোধ্যার তৃতীয় উজির নবাব সুজাউদ্দৌলার। মৃত্যু হইল। ফয়েজাবাদের সর্বত্র হাহাকারে পরিপূর্ণ হইল। পাঠক ও পাঠিকাগণ হয়তো মনে করিবেন যে একি আশ্চর্য। ইন্দ্রিয়াসক্ত লম্পট নবাব সুজাউদ্দৌলার নিমিত্ত ও প্রজাগণ ক্রন্দন করিয়াছিল?

কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে সুজার নিমিত্তও

যে প্রজাগণ ক্রন্দন করিয়াছিল, এ বড় আশ্চর্য ব্যাপার নহে। বহু বিবাহ এবং শত উপপত্নী-রক্ষণ-প্রথা এই সময় পাপ বলিয়া কেহ মনে করিত না। নবাব এবং ধনী লোকদিগের মধ্যে এই কুপ্রথা বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল, সমাজব্যাপ্ত পাপ ও কুপ্রথা কখনো জনসাধারণের নিকট অন্যায় বলিয়া বোধ হয় না। সুজাউদ্দৌলা বর্তমান সময়ের জনসাধারণের নিকট যে দোষে দোষী, শত বৎসর পূর্বে লোকে সে দোষকে দোষ বলিয়াই মনে করিত না। পক্ষান্তরে সুজাউদ্দৌলা আপন প্রজাদিগের মঙ্গল সাধনার্থ বিশেষ যত্ন করিতেন। তাঁহার সময়ে প্রজাদিগকে কোন প্রকার অন্ন কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। পাছে প্রজাদিগের উপর ডাকাতি হয়, এইজন্য তিনি ইংরাজ বাণিকদিগকে প্রাণান্তেও আপন রাজ্য মধ্যে বাণিজ্যের দোকান খুলিতে দিতেন না। এরূপ কথিত আছে উইলিয়ম বোল্ট নামক একজন ইংরাজ বণিক প্রথমতঃ বঙ্গদেশের অন্তর্গত পূর্ণিয়া জেলায় বাণিজ্য উপলক্ষে বিবিধ অত্যাচার এবং অসদাচরণ করায় মীরকাসিমের রাজত্ব কালে পূর্ণিয়া হইতে তাড়িত হয়। পরে ঐ ব্যক্তি সুজাউদ্দৌলার রাজ্য মধ্যে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিবামাত্র, সুজাউদ্দৌলা এই বিষয়ে আপত্তি করিয়া বঙ্গের তদানীন্তন গবর্নর বেরেলস্ট সাহেবের নিকট পত্র লিখিলেন। বেরেলস্ট সাহেব বোল্ট সাহেবকে তাহার বাণিজ্যের কারবার উঠাইয়া আনিবার নিমিত্ত হুকুম করিলেন। কিন্তু বোল্ট সাহেব নানাপ্রকার ছলনা করিয়া আপন বাণিজ্যের কারবার উঠাইয়া আনিতে বিলম্ব করিতে লাগিল। তখন সুজাউদ্দৌলা পুনর্বার বেরেলস্ট সাহেবের নিকট পত্র লিখিবামাত্র বেরেলস্ট সাহেব বোল্ট সাহেবকে গ্রেপ্তার করিয়া বন্দীস্বরূপ বিলাত প্রেরণ করিয়াছিলেন।

এই প্রকার অপরের অত্যাচার হইতে আপন প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত নবাব সুজাউদ্দৌলা সর্বদা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। সুতরাং তজ্জন্যই তাঁহার মৃত্যুতে অযোধ্যাবাসী জনসাধারণের মধ্যে হাহাকার-ধ্বনি সমুত্থিত হইল।

সুজাউদ্দৌলার সময়ে অযোধ্যা ভারতের উদ্যান বলিয়া অভিহিত হইত। বস্তুত অযোধ্যা যে ভারতের উদ্যান ছিল, তাহার কোনো সন্দেহ নাই। পণ্য সলিলা সরযু নদী ইহার বক্ষে প্রবাহিত হইয়া সমুদয় দেশকে ফল শস্যে পরিপর্ণ করিত। এদেশের জল-বায়ু স্পর্শে চিররুগ্ন শরীর সুস্থ হইত। কিন্তু এখন আর অযোধ্যার সে অবস্থা নাই এখন ইহার এক প্রান্ত হইতে অপর

প্রান্ত পর্যন্ত কেবল অন্ন কষ্টের চিৎকার শুনা যায়। এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসীদিগকে দিবারাত্রের মধ্যে কেবল মাত্র এক সন্ধ্যা আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে হয়।

*   *   *   *   *   *

বউবেগমের আদেশানুসারে নবাব সরকারের প্রধান প্রধান মুসলমান কর্মচারিগণ সুজার মৃতদেহ নবাব প্রসাদের পূর্বদিকে গোলাপ বাগানের নিকটবর্তী স্থানে সমাধিস্থ করিবার নিমিত্ত লইয়া চলিলেন। কি হিন্দু, কি মুসলমান, নগরের অধিকাংশ লোক হাহাকার করিতে করিতে মৃত শবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। খ্রীস্টীয় ১৭৭৫ শকের ফেব্রুয়ারি মাসে মুজা জালালদ্দীন হায়দর নবাব সুজাউদ্দৌলার মৃতদেহ তাঁহার পিতা নবাব মনশুর আলি খাঁ সবদরজঙ্গ বাহাদুরের মৃত দেহের পশ্চিম পার্শ্বে সমাধিস্থ করা হইল

এদিকে সুজাউদ্দৌলার মৃতদেহ সমাধিস্থ করিয়া কর্মচারীদিগের গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার পূর্বেই সুজার জ্যেষ্ঠ পুত্র নবাব আসফউদ্দৌলা সিংহাসনারোহণার্থ যার-পর-নাই আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সুজার মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্রগণ মধ্যে আসফউদ্দৌলা, সাদাত আলি খাঁ এবং মুজাজুঙ্গলী এই তিনজন মাত্র প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। ইহাদের মধ্যে আসফউদ্দৌলা অত্যন্ত ভীরু এবং নিস্তেজ ছিলেন। বদান্যতা ভিন্ন তাঁহার মধ্যে আর কোনো গুণ ছিল না তিনি অত্যন্ত দাতা ছিলেন। অযোধ্যাবাসী জনসাধারণের মুখে এই সর্বদাই শুনা যাইত যে পরমেশ্বরের নিকট যাঞা করিয়াও কেহ বঞ্চিত হইতে পারে কিন্তু আসফউদ্দৌলার নিকট কোনো বিষয়ে কেহ যাঞা করিলে তাহার প্রার্থনা নিষ্ফল হয় না।

আসফউদ্দৌলার রাজ্যশাসন করিবার ক্ষমতা একেবারেই ছিল না। কিন্তু সুজা ইহা জানিয়া শুনিয়াও আসফউদ্দৌলাকেই সিংহাসন প্রদান করিবেন বলিয়া পূর্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। আসফউদ্দৌলা বউবেগম গর্ভজাত সন্তান। এই জন্যই সুজা তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন। কিন্তু সুজরা সন্তানগণ মধ্যে সাদাত আলি খাঁর রাজ্য শাসনের বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল; এবং মুজাজুঙ্গলী সংগ্রামিক কৌশলে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সাদাত আলির জীবনে স্বীয় পিতার কার্যদক্ষতা এবং চিন্তাশীলতা সর্বদাই পরিলক্ষিত হইত। আর মুজাজুঙ্গলী পিতার রণকৌশল লাভ করিয়াছিলেন।

নির্বোধ আসফউদ্দৌলা সিংহাসনারূঢ় হইয়া যদি আপন জননীর উপদেশানুসারে আপন ভ্রাতৃদ্বয়ের হস্তে রাজকার্যের কতক বিষয়ের ভার প্রদান করিতেন, তবে আর তাঁহাকে চিরদুঃখে কাল যাপন করিতে হইত না। কিন্তু মাতুর্জা খাঁ ভিন্ন তিনি আর কাহারো পরামর্শ গ্রহণ করিতেন না। পিতার মৃতদেহ সমাধিস্থ হইবার পূর্বেই তিনি সিংহাসনে উপবেশন করিবার নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলে, বউবেগম তাঁহাকে বারম্বার বলিতে লাগিলেন,—

'বাছা অন্ততঃ তিনদিন অপেক্ষা কর। এ সিংহাসন সম্বন্ধে তোমার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নাই।'

কিন্তু আসফউদ্দৌলা জননীর কথায় একেবারেই কর্ণপাত করিলেন না। তখন তাঁহার পিতামহী জোনাবে আলিয়া মতী বেগম পৌত্রের নিকট আসিয়া বলিতে লাগিলেন,—

'বাছা তোমার কোনো শঙ্কা নাই। তোমাকে কেহই সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। বিশ বৎসর পূর্বে তোমার পিতা সিংহাসনারূঢ় হইবামাত্র রাজ্য মধ্যে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবার উপক্রম হইয়াছিল। ইস্মায়েলবেগ খাঁ গোপনে গোপনে বিদ্রোহীদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিল। আমি তখন রাজা রামনারায়ণকে বলিয়া-কহিয়া সমুদয় গোলযোগ নিবারণ করিয়া দিলাম *। তুমি বরং হিন্দু মন্ত্রীদিগের পরামর্শানুসারে কার্য কর। মাতুর্জা খাঁর উপদেশানুসারে কার্য করিলে চরমে কষ্ট পাইতে হইবে।'

আসফউদ্দৌলা পিতামহীর উপদেশও শ্রবণ করিলেন না। তৎক্ষণাৎ ইংরাজ রেসিডেণ্টকে ডাকাইয়া আনিয়া মসনদের উপর উপবেশন করিলেন। মাতুর্জা খাঁকে প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রদানার্থ চক্রান্ত করিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রী মহম্মদ ইরাজ খাঁকে বাদসাহের নিকট হইতে সনন্দ আনয়নের ছলনায় দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন।

সুজাউদ্দৌলার মৃত্যু এবং আসফউদ্দৌলার সিংহাসনারোহণের সংবাদ কলিকাতা কৌন্সিলে পৌছিবামাত্র কৌন্সিলের মেম্বরগণ আসফউদ্দৌলার সঙ্গে নূতন সন্ধি সংস্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন,

* সুজাউদ্দৌলা একজন ক্ষত্রিয় রমণীকে বলপূর্বক অন্দরভুক্ত করিলে পর এই বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সায়দ কামালুদ্দীন হায়দরের লিখিত ইতিহাসে এই বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

"সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে যে সন্ধি হইয়াছিল তদ্দ্বারা আসফউদ্দৌলাকে বাধ্য করা যাইতে পারে না।" ইতিপূর্বে গবর্ণর জেনারেল হেস্টিংসের আপন লোক মিডল্টন সাহেব অযোধ্যার দরবারে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে রেসিডেণ্ট ছিলেন। হেস্টিংস সাহেব মিডল্টন সাহেবের পত্রাদি কৌন্সিলের অন্যান্য মেম্বরদিগকে দেখিতে দিতেন না।

কৌন্সিলের মধ্যে হেস্টিংসের বিপক্ষ মেম্বরগণ হেস্টিংসের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া মিডল্টন সাহেবের পরিবর্তে ব্রিস্টো সাহেবকে অযোধ্যার রেসিডেণ্টের পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। এখন ব্রিস্টো সাহেবই রেসিডেণ্টের পদে নিযুক্ত আছেন।

সুজাউদ্দৌলার মৃত্যুর চারিমাস পরে অর্থাৎ ১৭৭৫ খৃঃ অব্দের মে মাসে আসফউদ্দৌলার সঙ্গে ইংরাজদিগের নূতন সন্ধিপত্র লেখা-পড়া হইল। পূর্ব সন্ধিপত্র অনুসারে সুজাউদ্দৌলাকে আপন রাজ্যে ইংরাজসৈন্য রাখিবার নিমিত্ত মাসে মাসে দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা দিতে হইত। কিন্তু নূতন সন্ধিপত্র দ্বারা আর পঞ্চাশ হাজার টাকা বৃদ্ধি করা হইল। দুইলক্ষ দশ হাজারের স্থানে ইংরাজেরা আসফউদ্দৌলাকে দুই লক্ষ ষাট হাজার টাকা দিতে বাধ্য করিলেন। নিস্তেজ আসফউদ্দৌলা ইহাতে কোনো আপত্তি করিলেন না। এতদ্ভিন্ন এই সন্ধিপত্র দ্বারা চৈৎসিংহের রাজ্য ইংরাজ-রাজ্যভুক্ত করা হইল। এপর্যন্ত চৈৎসিংহ অযোধ্যার উজীরের অধীনে করপ্রদ রাজা ছিলেন। অযোধ্যার উজীরকে তাঁহার কর প্রদান করিতে হইত। কিন্তু এই নূতন সন্ধি স্থাপন উপলক্ষে তাঁহার দেয় কর ইংরাজেরা পাইবেন বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। চৈৎসিংহ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বার্ষিক ২২,৬৬,১৮০ বাইশ লক্ষ ছেষট্টি হাজার একশত আশি টাকা দিতে অগত্যা স্বীকার করিলেন, এবং ইংরাজদিগকে সেই মর্মে কবুলিয়ত লিখিয়া দিলেন। এই সন্ধিপত্র দ্বারা আসফউদ্দৌলা মীরকাসিমকে স্বরাজ্যে কখনো স্থান প্রদান করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন, এবং ধৃত করিতে পারিলে ইংরাজদিগের হাতে সমর্পণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

এই সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ হইলে পর দলে দলে ইংরাজগণ আসিয়া অযোধ্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। বঙ্গদেশ ইতিপূর্বেই উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশে এখন আর লোকের প্রাণবধ করিলেও টাকা বাহির হয় না। বঙ্গদেশ ছারখার হইয়াছে। অমৃত ফলের লোভে শ্রীরামচন্দ্রের অনুচরগণ ত্রেতা

যুগে যদ্রূপ দলে দলে রাবণের উদ্যানে প্রবেশ করিয়া স্বর্ণলঙ্কা ছারখার করিয়াছিল, আসফউদ্দৌলার রাজত্বের প্রারম্ভে অযোধ্যায় ঠিক সেই প্রকার অভিনয় আরম্ভ হইল।

গবর্নর জেনেরল ওয়ারেন হেস্টিংসের বিপক্ষগণ হেস্টিংসের নিজের লোক মিডল্টন সাহেবকে পদচ্যুত করিলে পর হেস্টিংস দেখিলেন যে তাঁহার নিজের উৎকোচ সম্বন্ধে কোনো বন্দোবস্ত চলে না। সুতরাং তিনি ঘয়াও বন্দোবস্তের নিমিত্ত পামার সাহেবকে অযোধ্যার দরবারে রাখিয়া দিলেন। পামার সাহেবের সমুদয় ব্যয় আসফউদ্দৌলাকে দিতে হইত।

একবিংশতিতম অধ্যায়

একরারনামা

সুজার মৃত্যুর দুই মাস গত হইতে-না-হইতেই আসফউদ্দৌলার রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়িল। তিনি ইংরাজ সৈন্যের ব্যয় নির্বাহার্থ মাসে মাসে যে দুই লক্ষ যাট হাজার টাকা ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কেম্পানিকে দিতে স্বীকার করিয়াছেন ছয় মাসের মধ্যে তাহার এক পয়সাও দিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার সিংহাসনারোহণের পর ছয় মাসের মধ্যে অন্যূন এককোটী টাকা ব্যয় হইয়া গেল। এই এককোটি টাকার মধ্যে প্রায় আশি হাজার টাকাই ইংরাজ সৈন্য, ইংরাজ কর্মচারী এবং ইংরাজ রমণীদিগকে মধ্যে বিতরিত হইল।

রাজস্ব-বিভাগের কর্মচারীদিগের মধ্যে আমিল, নায়েব এবং তহসিলদার যখন যে কিছু রাজস্ব আদায় করিয়া পাঠাইতেন, তাহা তৎক্ষণাৎ ব্যয় হইয়া যাইতে লাগিল। এইসকল আমিল, নায়েব এবং তহসিল দারের প্রেরিত টাকা নবাবের মালখানা পর্যন্ত পৌঁছিত না ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইংরাজ কর্মচারীগণ কোম্পানির প্রাপ্য টাকা আদায়ের বিশেষ যত্ন করিতেন না তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন যে, কোম্পানীর প্রাপ্য টাকা নবাবকে নিশ্চয়ই দিতে হইবে। প্রত্যেক ইংরাজ-কর্মচারী নিজে গোপনে গোপনে নবাবের নিকট হইতে যত টাকা আদায় করিতে পারেন কেবল তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

আসফউদ্দৌলার হাতে টাকা না থাকিলে তিনি স্বীয় জননী এবং পিতামহীর নিকট হইতে ছলে বলে টাকা বাহির করিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার জননীর তহবিল হইতে ক্রমে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা বাহির করিলেন। তাঁহার জননী সর্বদাই তাঁহাকে ব্যয়-সঙ্কোচ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি নিতান্ত নিস্তেজ ছিলেন। ইংরাজ কর্মচারিগণ বখশিশ্‌ ইত্যাদি বলিয়া টাকা চাহিলে তিনি চক্ষু লজ্জায় কখনোও টাকা দিতে অস্বীকার করিতে পারিতেন না।

এদিকে বৃদ্ধ মন্ত্রী মহম্মদ ইরাজ খাঁ ইতিপূর্বেই দিল্লীতে প্রেরিত হইয়াছেন। মার্তুজা খাঁ প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করিয়া এখন নায়েব উজীর মাখ্‌তুবাদ্‌উদ্দৌলা নামে পরিচিত হইলেন। ইনি সর্বদাই নবাবকে তাঁহার জননী ও পিতামহীর অর্থাপহরণার্থ পরামর্শ প্রদান করিতে লাগিলেন।

সিংহাসনারোহণের পর আট মাসের মধ্যে নবাব কোম্পানির প্রাপ্য টাকার একটি পয়সাও পরিশোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। মাসে মাসে দুই লক্ষ ষাট হাজার টাকা দেনা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কলিকাতা কৌন্সিল অবিলম্বে নবাবের নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত রেসিডেন্ট ব্রিস্টো সাহেবকে হুকুম করিয়া পাঠাইলেন।

ব্রিস্টো সাহেব নবাবকে কলিকাতা কৌন্সিলের হুকুম জ্ঞাত করাইলে নবাব ঘোর বিপদে পড়িলেন। নবাবের হাতে একটি পয়সাও নাই। ইংরাজেরা দেখিলেন যে নবাবের এখন আর কোনো প্রকারেই টাকা প্রদান করিবার সাধ্য নাই। তাহারা তখন নবাবকে তাঁহার মাতার তহবিল হইতে টাকা আনিতে পরামর্শ দিলেন। আসফউদ্দৌলা নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন না। কিন্তু টাকা বাহির করিবার ফন্দি ইংরাজেরা যেরূপ জানেন এইরূপ আর কেহই জানে না। তাঁহারা দুই-চারি জন মৌলবীকে আসফউদ্দৌলার নিকট উপস্থিত করিলেন। এই সকল মৌলবী ফতেহা প্রদান করিলেন, যে, বেগমদিগের তহবিলের টাকায় বেগমদের কোনো স্বত্বাধিকার নাই; ঐ সকল টাকা নবাব সুজাউদ্দৌলার ছিল; সুজাউদ্দৌলার মৃত্যুর পর আসফউদ্দৌলা উত্তরাধিকারক্রমে ঐ টাকার মালিক হইয়াছেন।

মৌলবীদিগের এই ফতেহা হস্তে করিয়া মন্ত্রী মাখ্‌তুবাদউদ্দৌলা বউবেগমের নিকট আসিলেন। বেগমের নিকট আপন বক্তব্য বিষয় বলিবামাত্র বউবেগম সক্রোধে মার্তুজা খাঁকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, 'তোমরা নবাবকে

নিকট যাইয়া বল, যে, তার বাবার কোনো টাকা আমার নিকট নাই। আমার হাতের টাকা আমার বাবার নিকট হইতে আমি পাইয়াছি *।

বেগমকে কোপান্বিত দেখিয়া মাথ্তুবাদউদ্দৌলার আর একটি কথা বলিবারও সাহস হইল না। তিনি নবাবের নিকট চলিয়া গেলেন। এদিকে বলপূর্বক বেগমের টাকা অপহরণ করিবার চক্রান্ত হইতে লাগিল। ইংরাজ রেসিডেন্ট এবং মাথ্তুবাদউদ্দৌলাই ইহার প্রধান চক্রান্তকারী।

তিনজন বিশ্বাসী ভৃত্য ভিন্ন বেগমের সাহায্য করে এমন লোক আর ছিল না। তাঁহার ভৃত্যদিগের মধ্যে খোজা জহরালি খাঁ, বহরালি খাঁ এবং দারাবালি খাঁর প্রভুভক্তির কথা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। বেগমের মঙ্গলার্থ ইহারা প্রাণ বিসর্জন করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। জহরালি এবং বহরালি বেগমের পিত্রালয় হইতে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল। বেগম বাল্যাবস্থায় ইহাদিগের অঙ্কেই প্রতিপালিত হইয়াছেন। ইহারা উভয়েই বেগমকে আপন কন্যার ন্যায় স্নেহ করিত।

খোজা দারাবালি খাঁকে † বেগম নিজে সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করিতেন। ছয় বৎসর বয়সের সময় দারাবালি বেগমের অন্দরভুক্ত হইলে স্বয়ং বেগম ইহাকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিয়া দারাবালি নাম প্রদান করিয়াছেন।

দারাবালি খাঁর বুদ্ধি প্রখর ছিল। সে নায়েব উজীর মাথ্তুবাদউদ্দৌলার এবং ইংরাজ রেসিডেন্টের চক্রান্তের বিষয় জানিতে পারিয়া গোপনে বেগমের নিকট সমুদয় কথা বলিল।

বেগম এই সকল চক্রান্তের কথা শুনিয়া একেবারে হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন। একে তো স্বামীশোকে তিনি বিশেষ মানসিক কষ্ট ভোগ করিতেছেন, ইহার উপর আবার সাজ্যনাশের উপক্রম হইয়া উঠিল; কি উপায় অবলম্বন করিবেন তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

দারাবালি খাঁ অত্যন্ত তেজস্বী যুবক ছিল। সে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া

---

* বক্সারের যুদ্ধের পর বউবেগম তাঁহার পিতৃপ্রদত্ত আভরণ পর্যন্ত বিক্রয় করিয়া স্বামীর উদ্ধারার্থ কতক টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই টাকা পরিশোধকালে সুজা বেগমের নিকট হইতে যে পরিমাণ টাকা পাইয়াছিলেন তাহার চতুর্গুণ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই জন্যই বেগম আপন তহবিলের টাকা পিতৃপ্রদত্ত টাকা বলিয়া মনে করিতেন।

† খোজা দারাবালি খাঁ হিন্দুর সন্তান ছিল। ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বেচুসিংহের পৌত্র ও প্রপৌত্রগণ লর্ড ডাফরিনের রাজত্বকালে তাঁহার নিকট দারাবালির উত্তরাধিকারী সূত্রে বেগমের প্রদত্ত টাকা পাইবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

বেগমের সম্পত্তি রক্ষার পরামর্শ প্রদান করিল। কিন্তু জগদম্বা বেগম এইরূপ পরামর্শ অনুমোদন করিলেন না। তিনি প্রথমত কলিকাতার গবর্নর জেনেরল হেস্টিংস সাহেবের নিকট বেগমকে এক পত্র লিখিতে পরামর্শ দিলেন।

জগদম্বা বেগমের প্রতি বউবেগমের এখন বিশেষ ভক্তি হইয়াছে। তিনি তাঁহার পরামর্শ অনুসারে ওয়ারেন হেস্টিংসের নিকট পারস্য ভাষায় এই মর্মে পত্র লিখিলেন,—

'স্বর্গীয় নবাব জীবিত থাকিতে তাঁহার সঙ্গে আপনার বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর শত্রু হস্ত হইতে তাঁহার রাজ্যরক্ষার্থ এখনো আপনাদের সৈন্যই নিযুক্ত রহিয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে আমি এবং তাঁহার অন্যান্য পত্নীগণ অনাথা হইয়া পড়িয়াছি। আমাদিগের মান-সম্ভ্রম এবং সম্পত্তি রক্ষার ভারও আপনার হস্তেই ন্যস্ত রহিয়াছে। স্বর্গীয় নবাবের সঙ্গে আপনার যেরূপ আত্মীয়তা ছিল, তাহাতে আমরা প্রত্যাশা করি, যে অপরের অন্যায়াচরণ হইতে আপনি অবশ্যই আমাদিগকে রক্ষা করিতে যত্ন করিবেন।

'আমার পুত্র নবাব আসফউদ্দৌলার রাজকার্য কিম্বা শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা নাই। তিনি সর্বদাই মাতুর্জা খাঁর পরামর্শানুসারে কার্য করিতেছেন। নবাব আসফউদ্দৌলাকে রাজ্যভার হইতে বঞ্চিত করিতে আমি ইচ্ছা করি না। তাঁহার রাজপদ বজায় থাকে, তিনি সুশৃঙ্খলা সহকারে রাজ্যশাসন করিতে পারেন, ইহাই আমি পরমেশ্বরের নিকট সর্বদা প্রার্থনা করি। কিন্তু মাতুর্জা খাঁর হাতে রাজকার্যের ভার থাকিলে অবিলম্বেই এ রাজ্য নষ্ট হইবে।

'মাতুর্জা খাঁ নবাব আসফউদ্দৌলাকে আমাদিগের ধন-সম্পত্তি হরণ করিবার পরামর্শ প্রদান করিতেছে। যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে মান-সম্ভ্রম সহকারে যে আমরা ফায়েজাবাদে থাকিতে পারি, তাহার সম্ভব নাই। আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে আমি স্বর্গীয় নবাবের অন্যান্য দুইশত স্ত্রী এবং নবাব মনসুর আলি খাঁ সবদরজাঙ্গ বাহাদুরের এবং নবাব বরহান মুলুকের স্ত্রীলোকদিগকে সঙ্গে করিয়া, আপনাদের রাজ্যের মধ্যে কোনো একস্থানে যাইয়া বাস করি।'

'জোনাবে আলিয়া সত্বরই মক্কা শরীপ চলিয়া যাইবেন। সুতরাং উপরোক্ত দুই হাজার স্ত্রীলোক ও তাহাদিগের সন্তান-সন্ততির প্রতিপালনের ভার সম্পূর্ণরূপে আমার উপর ন্যস্ত হইবে।'

'আপনি এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া, আপনার শারীরিক ও রাজ্য

সম্বন্ধীয় শুভ সংবাদসহ অনুগ্রহ পূর্বক সত্বর পত্রের প্রত্যুত্তর লিখিবেন।

দস্তখত—বউবেগম।'

এইপত্র প্রেরণের কয়েক দিন পরে সুজাউদ্দৌলার জননী জোনাবে আলিয়া অর্থাৎ মতী বেগমও ওয়ারেন হেস্টিংসের নিকট এক পত্র লিখিলেন। সে পত্রে অধিক-কিছু লিখিত হয় নাই। তিনি স্বীয় সম্পত্তি আপন পুত্রবধূ বউবেগমের হাতে অর্পণ করিয়া মক্কা যাইবার বাসনা প্রকাশ করিলেন।

বউবেগমের অর্থাপহরণের পরামর্শ প্রথমতঃ ইংরাজরাই মাতুর্জা খাঁকে প্রদান করিয়াছিলেন। নহিলে নবাবকে এই পরামর্শ প্রদান করিতে মাতুর্জা খাঁর কখনো সাহস হইত না। কপটাচারী ধূর্ত ওয়ারেন হেস্টিংস পূর্ব হইতে ইহাব চক্রান্ত করিতেছিলেন। তিনি বিলক্ষণ জানিতেন যে নবাবের হাতে একেবারেই টাকা নাই। নবাবের প্রাণ সংহার করিবার ভয় প্রদর্শন করিলেও তিনি টাকা দিতে পারিবেন না। সুতরাং বেগমের টাকা অপহরণের পরামর্শ স্থিরীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু প্রকাশ্যে হেস্টিংস বেগমের পত্রের প্রত্যুত্তরে লিখিলেন,—'নবাব এখন দায়বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। এই সময় আপনি নবাবকে কিছু টাকা ঋণ প্রদান করিয়া, তাঁহার রাজ্য রক্ষার উপায় করিয়া দিলে ভালো হয়। এবার আপনি নবাবকে সাহায্য করিলে ভবিষ্যতে নবাব আর কখনো আপনার তহবিলের টাকা কিম্বা আপনার জায়গির সম্বন্ধে কোনো প্রকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।'

বেগমের সন্তোষার্থ নবাব আসফউদ্দৌলাকে হেস্টিংস এক উপদেশ-পূর্ণ পত্র লিখিলেন। ছয় বৎসরের বালককে স্কুলের পণ্ডিত প্রতিদিন যে সকল কথা বলেন, তাহা সমুদয়ই এই পত্রে লিখিত হইয়াছিল। নবাব আসফউদ্দৌলার এই সময় অনান ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। হেস্টিংস তাঁহাকে লিখিলেন—'পিতা মাতার আদেশ সর্বদা পালন করিতে হয়। আপনি স্বীয় জননীর আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবেন। জননীর প্রতি সর্বদা যথোচিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিবেন।' দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময় মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের শিশুশিক্ষা মুদ্রিত হয় নাই। এই পুস্তকখানি তখন মুদ্রিত হইলে, ওয়ারেন হেস্টিংসকে আর কষ্ট করিয়া পত্র লিখিতে হইত না। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রণীত একখানা তৃতীয় ভাগ শিশুশিক্ষা ক্রয় করিয়া নবাব আসফউদ্দৌলাকে প্রেরণ করিলেই পত্র লেখার উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইত।

অনেক পত্রাপত্রির পর ইংরাজ গবর্নমেণ্ট, নবাব আসফউদ্দৌলা এবং বউবেগম—এই তিন পক্ষের মধ্যে এইরূপ বন্দোবস্ত হইল, যে, ইংরাজদিগের ঋণ পরিশোধার্থ বেগম ছাপান্ন লক্ষ টাকা এখন আসফউদ্দৌলাকে প্রদান করিবেন। আসফউদ্দৌলা এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বেগমকে এইরূপ একরারনামা লিখিয়া দিবেন, যে ভবিষ্যতে আসফউদ্দৌলা আর কখনো বেগমের তহবিল হইতে একটি পয়সাও পাইবেন না এবং বেগমের জায়গির সম্বন্ধে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। যদি আসফউদ্দৌলা ভবিষ্যতে আর কখনো বেগমের তহবিলের টাকা কিম্বা বেগমের অন্য কোনো সম্পত্তি হরণ করিবার উদ্যোগ করেন, তবে ইংরাজ গবর্নমেণ্ট আসফউদ্দৌলার সে অন্যায়াচরণ হইতে বেগমকে রক্ষা করিবেন।

এই বন্দোবস্তের পর নবাব আসফউদ্দৌলা এবং ইংরাজ গবর্নমেণ্টের রেসিডেণ্ট ব্রিস্টো সাহেব পৃথক পৃথক একরারনামা বেগমকে লিখিয়া দিলেন। নবাব আসফউদ্দৌলার প্রদত্ত একরারনামায় লিখিত হইল যে,—

'আমি নবাব আসফউদ্দৌলা বাহাদুর একরার করিতেছি, আমি আমার মাতার নিকট হইতে পূর্বে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলাম; এক্ষণে আবার তাঁহার নিকট হইতে ইংরাজ গবর্নমেণ্টের মারফতে আর ত্রিশ লক্ষ টাকা বুঝিয়া পাইলাম। আমার পিতৃদত্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে আমার মাতার প্রতি আমার কোনো দাবী রহিল না। আমি আর আমার মাতার "তহবিল" হইতে কখনো টাকা লইতে পারিব না। আমার মাতার জায়গির, গঞ্জ, বাজার, বাগিচা এবং তাঁহার ফায়জাবাদের টাঁকশাল ইত্যাদি কোনো সম্পত্তির উপর আমার কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার রহিল না।

'আমার মাতা মক্কা গমনকালে তাঁহার এই সকল সম্পত্তি তিনি যাহাকে বিশ্বাস করেন তাহারই হস্তে রাখিয়া যাইতে পারিবেন। আমি কখনো তাহাতে কোনো আপত্তি করিতে পারিব না। তিনি মক্কা কিম্বা স্বদেশে যেখানেই অবস্থান করুন, তাঁহার সমুদয় জায়গির এবং অন্যান্য সম্পত্তি তাঁহার দখলে ও শাসনাধীনে থাকিবে। অন্য কেহ আমার মাতাকে তাঁহার এই সকল সম্পত্তি হইতে বেদখল করিতে উদ্যত হইলে, আমাকে তাঁহার সম্পত্তি রক্ষা করিতে হইবে। আমার মাতার বিশ্বস্ত ভৃত্য জহর আলি খাঁ, বহর আলি খাঁ, নিয়াৎ খাঁ, সেগুণ আলি খাঁ এবং দারাগালি খাঁর উপর, কিম্বা অন্যান্য তাবিলদারিণীদিগের উপর আমি কখনো কোনো প্রকার অন্যায়াচরণ কিম্বা অত্যাচার করিব না। ইহাদের কাহাকেও

কখনও কোনো কষ্ট প্রদান করিব না। উঁহাদিগকে খোরাক ও পোষাকের ভার আমার মাতার হস্তেই থাকিবেক। তিনিই কেবল তাঁর সমুদয় সম্পত্তির স্বামী এবং তাঁহার বিবিধ সম্পত্তির উপর আধিপত্য করিবেন।

'স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাঁহার নগদ, পরিচ্ছদ এবং আসবাব ইত্যাদি ও চতুষ্পদ সমস্ত সাক্ষাৎ জানি। এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে, উপরের লিখিত কেবল পালন করিব, এবং ভবিষ্যতে আমার মাতার নিকট আমি আর কখনও অর্থের প্রার্থনা করিব না এবং তাঁহার নিকট হইতে আর কখনো ঋণ চাহিতে পারিব না।

১৫ অক্টোবর, ১৭৭৫। নবাব আসফউদ্দৌলা।

ইংরাজ রেসিডেন্ট ব্রিস্টো সাহেব বেগমকে নিম্নলিখিত একরারনামা লিখিয়া দিলেন।

'আমি জন ব্রিস্টো ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এবং ইংরাজ অধ্যক্ষদিগের পক্ষ হইতে এই কবুলনামা লিখিয়া দিতেছি, যে নবাব আসফউদ্দৌলা খাঁ বাহাদুর হজরৎ জান তাঁহার পিতৃ-ত্যজ্য-সম্পত্তি স্বরূপ তাঁহার মাতার নিকট হইতে পূর্বে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা এবং অদ্য ত্রিশ লক্ষ টাকা পাইয়া তাঁহার মাতাকে ফারখতি অথবা ছাড়তিনামা লিখিয়া দিয়াছেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে আমি সেই ফারখতি অথবা ছাড়তিনামার সাক্ষী হইয়াছি। নবাব আসফউদ্দৌলার পিতৃ-ত্যজ্য-সম্পত্তি সম্বন্ধে তাঁহার মাতার উপর তাঁহার আর কোনো দাবী রহিল না। তাঁহার মাতার হস্তে ও দখলে এখন যে সমস্ত সম্পত্তি রহিল তৎসমুদয়ের তিনিই একমাত্র অধিকারিণী। তাহাতে অন্য কাহারও কোনো দাবী করিবার সাধ্য থাকিবে না। তাঁহার মাতা স্বর্গীয় নবাব সুজাউদ্দৌলার প্রদত্ত সমুদয় জায়গির আপন শাসনাধীনে রাখিতে পারিবেন। বেগমের এই সকল সম্পত্তির উপর নবাব আসফউদ্দৌলাও ভবিষ্যতে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। ইংরাজ গভর্নমেন্ট নবাব আসফউদ্দৌলার লিখিত একরার সকল প্রতিপালন সম্বন্ধে জামিন হইলেন। বেগমকে এই সকল সম্পত্তি হইতে কেহ বেদখল করিবার চেষ্টা করিলে ইংরাজরা বেগমের সম্পত্তি রক্ষা করিবেন, বেগম মক্কা যাইবার সময় তাঁহার যাহাকে ইচ্ছা তাঁহার হাতে সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারিবেন। তৎসম্বন্ধে কেহ কোনো আপত্তি করিতে পারিবে না। ইংরাজ গভর্নমেন্ট এই সকল একরার প্রতিপালন সম্বন্ধে আসফউদ্দৌলার প্রতিভূ হইলেন।

১৫ অক্টোবর ১৭৭৫। জন ব্রিস্টো।'

নবাব আসফউদ্দৌলা এবং ব্রিস্টো সাহেব পূর্বোক্ত একরারনামা লিখিয়া

দিলে পর বেগমের আশঙ্কা দূর হইল। তিনি মনে করিতে লাগিলেন যে তাঁহার অর্থাপহরণের আর বড় সম্ভব নাই।

দ্বাবিংশতি অধ্যায়

নূতন রাজধানী

নবাব আসফউদ্দৌলা তাঁহার মাতার নিকট হইতে যে ত্রিশ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইলেন তাহার কিয়দংশ ইংরাজ সৈন্যের ব্যয় নির্বাহার্থ ইংরাজ গভর্নমেণ্টকে প্রদান করিলেন। আর বক্রী দশ বার লক্ষ টাকা পাঁচ-ছয়দিনের মধ্যেই ব্যয় হইয়া গেল। নবাবের হাতে টাকা পড়িয়াছে শুনিয়া অযোধ্যাবাসী ইংরাজগণ ছলে-বলে-কৌশলে সকলেই কিছু কিছু আদায় করিতে আরম্ভ করিলেন।

নবাব আবার রিক্ত হস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু এখন আর তাঁহার স্বীয় জননীর নিকট টাকা চাহিবার উপায় নাই।

এদিকে নবাব মাতা বউবেগম সর্বদাই পুত্রকে ব্যয় সঙ্কোচ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্রকে বলিলেন—

'বাছা! তুমি এ রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না। তুমিই নবাব থাক; কিন্তু রাজকার্য এবং আয়-ব্যয়ের ভার তোমার ভ্রাতা সাদাত আলির হস্তে অর্পণ কর।'

পূর্ব হইতে নবাব আসফউদ্দৌলার মাতৃ-শাসন অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি মাতৃ-শাসন এড়াইবার নিমিত্ত জননীর সঙ্গে বড় একটা দেখা সাক্ষাৎও করিতেন না। এখন এবার তাঁহার মাতা সাদাত আলির হস্তে রাজকার্যের ভার প্রদান করিতে বলিতেছেন। তিনি মাতার সংসর্গ একেবারে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত মাতুর্জা খাঁর সহিত পরামর্শ করিয়া, লক্ষ্ণৌনগরে স্বীয় রাজধানী সংস্থাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি বিলক্ষণ জানিতেন যে, তাঁহার মাতা এবং পিতামহী কখনোও ফয়েজাবাদ পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্ণৌ যাইতে সম্মত হইবেন না, সুতারাং লক্ষ্ণৌ রাজধানী সংস্থাপন করিলে অনায়াসে মাতৃ-শাসন হইতে অব্যাহতি পাইবেন।

১৭৭৬ খ্রীঃ অব্দ গত হইতে-না-হইতেই আসফউদ্দৌলার রাজধানী লক্ষ্ণৌ

নগরে সংস্থাপিত হইবে বলিয়া অবধারিত হইল। ইঞ্জিনিয়ার ক্লড্ মার্টিন সাহেব * আসফউদ্দৌলার রাজধানী নির্ম্মাণার্থ লক্ষ্ণৌয়ে প্রেরিত হইলেন। মার্টিন সাহেব ইংরাজ নহেন। তিনি ফরাসী জাতীয় লোক ছিলেন। কিন্তু ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে সৈনিকবিভাগে নিযুক্ত হইয়া, ইংরাজ সৈন্যদিগের সঙ্গে অযোধ্যায় অবস্থান করিতেন। অত্যল্প কাল মধ্যে ইনি আসফউদ্দৌলার বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িলেন। কয়েক বৎসরে আসফউদ্দৌলা ইহাকে অন্যূন ত্রিশ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন ইনি নবাবের নিকট হইতে অনেক জায়গির ও জমি পাইয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজদিগের ন্যায় এই ব্যক্তি নীচাশয় এবং স্বার্থপরায়ণ ছিলেন না। অন্যান্য ইংরাজ আসফউদ্দৌলার ঘোর অনিষ্ট সাধন করিয়াও অর্থোপার্জ্জন করিত। মার্টিন সাহেব কখনো আসফউদ্দৌলার অনিষ্ট সাধন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করেন নাই।

লক্ষ্ণৌ নগরে রাজধানী নির্ম্মাণ আরম্ভ হইবার পর নবাব আসফউদ্দৌলা আপন স্ত্রী পুত্র এবং অমাত্যবর্গ সহ লক্ষ্ণৌ যাইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তাঁহার ফৈজাবাদ পরিত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে মাতুর্জ্জা খাঁর সঙ্গে তাঁহার বৈমাত্র-ভ্রাতা সাদাত আলির অত্যন্ত বিবাদ হইল। মুর্জ্জা সাদাত আলি খাঁর লোকেরা মাতুর্জ্জা খাঁর প্রাণবিনাশ করিল এবং সাদাত আলি পলায়ন পূর্ব্বক বারাণসী চলিয়া গেলেন

এখন আর আসফউদ্দৌলাকে সৎপরামর্শ প্রদান করিবার লোক একেবারেই রহিল না। জননীর শাসন হইতে মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে তিনি লক্ষ্ণৌ চলিয়া গেলেন এবং তাঁহার পরামর্শদাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইচ্ছা পূর্ব্বক বারাণসী নির্ব্বাসিত হইলেন।

নবাবের পিতামহী মতী বেগম মক্কা শরীপ যাইতে উদ্যত হইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে তাঁহার ধন-সম্পত্তি এবং জায়গির আপন পুত্রবধূ বউবেগমের হাতে সমর্পণ করিয়া যাইবেন। কিন্তু লোকপরম্পরায় জানিতে পারিলেন যে তিনি মক্কা গমন করিলেই তাঁহার সমুদয় ধন-সম্পত্তি আসফউদ্দৌলার হস্তগত হইবে। সুতরাং নিজের ধন-সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত মক্কা গমনের সঙ্কল্প সম্প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার সম্পত্তি রক্ষা সম্বন্ধে ইংরাজ গবর্নমেণ্টের সঙ্গে পত্রাপত্রি চলিতে লাগিল।

* কলিকাতার লামার্টিনিয়ার কলেজ এবং লক্ষ্ণৌ মার্টিনিয়ার কলেজ এই ক্লড্ মার্টিন সাহেবের ত্যক্ত সম্পত্তি দ্বারা সংস্থাপিত হইয়াছে।

মতী বেগম মক্কা গমন সংকল্প পরিত্যাগ করিলে, জগদম্বা বেগম এবং তাঁহার কন্যা কাসিম আলির স্ত্রী ও ফায়জাবাদ হইতে মীরকাসিমের নিকট চলিয়া যাইবেন বলিয়া স্থির করিলেন। মীর কাসিম রাজ্য-শোকে ক্ষিপ্ত হইলে ইহারা দুইজন বেরিলিতে নিতান্ত দরিদ্রাবস্থায় একখানি ক্ষুদ্র কুটিরে বাস করিতেছিলেন। ক্ষিপ্তাবস্থায় কাসিম আলি সর্বদাই আপন স্ত্রী এবং শাশুড়ীর প্রাণবধ করিবার চেষ্টা করিতেন। স্ত্রী এবং শাশুড়ী নিকটে থাকিলে তাঁহার ক্ষিপ্তাবস্থা অপেক্ষাকৃত অধিকতর বৃদ্ধি হইয়া পড়িত। এই জন্য তাঁহার স্ত্রী এবং শাশুড়ী মীর কাসিমের সঙ্গে একত্র বাস করিতে পারিতেন না। মীর কাসিমের সঙ্গে একত্রে পর্ণ-কুটীরে বাস করিয়াও ইহারা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিতেন। দৈব-দুর্বিপাক নিবন্ধন সে সুখ হইতেও ইহারা বঞ্চিত হইলেন

কাসিম আলির প্রতি সুজাউদ্দৌলা অন্যায়াচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া, জগদম্বা বেগম এবং কাসিম আলির স্ত্রী প্রাণান্তেও ফায়জাবাদে সুজার আশ্রয় গ্রহণে সম্মতা হইতেন না। কিন্তু সুজাউদ্দৌলার মাতা মতী বেগম সুদ্ধ কেবল ইহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিবার উদ্দেশে প্রতারণা করিয়া আপন গৃহে আনিয়াছিলেন। তিনি ইহাদিগের নিকট বলিয়াছিলেন যে সুজার প্রতি তিনি নিজেও অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। তিনি সুজার গৃহে থাকিবেন না, ইহাদিগকে সঙ্গে করিয়া অবিলম্বে মক্কায় চলিয়া যাইবেন।

মতী বেগমের কথা বিশ্বাস করিয়া ইহারা তাঁহার সঙ্গে ফায়েজাবাদে চলিয়া আসিলেন। মতী বেগম প্রায় দুই-তিন বৎসর ইহাদিগকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার মতী-বাগান নামক ভবনে বাস করিতেছিলেন। ইহারা ফায়েজাবাদে আসিয়া দুই-তিন বৎসরের মধ্যেও সুজার প্রাসাদে যাইতে সম্মতা হন নাই। কিন্তু চারি-পাচ বৎসর গত হইলে পর ইহারা সুজার সকল অপরাধ বিস্মৃত হইলেন। সুজার প্রতি আর ইহাদিগের কোনো বিদ্বেষের ভাব রহিল না। সুজাও সময়ে সময়ে কাসিম আলির নিমিত্ত অনেক আক্ষেপ করিতেন। তখন পরস্পরের মধ্যে আবার সদ্ভাবের সঞ্চার হইল এবং ইহারা মতী বেগমের সঙ্গে সময়ে সময়ে সুজার প্রাসাদে যাইয়া অবস্থান করিতেন।

এখন মতী বেগমের মক্কা গমন একেবারেই স্থগিত হইল মনে করিয়া, জগদম্বা আপন কন্যাসহ মীর কাসিমের নিকট যাইবেন বলিয়া স্থির করিলেন। জগদম্বা বেগমের ফায়েজাবাদ পরিত্যাগ করিবার আরও একটি কারণ ছিল। ফায়েজাবাদে লোক পরম্পরায় শুনিলেন আসফউদ্দৌলার সঙ্গে ইংরাজদিগের

গত যে মাসে যে নূতন সন্ধি সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে আসফউদ্দৌলা লিখিয়া দিয়াছেন যে, মীর কাসিম কখনো তাঁহার রাজ্য মধ্যে আসিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বন্দী স্বরূপ ইংরাজদিগের হস্তে সমর্পণ করিবেন। এই সকল কথা শুনিলেই জগদম্বার মনে বড়ই কষ্ট হইত, সুতরাং তিনি মতী বেগম এবং বউবেগমের নিকট ফায়েজাবাদ পরিত্যাগের অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন।

মতী বেগম (এবং এখন বউবেগমও) ইঁহাদিগকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহারা কোনো প্রকারেই ইঁহাদিগকে বিদায় দিতে সম্মত হইলেন না। বিশেষতঃ বউবেগম কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—

'মা, আমার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। তৎপরে পুত্রও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, এখন আপনি আমাকে একাকী ফেলিয়া গেলে আমার বড়ই কষ্ট হইবে। আপনি না হয় আর একবৎসর এখানে অবস্থান করুন।'

সহৃদয়া দয়ার্দ্রচিত্তা জগদম্বা অগত্যা বউবেগমের প্রস্তাবে সম্মতা হইলেন এবং আগামী বৎসরের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ফায়েজাবাদে রহিলেন। কিন্তু এপ্রিল মাসের শেষে শুনিতে পাইলেন যে মীর কাসিম অত্যন্ত রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার আর দীর্ঘকাল বাঁচিবার আশা নাই।

এই সংবাদ শ্রবণে পতিপ্রাণা কাসিম-পত্নী তৎক্ষণাৎ জননীকে সঙ্গে করিয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন। বউবেগম অনেক লোকজন এবং ধন সম্পত্তি সঙ্গে দিয়া ইঁহাদিগকে দিল্লীর নিকটবর্তী পুলবালে প্রেরণ করিলেন।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়

এ পাপের কি আর প্রায়শ্চিত্ত নাই?

এ সংসারে কিছুই স্থায়ী নহে। সকলই অনিত্য, সকলই ক্ষণস্থায়ী, শত বৎসর পূর্বে যে স্থান হর্ম্যে এবং বিবিধ অট্টালিকায় সুশোভিত ছিল, যে স্থান সর্বদা লোকারণ্যে পরিপূর্ণ ছিল, অহর্নিশ যেখানে গীত-বাদ্য এবং নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ হইত, আজ সেখানে স্তূপাকারে রাশীকৃত ইষ্টক পড়িয়া রহিয়াছে। সেই স্থান শৃগাল প্রভৃতি বন্যজন্তুর আবাসস্থান হইয়া পড়িয়াছে।

সরযূ নদীর তীরবর্তী ফায়েজাবাদের রাজপ্রাসাদের কি এখন আর কোনো

চিহ্ন দেখা যায় ? কেহ না বলিয়া দিলে, কোথায় যে নবাবের প্রাসাদ ছিল, তাহা এখন আর অবধারণ করিবারও সাধ্য নাই। নবাব প্রাসাদের সকল চিহ্নই লোপ হইয়াছে, কেবলমাত্র দক্ষিণ দ্বারের ভগ্নাবশিষ্ট পুরাতন প্রাচীরই দেখিতে পাওয়া যায়।

ফয়েজাবাদের চক্-বাজারের উত্তর দিকে যে একটি সিংহদ্বারের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই শত বৎসর পূর্বে নবাব-প্রাসাদের দক্ষিণ দ্বার ছিল। এই অত্যুচ্চ সিংহদ্বারে তিনটি প্রবেশ-পথ বা তোরণ দ্বার ছিল। দক্ষিণ সিংহদ্বার হইতে উত্তর সিংহদ্বার পর্যন্ত একটি সোজা রাস্তা ছিল। সে রাস্তা দ্বারা সাধারণের গমনাগমনের অধিকার ছিল না। নবাব-পরিবারের লোক ভিন্ন অন্য কেহ সে রাস্তায় প্রবেশ করিতে পারিত না। সেই রাস্তার পূর্ব পশ্চিম উভয় পার্শ্বেই অতি উচ্চ প্রাচীর ছিল। প্রাচীরদ্বয়ের উত্তর প্রান্ত সরযূ নদীর তীরবর্তী উত্তর সিংহদ্বারের সহিত সংলগ্ন, আর দক্ষিণপ্রান্ত দক্ষিণ সিংহদ্বারের সহিত সংযুক্ত ছিল। রাস্তার পূর্বপার্শ্বের প্রাচীরের পূর্ব দিকে নবাবের দরবার গৃহ, বৈঠকখানা, খাসমহল এবং দেওয়ানী প্রভৃতি ছিল। আর পশ্চিমদিকের প্রাচীরের পশ্চিম পার্শ্বে দক্ষিণ হইতে উত্তর দ্বার পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে তিনটি খোদমহল ছিল।

এই দুইটি সুদীর্ঘ এবং অত্যুচ্চ প্রাচীরের স্থানে স্থানে আবার সিংহদ্বার রহিয়াছে। পশ্চিম পার্শ্বে প্রাচীরের সঙ্গে তিনটি সিংহদ্বার ছিল। তাহার এক-একটি সিংহদ্বারই এক-একটি খোর্দমহলের প্রবেশ পথ। সকলের দক্ষিণ দিকের খোদমহলে অযোধ্যার প্রথম উজির নবাব বরহান্-মুলুকের উপপত্নীগণ বাস করিতেন। তাহার পরের খোদমহলে নবাব মনসুর আলি খাঁ সফদরজঙ্গের উপপত্নীগণ ছিলেন। একেবারে উত্তর দিকের খোর্দমহলে সুজাউদ্দৌলার উপপত্নীগণ তৎকালে অবস্থান করিতেন।

নবাব আসফউদ্দৌলার সিংহাসন প্রাপ্তির পর ফয়েজাবাদে তাঁহার খোর্দমহল নির্মিত হয় নাই। দুই কারণে আসফউদ্দৌলার খোর্দমহল নির্মাণের প্রয়োজন হইল না। প্রথমতঃ তিনি লক্ষ্ণৌ নগরে রাজধানী সংস্থাপনের অভিপ্রায় করিয়াছিলেন; দ্বিতীয়তঃ তাঁহার উপপত্নীর সংখ্যা অধিক ছিল না। তাঁহার যে দুই-চারিজন স্ত্রী ছিল, তাঁহারা সকলেই ধর্মপত্নীর ন্যায় খাসমহলে বাস করিতেন। কেহ কেহ বলেন আসফউদ্দৌলার একেবারেই উপপত্নী ছিল না, কোরান অনুসারে তিনি চারিজন মাত্র পত্নী গ্রহণ করিয়াছিলেন।

উত্তর সিংহদ্বারের বাহিরে এক প্রশস্ত রাস্তা ছিল। সেই রাস্তা একেবারে সরযূ নদীর তীরস্থিত। উত্তরে সিংহদ্বারের সংলগ্ন পূর্বদিকে সরযূ তীরবর্তী প্রকাণ্ড রাস্তার দক্ষিণপার্শ্বে যে প্রাচীর ছিল, সেই প্রাচীরের ভিতর দক্ষিণ দিকেই একটি অতি সুরম্য হর্ম্য ছিল। সেই হর্ম্যের নাম বেগম দেলখোসা। সুজাউদ্দৌলা জীবিত থাকিতে কখনো কখনো বউবেগমের সঙ্গে একত্রে অপরাহ্নে সরযূ নদীর লহরীলীলা দর্শনার্থ এই দেলখোসায় আসিয়া বসিতেন। এই দেলখোসার গবাক্ষদ্বারে বসিলে সরযূ নদী দেখিতে পাওয়া যাইত। তদ্ভিন্ন নবাবের আর-এক স্বতন্ত্র দেলখোসা ছিল।

এই গৃহখানি খাসমহলের সঙ্গে সংলগ্ন ছিল। খাসমহলের মধ্যস্থিত সুজার শয়ন গৃহ হইতে বরাবর দুই-তিনখানা গৃহের ছাদের উপর দিয়া এখানে স্ত্রীলোকেরা অনায়াসে আসিতে পারিতেন। সুজার মৃত্যুর পরও সময় সময় বউবেগম অপরাহ্নে জগদম্বা বেগম এবং মীর কাসিমের স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া এখানে আসিয়া বসিতেন।

আজ দুই-তিনদিন হইল জগদম্বা বেগম কন্যাসহ পুলবনে মীর কাসিমের নিকট চলিয়া গিয়াছেন। এখন বৈশাখ মাস আরম্ভ হইয়াছে। দিবসে অত্যন্ত গ্রীষ্ম বোধহয়। বউবেগম এখন ফায়েজাবাদের রাজপ্রসাদে একাকিনী মনোদুঃখে দিন যাপন করিতেছেন। অন্যান্য দিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আসিয়া দেলখোসায় বসিতেন; কিন্তু আজ প্রায় চারিদণ্ড বেলা থাকিতেই দেলখোসায় আসিলেন। সঙ্গে যে দুই-তিনজন বাঁদী ছিল, তাহারা প্রকোষ্ঠান্তরে গিয়া গল্প করিতে লাগিল। বেগম একাকিনী একটি প্রকোষ্ঠের জানলার নিকট বসিয়া সরযূ নদীর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

দেলখোসার নিকট দিয়া সরযূ নদী পশ্চিমদিক হইতে বরাবর পূর্বদিকে প্রবাহিত হইতেছে। দেলখোসা হইতে প্রায় একক্রোশ পর্যন্ত নদী পশ্চিমবাহিনী, পরে আবার দক্ষিণমুখী হইয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ঠিক যে স্থান হইতে নদী দক্ষিণমুখী হইয়াছে সেই স্থানকে গুপ্তরপাড় বলা যায়। ফায়েজাবাদ দীর্ঘ কাল হইতেই এইরূপ প্রবাদ শুনা যায় যে, দশরথ-পুত্র লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক বিবর্জিত হইলে প্রাণত্যাগ করিবার অভিপ্রায়ে সরযূ নদীতে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। নদীস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে যে স্থানে আসিয়া তিনি নদী গর্ভে নিমগ্ন হইলেন, সেইস্থানের নামই গুপ্তরপাড়; লক্ষ্মণ এই স্থানে গুপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই গুপ্তারপাড় নামে অভিহিত হইয়াছে। ফায়েজাবাদের

হিন্দু মুসলমান কাহারও নিকট এই পুরাতন প্রবাদ অবিদিত নাই। বেগম নিজেও এই সকল প্রবাদ জানিতেন।

বেগম পশ্চিমদিকে চাহিয়া নদীর লহরীলীলা দেখিতেছেন। গুপ্তারপাড়ের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। নির্জনে বসিলেই নানাপ্রকার চিন্তা আসিয়া মনোমধ্যে উদয় হইতে থাকে। গুপ্তার পাড়ের উপর বেগমের দৃষ্টি পড়িবামাত্র রাম-লক্ষ্মণের কথা তাঁহার স্মরণ হইল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, রাম-লক্ষ্মণের মধ্যে ভালোবাসাই ছিল। রাম-লক্ষ্মণের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে সাদাদত আলি এবং আসফউদ্দৌলার কথা মনে হইল। হঠাৎ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—

'হা পরমেশ্বর সাদাত আলি এবং আসফউদ্দৌলার যদি রাম-লক্ষ্মণের ন্যায় পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসিত তবে আর এ রাজ্য নষ্ট হইত না।' আবার গুপ্তার পাড়ের উপর দৃষ্টি পড়িল। আবার মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—

এই স্থানে লক্ষ্মণ নদীগর্ভে নিমগ্ন হইয়াছিল। লক্ষ্মণ রাম-কর্তৃক বিবর্জিত হইলেন বলিয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন।'

'এই চিন্তা বেগমের মনে উদয় হইবামাত্র তাঁহার দুই চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—

'হায়, আমার সাদাত আলিও নির্বাসিত হইয়াছে। হায়, কেন আমি নবাবকে সাদাত আলির হাতে রাজ্যভার অর্পণ করিতে বলিলাম না। সাদাত আলি নবাব হইলে আর রাজ্যনাসের আশঙ্কা হইত না। আসফউদ্দৌলা আমার গর্ভে জন্মিয়াছে বলিয়াই তো নবাব তাহাকে সিংহাসন প্রদান করিয়াছেন। নহিলে আসফউদ্দৌলার তো আর কোনো গুণই নাই।

'সাদাত আলির প্রতি আমি বিমাতার আচরণ করিয়াছি। নবাবের সন্তানগণ মধ্যে এক সাদাত আলিই সিংহাসনের উপযুক্ত। কিন্তু আমার জন্যই সে কেবল সিংহাসন হইতে বঞ্চিত হইল। আমি বলিলে নবাব নিশ্চয়ই সাদাত আলিকে সিংহাসন প্রদান করিতেন। হায়! জগদম্বা বেগমের ন্যায় আমার মন যদি সরল হইত, তাঁহার ন্যায় আমি যদি পক্ষপাত শূন্য হইতে পারিতাম, তবে এ রাজ্যের বিনাশ হইত না; নবাবের নাম, নবাবের পিতৃ-পিতামহের নাম বজায় থাকিত। আমার ভয়ে নবাব আমার সাক্ষাতে সাদাত আলির নামও করিতেন না; কেবল আসফউদ্দৌলাকেই আদর করিতেন। কিন্তু তিনি বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তিনি অবশ্য বুঝিতেন যে সাদাত আলিই একমাত্র সিংহাসনের উপযুক্ত।'

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বেলা প্রায় শেষ হইল। সূর্য অস্ত-প্রায় হইয়া আসিল। বেগম যে জানলার নিকট মুখ রাখিয়া নদীর দিকে চাহিয়াছিলেন, সেই জানলার দ্বারা সূর্যালোক প্রবেশ করিয়া বেগমের মুখের উপর রৌদ্র পড়িল। তিনি সে প্রকোষ্ঠ হইতে উঠিয়া পূর্বদিকের অন্য এক প্রকোষ্ঠে গিয়া বসিলেন। আবার পূর্বমুখী হইয়া নদীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। পূর্বদিকে অনেক দূরে নদীর অপর পারে একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ রহিয়াছে। বেগমের দৃষ্টি সেই বৃক্ষের উপর পড়িল। ফয়েজাবাদের লোকেরা বলে শ্রীরামচন্দ্র বনে গমনকালে সরযূ নদী পার হইয়া প্রথম রাত্রি সীতাসহ এই বৃক্ষতলে শয়ন করিয়াছিলেন। এই বটবৃক্ষের উপর দৃষ্টি পড়িবামাত্র সীতার কথা মনে হইল। সীতার কথা ভাবিতে ভাবিতে নিজের কথা মনে পড়িল। তখন তিনি একবার আত্মবিস্মৃতের ন্যায় মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—

'কেন হিন্দুরা বলে যে সীতা বড় কষ্টে পড়িয়াছিলেন? হিন্দু কাফের, তাই ওদের বুদ্ধি নাই। সীতার কোনো কষ্টই হয় নাই। স্বামীর সঙ্গে বৃক্ষতল আশ্রয় করিয়াছিল, ইহা অপেক্ষা আর কি সুখ আছে? যে দিন আমি বক্সারের সংগ্রামক্ষেত্রে বাঁদীর বেশে নবাবের তাম্বুতে প্রবেশ করিলাম, সে দিন নবাবের মুখ দেখিয়া আমার কতই আনন্দ হইয়াছিল। তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন না। জহর আলি তাঁহার হাতে টাকা এবং আমার পত্র প্রদান করিল। তিনি চমকিয়া উঠিয়া আমাকে লইয়া নিজের প্রকোষ্ঠের মধ্যে গেলেন। যখন আমার গলা ধরিয়া বলিলেন,—"আমেতু, আমার জন্য তুমি প্রাণবিসর্জন করিতে আসিয়াছ?" তখন আমি কত আনন্দ, কত সুখই অনুভব করিয়াছিলাম। ধন, রত্ন, ঐশ্বর্য কিছুতেই তো আমাকে কখনো এত সুখ প্রদান করে নাই।

'বক্সারে চলিয়া যাইবার সময় জহর আলি বলিত, আমেতু, আর হাঁটিতে পারিবে না। তোমার বড় কষ্ট হইয়াছে। এখন এখানে বিশ্রাম কর।

'কিন্তু বক্সারে যাইবার সময় আমার তো একটু কষ্টও বোধ হয় নাই। বরং জহর আলির উপর আমার অত্যন্ত রাগ হইত। আমি মনে করিতাম, জহর আলি নিজে বিশ্রাম করিতে চাহে, সেই জন্য এইরূপ বলে।

'বক্সার হইতে দেশে পলাইয়া আসিবার সময়ে নবাব অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। ইংরাজ সৈন্য আমাদিগকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। নবাবের তখন দিবারাত্রের মধ্যে নিদ্রা হইত না।

নবাবকে নিদ্রিত করিবার জন্য যখন বাঁদীর বেশে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে বাতাস করিতাম, তখন আমার কতই সুখ বোধ হইত। আমার মনে এত সুখ, এত আনন্দের উদয় হইত, যে, সে সময়ের আসন্ন-বিপদ আমাকে কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত করিতে পারিত না।

'নবাব আমার সহাস্য মুখ দেখিয়া, আমার সাহস দেখিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিতেন,—"আমেতু, আজ হইতে আমার পোশাক তুমি ধারণ করিয়া নবাবী কর, আমি তোমার পোশাক পরিধান করিয়া অন্দরে থাকিব। তোমার বড় সাহস; কিছুতেই তোমার ভয় হয় না।"

'আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম,—"এবার ফায়েজাবাদে যাইয়া তোমার সৈন্যাধ্যক্ষের পদে আমাকে নিযুক্ত করিলে ভাল হয় না?"

'ফায়েজাবাদে পলাইয়া আসিবার সময় পথে একদিনও নবাবের মুখে হাসি না দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইত। সেদিন নবাবকে সহাস্য মুখে কথা বলিতে দেখিয়া, আমার কতই আনন্দ হইয়াছিল। তবে তো এ অযোধ্যার প্রধান বেগমের পদ অপেক্ষাও সে হাসির মূল্য অধিক ছিল। এ প্রধান বেগমের পদ, এ ধন-রত্ন তো কখনো আমাকে সেই সুখ, সেই আনন্দ প্রদান করিতে পারে নাই।

'হিন্দুগণ সত্য সত্যই কাফের।' জগদম্বা বেগম বলেন,—'কাফেরদিগের বড় বুদ্ধি। কোরান মানে না, নবী মানে না, পয়গম্বরের কথা মানে না, সে কাফেরের আবার বুদ্ধি। বুদ্ধি থাকিলে সীতার বড় কষ্ট হইয়াছিল এ কথা বলে কেন? যে দিন সীতা এই বটবৃক্ষতলে স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে করিয়া সমস্ত রাত্রি স্বামীকে বাতাস করিয়াছেন, সে দিন সীতার মনে বড়ই আনন্দ হইয়াছিল। ঠিক বক্সারে গিয়া আমার মনে সেরূপ আনন্দ হইয়াছিল, সীতারও সেইরূপ আনন্দ হইয়াছিল।

'এলাহাবাদ-সন্ধির পর যখন যুদ্ধের গোলমাল চলিয়া গেল, তখন নবাব আমার শয়ন প্রকোষ্ঠে আসিয়া বলিলেন—"আমেতু আমার ধন-রত্ন রাজপদ সকলেই তোমার।"

'কিন্তু বক্সারে নবাবের মুখ দেখিয়া যত আনন্দ হইয়াছিল, সে ধন-রত্ন রাজ-পদ পাইয়া তো আমার তখন সেরূপ আনন্দ হয় নাই।'

বেগম সরযু তীরবর্তী বটবৃক্ষের দিকে চাহিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছেন। তাঁহার বাঁদীত্রয় আসিয়া প্রায় অর্ধ ঘণ্টা কাল তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সে বিষয়ে তাঁহার একেবারেই চৈতন্য নাই। তিনি চিন্তা

করিতে করিতে অবশেষে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া শোকার্ত অবস্থায় কথা বলিবার ন্যায় বলিয়া উঠিলেন,—'জগদম্বা বেগমের কথা না শুনিয়া এ দুর্দশা হইল। প্রাণেশ্বর! তোমার এ রাজ্য রক্ষার আর উপায় দেখি না।' এই বলিয়াই বেগম জানলার পার্শ্বস্থিত শয্যার উপর অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন।

বাঁদীগণ 'ও আল্লা, সোবান আল্লা এ কি হইল!'—এই বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। বাঁদীগণের চীৎকারে বেগম চৈতন্যলাভ করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন,—'আমার কোনো অসুখ হয় নাই। তোরা গোলমাল করিস না।'

এদিকে দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার কিছুকাল পরেই গগনমণ্ডলে চন্দ্রমা সমুদিত হইল। সরযূবক্ষে চন্দ্রালোক পতিত হইবামাত্র জলরাশি যেন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। এ পর্যন্ত বেগম দেলখোসার প্রকোষ্ঠ মধ্যে ছিলেন। এখন দেলখোসার বারেন্দায় বাহির হইলেন। চন্দ্রমা সংস্পর্শে সরযূ আরও মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছে। চন্দ্রমার সঙ্গে সরযূ খেলা করিতেছে দেখিয়া বেগমের হৃদয়ও এখন একটু প্রফুল্ল হইল। কিন্তু রাজ্যবিনাশের চিন্তা কিছুই তাঁহার মন হইতে বিদূরিত হইল না।

দুই-চারিদণ্ড রাত্রি হইলে পর, বেগম বাঁদীত্রয়ের সঙ্গে ছাদের উপরের রাস্তা দিয়া খাসমহালে শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। যে প্রকোষ্ঠে হাফেজনন্দিনী আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, সেইটিই সুজার গ্রীষ্মকালের শয়ন প্রকোষ্ঠ ছিল। বেগম স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে শয়ন করিতেন। সুজা ডাকিয়া না পাঠাইলে কোনো বেগম তাঁহার শয়ন প্রকোষ্ঠে যাইয়া শয়ন করিতেন না। এখন সুজার মৃত্যুর পর বউবেগম বরাবরই সুজার সেই শয়ন প্রকোষ্ঠেই শয়ন করিতেন। কোনো কোনো রাত্রে দুই-একজন বাঁদী বেগমের শয়নাগারে শুইয়া থাকে। আর যে রাত্রে বেগম শয়নাগারে বসিয়া কোরান পাঠ করেন, সে রাত্রে অন্য কাহাকেও প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিতে দিতেন না। আজ রাত্রে বেগম কোরান পাঠ করিবেন বলিয়া মনে করিয়াছেন। সুতরাং শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াই বাঁদীদিগকে বিদায় দিলেন; এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া কোরান শরীফ পাঠ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আজ অনেকক্ষণ দেলখোসায় বসিয়া নানা চিন্তা করিয়াছেন। তাঁহার শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি কোরানের এক সুরা পাঠ করিয়াই শয়ন করিলেন এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন।...শয়ন প্রকোষ্ঠের জানলা খুলিয়া বেগম নিদ্রা

যাইতেছেন। গ্রীষ্মাতিশয্য-নিবন্ধন রাত্রে প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রায়ই আলো রাখিতেন না। তাঁহার শয়ন করিবার পূর্বে গৃহের সমুদয় আলো নির্বাপিত হইত। প্রথম রাত্রে জ্যোৎস্না ছিল। জানলার মধ্যে দিয়া চন্দ্রালোক প্রবেশ করিয়া গৃহ আলোকিত করিয়াছিল। কিন্তু রাত্রে দুই প্রহরের পূর্বেই চন্দ্রমা অদৃশ্য হইল। জগম্মণ্ডল ঘোর অন্ধকারে সমাবৃত হইয়া পড়িল। বেগমের শয়ন প্রকোষ্ঠ একেবারে অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল।

এই গভীর রাত্রে সমুদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিস্তব্ধ হইয়াছে। জন প্রাণীর শব্দ নাই। শয়ন করিবার অব্যবহিত পূর্বে হাফেজ-নন্দিনীর মৃত্যু ঘটনা বেগমের স্মৃতিপথারূঢ় হইয়াছিল। তৎসঙ্গে সঙ্গে আবার জগদম্বা বেগমের নিদারুণ বাক্যও স্মরণ হইয়াছিল। জগদম্বা বেগম বলিয়াছিলেন, নিরপরাধী হাফেজ-কুমারীর শোণিত হইতে দাবাগ্নি সমুৎপন্ন হইয়া সমুদয় অযোধ্যাকে ছারখার করিবে এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতেই বেগম নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় নিদ্রিতাবস্থায় তিনি স্বপ্নে দেখিতে লাগিলেন—সমুদয় গৃহ অগ্নিময় হইয়া পড়িয়াছে। শয়ন প্রকোষ্ঠের সর্বত্রই আগুন জ্বলিতেছে। তিনি অত্যন্ত ভীত হইলেন। চীৎকার করিয়া পার্শ্বস্থিত প্রকোষ্ঠে শয়ানা বাঁদীদিগকে ডাকিবেন বলিয়া মনে করিলেন। কিন্তু মুখ হইতে শব্দ বাহির হইল না। স্বপ্নাবেশে তাঁহার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেই প্রজ্বলিত অগ্নিরাশির মধ্য হইতে শুভ্র বসন পরিহিতা একটি পরমাসুন্দরী অপরূপ লাবণ্যময়ী যুবতী বাহির হইয়া ধীরে ধীরে বেগমের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ইঁহার আকৃতি হাফেজ-নন্দিনীর ন্যায়। "বিনাশ"—"বিনাশ"—এই শব্দ রমণীর মুখ-কমল হইতে নির্গত হইবামাত্র তিনি অন্তর্হিত হইলেন।

"বিনাশ"—এই কথা শুনিয়াই বেগম ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ বাহিরে মেঘের গর্জন শুনিতে পাইলেন। প্রবল ঝঞ্ঝাবাত উপস্থিত হইল। প্রকোষ্ঠের জানলা সকল বাতাসে সঞ্চালিত হইবামাত্র ঠং-ঠং ঠুস্-ঠাস্ শব্দ হইতে লাগিল। বেগম জাগ্রত হইলেন। চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখেন যে বাহিরে ঝড়-বৃষ্টি হইতেছে, কিন্তু প্রকোষ্ঠ মধ্যে কিছুই নাই। বেগম গাত্রোত্থান করিলেন। প্রকোষ্ঠের দরজা খুলিয়া বাঁদীদিগকে ডাকিতে লাগিলেন। বাঁদিগণ জাগ্রত হইয়া প্রদীপ জ্বালিল। বেগমের শিয়রে স্বর্ণখচিত মকমলের বস্ত্রে বাঁধা একখানি কোরান রহিয়াছে। বেগম আবার কোরান

পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। কোরান শরীপ খুলিবামাত্র স্থুরা মুনেন হাতে পড়িল। বেগম স্থুরা মুনেন ধীরে ধীরে এইরূপে পাঠ করিতে লাগিলেন,—

'পরাক্রমশালী জ্ঞানময় ঈশ্বর হইতে এই পুস্তক আসিয়াছে। তিনি পাপ ক্ষমাকারী, অনুতাপ গ্রহণকারী, কঠিন শাস্তিদাতা এবং মহিমান্বিত। তিনি ভিন্ন আর কেহ উপাস্য নাই। তাঁহার দিকে পুনর্গমন করিতে হইবে। ধর্ম-দ্রোহিগণ ব্যতীত অন্য কেহ ঈশ্বরের নিদর্শন সকল সম্বন্ধে বিবাদ করে না।'

স্থুরা মুনেনের এই কয়েকটি কথা বেগম একবার, দুইবার, তিনবার, চারি-বার পাঠ করিলেন। আবার সেই এক কথাই পুনর্বার পাঠ করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে কোরানখানি অত্যন্ত যত্ন এবং ভক্তির সহিত সেই স্বর্ণখচিত মকমলের বস্ত্র দ্বারা বান্ধিলেন। রাত্রি অবসান হইবার এখনো অনেক বিলম্ব আছে। বেগম কোরানখানি আবার শিয়রে রাখিয়া নিদ্রা যাইবার নিমিত্ত শয়ন করিলেন। এবার আর গৃহের আলো নির্বাণ করিলেন না। প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল। শয়ন করিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত বেগমের নিদ্রা হইল না। একবার নিদ্রা ভাঙিয়া গেলে সহজে নিদ্রা হয় না। শয়ন করিয়া বেগম ভাবিতে লাগিলেন,—'ঈশ্বর পাপক্ষমাকারী, ঈশ্বর অনুতাপগ্রহণকারী, কিন্তু আবার ঈশ্বর কঠিন শাস্তিদাতা। জগদম্বা বেগম বলিয়াছেন, হাফেজ-নন্দিনীর শোণিত হইতে দাবাগ্নি উৎপন্ন হইয়া সমুদয় অযোধ্যা ছারখার করিবে। আর স্বপ্নেও সেই প্রজ্বলিত অগ্নিরাশিই দেখিলাম; এ সকল নিশ্চয়ই কুলক্ষণের চিহ্ন। জানিনা কি বিপদই সমুপস্থিত হইবে। কিন্তু এ পাপের কি আর প্রায়শ্চিত্ত নাই?—হায় এ পাপের কি আর প্রায়শ্চিত্ত নাই?—প্রায়শ্চিত্ত নাই—এই ভাবিতে ভাবিতে বেগমের আবার নিদ্রাবেশ হইল। বেগম আবার নিদ্রাভিভূতা হইয়া পড়িলেন। কিন্তু এবার নিদ্রাভিভূত হইবামাত্র স্বপ্নে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্যই দেখিতে লাগিলেন। আত্মহত্যার পর শয়নাগারের যে স্থানে হাফেজ-নন্দিনীর মৃতশরীর পড়িয়াছিল, ঠিক সেই স্থানে হাফেজ-নন্দিনীর মৃত শরীর পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার বক্ষে সেই বিষাক্ত ছুরিকা রহিয়াছে, হাতখানি বুকের উপর পড়িয়া রহিয়াছে, আহত স্থান হইতে শোণিত স্রোত নির্গত হইয়া সরযু নদীর ন্যায় প্রশস্ত এক রক্তনদী প্রবাহিত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে হাফেজ-নন্দিনীর শরীর অদৃশ্য হইল। বেগমের শয্যা সেই শোণিত-নদীর পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে।

এক একবার ঢেউ আসিয়া তাঁহার শয্যা স্পর্শ করিতেছে। অযোধ্যা-বাসী সহস্র সহস্র প্রজার মৃতদেহ সেই রক্তনদীর স্রোতে পূর্বদিকে ভাসিয়া যাইতেছে। বৃদ্ধ খোজা জহর আলি এবং বহর আলি নদীতে পড়িয়া তটে উঠিবার নিমিত্ত চিৎকার করিতেছে। ইংরাজ রেসিডেন্ট মিডল্টন্ সাহেব, বিস্টো সাহেব, এবং আর দশ-বারজন ইংরাজ যষ্টি দ্বারা ঠেলিয়া ঠেলিয়া জহর আলি এবং বহর আলিকে নদীর মধ্যে ভাসাইয়া দিতেছে। তাহারা শতচেষ্টা করিয়াও তটে উঠিতে পারিতেছে না।

বেগম এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া স্বপ্নাবস্থায় বলিয়া উঠিলেন,—'হাফেজ-নন্দিনী রক্ষা কর, রক্ষা কর, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর। আমার ওই বৃদ্ধ খোজা দুইটির প্রাণ রক্ষা কর। ইহারা জননীর ন্যায় বাল্যাবস্থায় আমাকে পালন করিয়াছে।'

তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন যে, জানলা দিয়া ঘরের মধ্যে সূর্যালোক প্রবেশ করিয়াছে।

বেগম প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া প্রথমতঃ নেমাজ করেন; তৎপরে বিষয় কার্য পর্যবেক্ষণ করিতে বসেন। কিন্তু আজ নেমাজের পর আর কোনো বিষয় কার্য দেখিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। শরীর অসুস্থ হইয়াছে বলিয়া, একাকিনী শয়নাগারে বসিয়া গত রাত্রের স্বপ্নের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—

'একি আশ্চর্য স্বপ্নই দেখিলাম। হাফেজ-নন্দিনীর মৃত্যুর পূর্বে এবং পরে জগদম্বা বেগম প্রতিদিন যে সকল কথা বলিতেন, তৎসমুদয়ই তো স্বপ্নে দেখিলাম। তবে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলই কি কালেতে পূর্ণ হইবে?

'তিনি বলিয়াছেন হাফেজ-নন্দিনীর শোণিত হইতে দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া সমুদয় অযোধ্যাকে ভস্মীভূত করিবে। অযোধ্যার সমুদয় প্রজাগণ বিনিষ্ট হইবে। কিন্তু স্বপ্নেও তো প্রজাগণের মৃতদেহ ভাসিতে দেখিলাম। তখন তাঁহার কথা শুনিয়া হাসি পাইত। তাঁহাকেও কাফের বলিয়া মনে হইত। কিন্তু এখন দেখি, যে ক্রমে ক্রমে তাঁহার সকল কথাই ফলিতেছে।'

চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়

বঙ্গের সুবাদারের এই অবস্থা ?

জ্যৈষ্ঠ মাস। গগনমণ্ডল মেঘাবৃত হইয়া রহিয়াছে। প্রবল ঝঞ্চাবাতের আশঙ্কা করিয়া দিল্লীর নিকটবর্তী পুলবাল গ্রামের কৃষকগণ দিবাবসান হইবার পূর্বেই গৃহাভিমুখে চলিয়াছে। একজন কৃষক নিজে একটি হুঁকা হাতে করিয়া যাইতেছে। তাহার অগ্রে অগ্রে একটি বালক একপাল গরু লইয়া চলিতেছে। গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র বড় ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সম্মুখে একটি পুরাতন তাম্বু রহিয়াছে। তাম্বুর স্থানে স্থানে আবরণ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এখন ইহার মধ্যে আর মানুষ বাস করিতে পারে না। বালকটি গোরু লইয়া তাম্বুর নিকটে আসিবামাত্র পালের কয়েকটা গরু তাম্বুর অনাবৃত স্থান দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। গোরু প্রবেশ করিবামাত্র একটি বৃদ্ধা চীৎকার করিয়া বলিল,—'আমুর, আমুর, ঘরের মধ্যে গোরু আসিয়াছে।'

একজন মুসলমান তখন বাহির হইতে আসিয়া গোরু তাড়াইতে তাড়াইতে বলিল,—'হা আল্লা! দুনিয়ার বাদশা যে, আজ তার ঘরের মধ্যে গোরু ঢোকে।'

বৃদ্ধা রমণী এই বৃদ্ধ মুসলমানটিকে আবার কহিলেন,—'আমুর এখানে জল পড়ে। দেখ তো ঘরের আর কোনো স্থানে শয্যা প্রস্তুত করিতে পার কি না?'

আমুর। ঘরে কি আর বিছানা আছে? যে তিনখানি গালিচা ছিল, তাহাও কাল বিক্রয় করিয়াছি। আমি নবাবকে ধরিয়া উঠাইতেছি, আপনারা এই বিছানাটি ঐদিকে সরাইয়া পাতিয়া দিন।

বৃদ্ধা। বাছার এখন একটু নিদ্রা হইয়াছে। এখন টানাটানি করিতে গেলে নিদ্রা ভাঙিয়া যাইবে। হেকিমেরা বলিয়াছেন, অনিদ্রাতেই বাছার রোগ হইয়াছে। হা পরমেশ্বর রাজ্যশোকে চৌদ্দবৎসর কাল বাছার আর নিদ্রা নাই। অনিদ্রা হইতেই বাছা আমার ক্ষিপ্ত হইল।

আমুর। এখন নবাবকে এখান হইতে না সরাইলে নবাবের গায়ে জল পড়িবে। বিছানা ভিজিয়া যাইবে।

আর একটি রমণী এই রুগ্নশয্যার পার্শ্বে বসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন,—'নবাবের গায়ে জল পড়িবে না। যে স্থান দিয়া জল পড়িতেছে, আমি সে দিকে পিঠ দিয়া বসিয়াছি। আমার পৃষ্ঠেই জল পড়িতেছে।'

এই শেষোক্তা রমণীর কথা শুনিয়া, আম্বুরের দুই চক্ষু হইতে দর্ দর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল,—

'হা পরমেশ্বর, দুইশত বাঁদী যাঁহার পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিল, আজ সেই বেগম নিজে আপন পিঠ পাতিয়া দিয়া বৃষ্টির জল হইতে স্বামীর শয্যা ঢাকিয়া রাখিতেছেন।'

ইহাদিগের কথাবার্তায় শয্যোপরি-শায়িত রোগীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি জাগ্রত হইয়া বলিলেন,—'বড় বৃষ্টি হইতেছে নাকি?'

শয্যা পার্শ্বস্থিতা বৃদ্ধা রমণী বলিলেন,—'বাছা তুমি একটু নিদ্রা যাও। অনিদ্রাই তোমার সকল অসুখের কারণ।'

রুগ্ন ব্যক্তি বলিলেন,—'মা, আর বড় বিলম্ব নাই। বোধহয় আর কিছুকাল পরে চিরনিদ্রা হইবে। সে নিদ্রা হইতে আর জাগিতে হইবে না।'

বৃদ্ধা রমণী এবং শয্যার পার্শ্বস্থিতা দ্বিতীয়া রমণী এই কথা শুনিয়া অশ্রু-বিসর্জন করিতে লাগিলেন। রুগ্ন ব্যক্তি আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রদ্বয়কে নিকটে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন।

পাঠকগণ বোধহয় সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন যে, এই রুগ্ন ব্যক্তিই বঙ্গের শেষ সুবাদার প্রজাহিতৈষী মুসলমান-কুলতিলক নবাব মীর কাসিম। তাঁহার শয্যার পার্শ্বস্থিতা বৃদ্ধা রমণী তাঁহার শাশুড়ী জগদম্বা বেগম। ইহার প্রকৃত নাম সাহা চালিম বেগম *—বাল্যকালের নাম মেহের উন্নিসা। ইনি নবাব মাহরান জাঙ্গের বৈমাত্র ভগ্নী ছিলেন। কিন্তু নবাব মাহরান জাঙ্গের পিতৃ বিয়োগ হইলে পর তাঁহার বিমাতা কন্যাসহ নবাব আলিবর্দির গৃহে অবস্থান করিতেন। মাহরান জাঙ্গের বিমাতা নীচবংশোদ্ভবা ছিলেন বলিয়া, মাহরান তাঁহাকে বিমাতা বলিয়া স্বীকার করিতেন না।

রুগ্ন-শয্যায় উপবিষ্টা দ্বিতীয়া রমণী নবাব কাসিম আলির স্ত্রী। ইনি এখন আপন পৃষ্ঠ দ্বারা বৃষ্টির জল হইতে স্বামীর শরীর ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। আর এই বৃদ্ধ মুসলমানটির নাম সেখ মহম্মদ আম্বুর। এ ব্যক্তি কাসিম আলির অত্যন্ত

---

*১৭৭৫ সালের ২৪ জুলাই-এর বেঙ্গল কনসলটেসনে (Bengal Consultation, 24th July 1775) লিখিত হইয়াছে যে সাহা চালিম বেগমের ১৭৭৫ সনের পূর্বেই মৃত্যু হইয়াছিল। কিন্তু মীরনের মাতা সাহা চালিম্ বেগম যে মীর কাসিমের সঙ্গে পলায়ন করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে অনেক প্রবাদ শুনা যায়। বেঙ্গল কনসালটেসনের উল্লিখিত বিবরণ কতদূর সত্য তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিল। কাসিম আলি পলায়ন কালে তাঁহার সঙ্গে যে-কিছু ধন-সম্পত্তি ছিল, তাহার কিয়দংশ নবাব সুজাউদ্দৌলা সৈন্যদিগের ব্যয় নির্বাহার্থ বিক্রয় করাইয়াছিলেন। আর বক্রী সম্পত্তি বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যগণ কর্তৃক অপহৃত হইল। সুদ্ধ কেবল সেখ মহম্মদ আসুরের হাতে যে যৎকিঞ্চিৎ স্বর্ণ ও রত্নাভরণ ছিল, তদ্দ্বারাই এই চৌদ্দবৎসর কাসিম আলি জীবিকা নির্বাহ করিতে সমর্থ হইলেন *।

কাসিম আলির পুত্র দুইটি আসিয়া পিতার শয্যাপার্শ্বে বসিল। ইহাদের পনের-ষোল বৎসরের অধিক বয়ঃক্রম হইয়াছে। কিন্তু দরিদ্রতা নিবন্ধন শারীরিক পরিবর্ধন বয়স অনুযায়ী হয় নাই। ইহাদিগকে দেখিলে তের-চৌদ্দ বৎসরের অধিক বয়স্ক বলিয়া মনে হয় না।

কাসিম আলি পুত্রদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—'বাছারা আমি চলিলাম। আমার মৃত্যুর পর তোমরা নজফ খাঁর নিকট গিয়া বাদশাহের সৈন্যদলে প্রবেশ করিবে। যদি কখনোও রণকৌশলে পারদর্শিতা লাভ করিয়া সেনাপতির পদে অভিসিক্ত হইতে পার, তবে একবার পিতৃরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করিবে। কিন্তু বিদেশীয় লোকের সাহায্যে আর কখনো রাজ্যলাভের চেষ্টা করিবে না। বিদেশীয় লোকের সাহায্যে রাজ্যলাভ করিয়াই তোমাদের পিতার এই দুরবস্থা হইয়াছে।'

এই কথা বলিয়াই কাসিম আলি অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে শোকাবেগ সম্বরণ পূর্বক আবার শাশুড়ী এবং স্ত্রীকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন,—

'ক্ষিপ্তাবস্থায় তোমাদিগকে বড় কষ্ট প্রদান করিয়াছি। এই হতভাগ্যের সঙ্গে আসিয়াই এত কষ্ট পাইলে। মুর্শিদাবাদে থাকিলে আর তোমাদের এত কষ্ট হইত না। কেনই বা এ হতভাগ্যের সঙ্গে আসিলে।'

এপর্যন্ত কাসিম আলির স্ত্রী মৌনাবলম্বন পূর্বক কেবল অশ্রু বিসর্জন করিতে-

---

* One servant however, by name Sheik Mohomed Ashur, was faithful to his fallen master; he had been entrusted with a small supply of jewellery, with which he was diarected to make his way to Rohilkund, which he effected and there awaited the arrival of his master, to whome he finally made over the charge committed to him, and furnished that wretched chief with the only means that enabled him to spin out a few yers of misery and exile.—Broom's History of the Bengal Army p. 466.

ছিলেন। অধিক কথা বলিবার অভ্যাস তাঁহার কখনোও ছিল না অবশেষে তিনি বাষ্পাকুলকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—

'জঁাহাপনা, তোমার সঙ্গে থাকিতে আমার নিজের কোনো কষ্টই কষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। কেবল তোমার কষ্ট দেখিয়াই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তোমার এবং সন্তানদিগের কষ্ট দেখিয়াই আমার বুক ফাটিয়া যায়। পরমেশ্বর করুন আমি এবারেও যেন তোমার সঙ্গিনী হইতে পারি। এবারও আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চল। তুমি পরিত্যাগ না করিলে আমি কখনো তোমার সঙ্গ ছাড়া হইব না।'

এই বলিয়াই স্বামীর পদতলে বসিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বাক্যাবসানে কাসিম আলি সজল নয়নে কাঁদিতে কাঁদতে বলিলেন,—

'হায়, আমি কি ঘোর পাতকী। এই পতিপ্রাণা পুণ্যবতীকে গৃহ বহিষ্কৃতা করিয়াছিলাম। রাজ্যশোক আমাকে এতই মতিচ্ছন্ন করিয়াছিল!'

আবার শাশুড়ীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—

"মা, মৃত্যুকালে আমাকে ক্ষমা কর। তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি। ধর্মাধর্ম-জ্ঞান-বিবর্জিত, অর্থগৃধ্নু, প্রবঞ্চক ইংরাজ দস্যুদিগের সাহায্য গ্রহণ করিয়া, আমি আপনার মৃত্যুবাণ আপনিই প্রস্তুত করিলাম। ইংরাজদিগকে টাকা দিবার নিমিত্ত যদি জমিদার তালুকদারের উপর অত্যাচার করিতে না হইত, তবে আমার নিমিত্ত তাহারা সকলেই অস্ত্র ধারণ করিত।'

মৃত্যুর তিন-চারি দিন পূর্ব হইতে কাসিম আলি এই প্রকার আক্ষেপ করিতেছিলেন। এই কয়েক দিন নিজেও কেবল ক্রন্দন করিলেন, শাশুড়ী-স্ত্রী-সন্তান-সন্ততি এবং বিশ্বস্ত ভৃত্য আম্বর প্রভৃতিকেও কাঁদাইলেন। তিন-চারি দিনের মধ্যে ইহাদের কাহারও চক্ষের জল নিবারিত হইল না।

মৃত্যুর পূর্ব দিন আর বড় কথা বলিবার সাধ্য রহিল না, তথাপি বেলা দুই প্রহর পর্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে অনেক কথা-বার্তা বলিলেন। সে সকল আক্ষেপোক্তি উল্লেখ করিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন। এ অসার সংসারে সকলই অনিত্য এবং ক্ষণস্থায়ী। শত শত অশ্ব গজ যাঁহার দ্বারে বদ্ধ থাকিত, সহস্র সহস্র দাস-দাসী যাঁহার চরণ সেবা করিত, সুরম্য হর্ম্য পরিপূর্ণ রাজ-প্রাসাদে যিনি সতত বিরাজ করিতেন, যাঁহার দর্শনলাভার্থ দিন দিন সহস্র সহস্র লোক দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিত, সেই বঙ্গের সুবাদার কাসিম আলির আজ এই দুরবস্থা!

বেলা অবসান হইয়া আসিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে (খ্রীষ্টীয় অব্দের ১৭৭৭ সালের ৬ জুন তারিখে *) বঙ্গের শেষ সুবাদার প্রজাবৎসল প্রজার চিরমঙ্গলাকাঙ্খী নবাব কাসিম আলি খাঁ এই শোক-দুঃখ পরিপূর্ণ সংসার পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

পতিপ্রাণা কাসিম-পত্নীর এমন একখানি বস্ত্র নাই, যদ্দারা স্বামীর মৃত শরীর আবৃত করিয়া সমাধিস্থ করিবেন। প্রভুভক্ত ভৃত্য মহম্মদ আহ্মর স্বীয় প্রভুর মৃত শরীর আচ্ছাদিত যে একখানি মাত্র † শাল ছিল তাহাই বিক্রয় করিয়া আজ প্রভুর সমাধির ব্যয় নির্বাহ করিল। ধন্য এই অশিক্ষিত প্রভুভক্ত ভৃত্যকে! সংসারের রাজপদ, ধন, ঐশ্বর্য সকলই অস্থায়ী—সকলই কাল সহকারে বিনষ্ট এবং অপহৃত হইল। কিন্তু আহ্মরের এই প্রভুভক্তির দৃষ্টান্ত জলন্ত অক্ষরে স্বর্গরাজ্যে লিখিত হইয়া রহিল।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়

এ মানুষ নহে—এ রাক্ষস

পাঠক, অযোধ্যার রাজধানী ফায়েজাবাদ হইতে লক্ষ্ণৌ স্থানান্তরিত হইয়াছে। এখন আর ফায়েজাবাদে কি দেখিবে। ফায়েজাবাদে পুত্রশোকে মতী বেগম মতী মহলে বসিয়া কাঁদিতেছেন। স্বামী-শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে পতিপ্রাণা বউবেগম রাজ্যনাশের আশঙ্কা করিয়া সর্বদাই খাসমহলে নানা চিন্তা করিতেছেন। এখানে এখন আর দেখিবার কিছুই নাই।

মাতৃ-শাসন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার নিমিত্ত হীন-বুদ্ধি নবাব আসফউদ্দৌলা লক্ষ্ণৌ নগরে রাজধানী সংস্থাপন করিয়াছেন। মাতুর্জা খাঁর মৃত্যু হইয়াছে। অর্থলোভী অকৃতজ্ঞ নির্লজ্জ হায়দরবেগ খাঁ নবাবের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এদিকে নবাবের রাজ্যের যে-কিছু রাজস্ব আদায় হইত,

* Cossim Ally Khan is at last dead and buried. His demsie was at Delhi, on the 29th of the moon Rabyal Sany that is on the 6th June 1877. —Asiatic Annual Register for 1800, Miscellaneous tracts, p. 36.

† It is said he died in great misery, and his last shawl was sold to pay for his winding sheet.—Asiatic Annual Register for 1800, Miscellaneous tracts, p. 35.

তৎসমুদয়ই লক্ষ্ণৌবাসী ইংরাজদিগের ব্যয় নির্বাহার্থ এবং সেই সকল ইংরাজ ও ইংরাজ রমণীদিগকে উপহার প্রদানার্থ ব্যয় হইতে লাগিল। নবাবের অন্যান্য বৈমাত্র ভ্রাতা ভগ্নীর পেন্‌সন্‌ পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গেল। নবাবের রাজকোষ একেবারে অর্থশূন্য হইয়া পড়িল। এ দিকে ইংরাজ সৈন্যের ব্যয় নির্বাহার্থ নবাব ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে যে দুই লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাসে মাসে দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন তাহাও বাকী পড়িল। ১৭৭৭ সালে হেস্টিংস আর একদল সৈন্য অযোধ্যায় রাখিলেন। তাহার খরচও নবাবকে বহন করিতে হইল *। কলিকাতা কৌন্সিল সেই টাকার নিমিত্ত নবাবকে বারম্বার লিখিতে লাগিলেন। নবাব দেখিলেন যে কোনোক্রমে ইংরাজদিগের দাবীকৃত টাকা পরিশোধ করিবার তাঁহার সাধ্য নাই। তিনি অনন্যোপায় হইয়া গবর্নর জেনেরল ওয়ারেন হেস্টিংসের নিকট পত্র লিখিলেন,—

'আমার কর্মচারিগণ যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় করিতেছে, তদ্দ্বারা কোনো প্রকারে ব্যয় নির্বাহ হয় না। আমি আমার সমুদয় রাজ্য আপনার হাতে সমর্পণ করিলাম। আপনি আপনাদের ইংরাজকর্মচারী নিযুক্ত করিয়া যদি অধিক রাজস্ব আদায় করিতে পারেন করুন, তাহাতে আমার কোনো আপত্তি নাই। আমার সমুদয় রাজস্বই লক্ষ্ণৌস্থিত ইংরাজ কর্মচারিদিগের ব্যয় নির্বাহার্থ খরচ হইতেছে। কোম্পানির প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করিবার আমার সাধ্য নাই।'

হেস্টিংস নবাবের এই পত্র পাইয়া মনে করিলেন যে ইংরেজদিগকে চাকরি প্রদান করিবার এই এক বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কোর্ট অব ডিরেক্টরের মেম্বরদিগের শালা-মামা-চাচাদিগকে চাকরি জুটাইয়া দিতে পারিলে ডিরেক্টরগণও তাঁহার উপর সন্তুষ্ট থাকিবেন। এই মনে করিয়া হেস্টিংস একদল ইংরাজ কর্মচারী অযোধ্যায় প্রেরণ করিলেন। নবাবের পুরাতন কর্মচারী সকল বরখাস্ত হইলেন। কেহ কেহ ইংরাজ কর্মচারীর অধীনে থাকিয়া কার্য করিতে লাগিলেন। অযোধ্যার রাজস্ব আদায়ের ভার ইংরাজদিগের হাতে ন্যস্ত হইল। ইংরাজ কর্মচারিগণ রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করিল। দেশের প্রজাগণ এ অত্যাচারে আপন আপন সন্তান-সন্ততি পর্যন্ত বিক্রয় করিয়া দেশ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল।

হেস্টিংসের প্রেরিত এই ইংরাজ মহাপুরুষদিগের মধ্যে কর্নেল হ্যানে নামে

---

* The famous temporary Brigade.

একটা ইংরাজ ছিল। কর্নেল হ্যানে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান জজ ইলাইজা ইম্পির আত্মীয় লোক। ইলাইজা ইম্পি হেস্টিংসকে দুইবার বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। মহারাজ নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড করিয়া ইম্পি হেস্টিংসের মান সম্ভ্রম বজায় রাখিয়াছেন। আবার হেস্টিংস সাহেবের ইস্তফাপত্র সম্বন্ধীয় গোলোযোগের সময় ইম্পিই হেস্টিংসের পক্ষাবলম্বন করিয়া তাঁহাকে পদে বাহাল রাখিয়াছেন। ইলাইজা ইম্পির নিকট হেস্টিংস চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং ইম্পির একজন আত্মীয়ের অন্নের সংস্থান করিয়া না দিলে চলে না। হেস্টিংস ইম্পির আত্মীয় কর্নেল হ্যানকে অযোধ্যায় প্রেরণ করিলেন। হ্যানে সৈনিক পুরুষের পদ প্রাপ্ত হইয়া অযোধ্যায় আসিল। কিন্তু সে পদের বেতন তত অধিক ছিল না। কর্নেল হ্যানে অযোধ্যায় আসিয়াই অযোধ্যার অন্তর্গত গোরক্‌পুর এবং বেরুচ এই জেলায় ইজারাদার হইল। এই দুই জেলার রাজস্ব আদায়ের ভার কর্নেল হ্যানের হস্তে ন্যস্ত হইল। কিন্তু রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে কর্নেল হ্যানে যেরূপ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল, তাহা বর্ণন করিতে লেখনী অগ্রসর হয় না। বঙ্গদেশের রংপুর, দিনাজপুর এবং পুর্ণিয়ার রাজস্ব আদায়ে উপলক্ষে দেবীসিংহ এবং গুড্‌ল্যাড্‌ সাহেব যে অত্যাচার করিয়াছিল সে অত্যাচার অপেক্ষাও শতগুণে অধিকতর ভয়ানক অত্যাচারানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

* * * * * * * * *

হাফেজ-নন্দিনীর শোণিতানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। গোরক্‌পুর এবং বেরুচই সর্বাগ্রে এ শোণিতানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। সেখানে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এখন আর কোনো বিভিন্নতা নাই। স্ত্রী-পুরুষ সমুদয় শরবিদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় চীৎকার করিতেছে।

নরপিশাচ রাক্ষস-প্রকৃতি কর্নেল হ্যানে রাজস্ব আদায় উপলক্ষে শত শত জমিদার এবং প্রজাকে লৌহ পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া বৈশাখ মাসের প্রচণ্ড সূর্যোত্তাপে রাখিয়া দিয়াছে। কর্নেল হ্যানের কয়েদ ঘরে অনাহারে সহস্র সহস্র লোক মরিয়া যাইতেছে, প্রহারে চীৎকার করিতেছে। এই হতভাগ্য কারারুদ্ধ কয়েদিগণ অপেক্ষা অত্যাচারের প্রারম্ভে যাহারা সন্তানাদি বিক্রয় করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদিগকে পরম ভাগ্যবান বলিতে হইবে। সন্তানাদিসহ এখন তো আর তাহাদিগকে এত কষ্ট এত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে না। হয়তো এখন তাহারা জঙ্গলে জঙ্গলে আপন আপন স্ত্রী এবং অবিক্রীত সন্তানাদি-

সহ বিচরণ করিতেছে ও বন্য ফলমূল আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে। মঙ্গলময় পরমেশ্বর সে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যেও অপার দয়াগুণে তাহাদের জীবন ধারণের জন্য ফলমূল সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু এ কারারুদ্ধ হতভাগ্যদিগের যন্ত্রণা একেবারে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদিগের যন্ত্রণা দেখিয়া, ইহাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-সন্তান-সন্ততি-আত্মীয়-স্বজন যাহারা এখন পর্যন্তও কারারুদ্ধ হয় নাই সকলেই অস্ত্রধারণ করিল। স্ত্রী পতির জন্য, মাতা সন্তানের জন্য; ভগ্নী ভ্রাতার জন্য—অস্ত্র ধারণ করিয়া দুরাত্মা কর্নেল হ্যানে এবং তাহার সহচর ইংরাজদিগের শিরশ্ছেদন করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইল। বেরুচ এবং গোরক্ষপুরে রাজবিদ্রোহ হইয়াছে বলিয়া ইংরাজগণ চীৎকার করিতে লাগিল।

কে বলে ইহাকে রাজবিদ্রোহ? দস্যুর হস্ত হইতে স্ত্রী আপন স্বামীকে রক্ষা করিবে, স্বামী স্ত্রীকে রক্ষা করিবে, মাতা পুত্রকে রক্ষা করিবে, পুত্র বৃদ্ধা জননীকে রক্ষা করিবে ইহার নাম কি রাজবিদ্রোহ? সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ন্যায়-পরায়ণ প্রজাবৎসল শ্রীরামচন্দ্র কিম্বা আকবর সদৃশ রাজার বিরুদ্ধে যে অস্ত্রধারণ করে সেই কেবল রাজবিদ্রোহী। সেই কেবল দণ্ডনীয়।

পাঠক! তোমার ইচ্ছা হয় তুমি ইহাদিগকে রাজবিদ্রোহী বল। কিন্তু কর্নেল হ্যানের শিরশ্ছেদনাভিলাসিনী গোরক্ষপুর ও বেরুচের এই অনাথা রমণী-দিগকে আমি কখনোও রাজবিদ্রোহিনী বলি না। ইহারা শুদ্ধ কেবল আত্ম-রক্ষায় অধিকার পরিচালন করিতেছে। পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বর হইতে শরীর রক্ষার্থে,স্বামী পুত্র রক্ষার্থে যে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে—যে অধিকার হইতে মানুষকে কোনো পার্থিব রাজা বঞ্চিত করিতে সমর্থ নহে, সেই অধিকারই পরিচালন করিতেছে।

কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়! কুল মান বিসর্জন করিয়া, এই অনাথা রমণীগণ যাহাদিগের নিমিত্ত আজ অস্ত্রধারণ করিয়াছে, তাহাদিগের অনেকেরই মৃত্যু হইয়াছে। বাকী যে দেড়শত কয়েদী ছিল, তাহাদিগের মধ্যে আঠার জনের শিরশ্ছেদন করিয়া কর্নেল হ্যানে এবং তাহার সহচরগণ তাহাদিগের দেহ-শূন্য মস্তক কয়েকটা এই অস্ত্রধারিণী রমণীগের দিকে নিক্ষেপ করিল *।

* As rebellion, however, and as a rebellion of the most unprovoked kind, it was treated by Colonel Hannay; and to one instance of the means taken for suppressing it, as proved by evidence before your Lordship· I will

রমণী-হৃদয় বড় কমল। রমণী-হৃদয় স্নেহে পরিপূর্ণ। ভারত রমণী প্রহার সহ্য করিতে পারে, অন্ন কষ্ট সহ্য করিতে পারে, দারিদ্র্য ক্লেশ সহ্য করিতে পারে, যত প্রকার ত্যাগস্বীকার পৃথিবীতে আছে, সকলই তাহাদের সহ্য হয়; কিন্তু পতি-পুত্রের শোক কখনো সহ্য করিতে পারে না। ভারত-রমণী যদি পতি-শোক সহ্য করিতে সমর্থা হইতেন তবে তিনি সহমৃতা হইবেন কেন?

অবলার যে দুর্বল হস্ত পতি-পুত্রের উদ্ধারের আশা সবল করিয়াছিল, উত্তেজিত করিয়াছিল, পতি-পুত্রের দেহশূন্য মস্তক দর্শন মাত্র সে হস্ত অবশ হইয়া পড়িল, হস্তস্থিত অস্ত্র ভূমিতলে নিপতিত হইল। পতি-পুত্র-শোকে রমণীগণ ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলশায়িনী হইলেন। কর্নেল হানে নিরপরাধী লোকের শিরশ্ছেদন করিয়া অন্যকার বিদ্রোহ এইরূপে নিবারণ করিল।

কিন্তু গোরকপুর এবং বেরুচের এ আগুন শীঘ্র শীঘ্র নির্বাণ হইল না। এ হাফেজ-নন্দিনীর শোণিতসম্ভূত অনল। সমুদয় অযোধ্যা ভস্মীভূত না করিয়া এ অনল নির্বাণ হইবে না।

প্রজাবৎসল জায়গিরদার রাজা মস্তফা খাঁ * এবং রাজা খিছুসিংহ কারারুদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। সহস্র সহস্র প্রজা অস্ত্র-শস্ত্র হাতে করিয়া কর্নেল হানের শিরশ্ছেদন করিতে আসিয়াছেন। আবার প্রজাদিগের পশ্চাতে হস্তী-পৃষ্ঠে সীতাসদৃশী এক অবগুণ্ঠনবতী অস্ত্র হাতে আসিতেছেন। ঠিক যেন চন্দ্রাননা জনকতনয়া বৈদেহী শতস্কন্ধ রাবণ বিনাশার্থ সংগ্রামক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালন করিতেছেন।

---

just beg leave to call your attention. One hundred and fifty of the inhabitants had been shut up in one of the mud forts; the people of the country in their rage attacked the fort and demanded the prisoners; they called for their brothers, their fathers and their husbands, who were confined there. It was attacked by the joint assualt of men and women. The man who commanded in the fort immediately cut off the heads of eighteen of the principal prisoners, and tossed them over the battlements to the assailants.—Burke's Speech, vol-II, p. 142.

* There happened to be a prisoner in the fort, a man liked and respected in his country, and who, whether justly or unjustly, was honoured and much esteemed by all the people. "Give us our Rajah Mustapha Khan cried out assailants.... (Colonel Hannay sends a Captain William who beheaded Rajah Mustapha Khan) upon this the rebellion blazed with tenfold fury, and the people declared they would be revenged for the destruction of their zemindars.

এ অবগুণ্ঠনবতী কে * ? আবার কি সেই রমণীশ্রেষ্ঠ ভগবতী হৈমবতী গিরি-নন্দিনী অসুর বধার্থ সিংহপৃষ্ঠে সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন ?

এ গিরি-নন্দিনী নহেন। তিনি হইলে নিশ্চই সিংহারোহণে আসিতেন। এ অন্নপূর্ণা সদৃশী রাজা মস্তফা খাঁর সহধর্মিনী, বেরুচের রানী। প্রজাদিগকে অন্নপ্রদান না করিয়া, দরিদ্র এবং দুঃখীদিগকে অন্ন বিতরণ না করিয়া, ইনি নিজে কখনোও আহার করেন না। সেই জন্যই এত প্রজা আজ রাজা মস্তফা খাঁর উদ্ধারার্থ প্রাণবিসর্জন করিতে আসিয়াছে। স্বয়ং রানী তাহাদিগের পশ্চাতে থাকিয়া, তাহাদিগকে সংগ্রামক্ষেত্রে পরিচালন করিতেছেন।

প্রজাগণ কারাগারের নিকট পৌছিবামাত্র কর্নেল হানের আদেশ অনুসারে তাহার অনুচর নরপিচাশ কাপ্তেন উইলিয়াম রাজা মস্তফা খাঁর শিরশ্ছেদন করিয়া ছিন্ন মস্তক ইহাদিগের দিকে নিক্ষেপ করিল। দুর্বৃত্ত হানে এবং দুরাত্মা উইলিয়াম মনে করিয়াছিল যে পূর্বদিনের ন্যায় ছিন্নমস্তক দর্শনেই প্রজাগণ চলিয়া যাইবে। কিন্তু ইহাতে প্রজাগণের ক্রোধানল শতগুণে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

'আমাদের রাজার জন্য এ প্রাণ বিসর্জন করিতে হইবে, আমাদের রানীমার জন্য প্রাণ দিতে হইবে'—এই চিৎকার শব্দে আকাশ পরিপূর্ণ হইল।

ক্রমে দুই-তিন বৎসর পর্যন্ত বেরুচ এবং গোরক্‌পুরে প্রজাগণ সংগ্রাম-ক্ষেত্রে প্রাণবিসজন করিতে লাগিল, প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া সমরে প্রবেশ করিতে লাগিল। ধন্য বেরুচের প্রজাগণ, ধন্য বেরুচের রানী ; স্বার্থপরতা এবং কাপুরুষতা বিসর্জন করিয়া অত্যাচারের অবরোধ করিতে যাহারা কৃতসঙ্কল্প হয়, স্বর্গের দ্বার তাহাদিগের নিমিত্ত চিরকালই উন্মুক্ত রহিয়াছে। স্বর্গের রাজাধিরাজ সন্তানবৎসল পরম পিতা, স্নেহময়ী জননী তাহাদিগের নিমিত্ত আপন ক্রোড় প্রসারণ করিয়া বসিয়া আছেন।

রাজা মস্তফা খাঁর স্ত্রী স্বয়ং প্রজাদিগকে সংগ্রামক্ষেত্রে পরিচালন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। কিন্তু কতদূর সত্য তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

ষষ্ঠবিংশতিতম অধ্যায়

পথভ্রান্ত পথিক

এ সংসারে সকলেই বড় লোকের কথা বলে, ধনী লোক দেখিলে আদর করে। গরিব দীন দরিদ্রকে কেহ ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে না। গরিবের নাম কেহ মুখে আনে না। গরিব এবং দীন দরিদ্রের নাম সকলে ভুলিয়া যায়। আমরাও এই সংসারের লোক। নবাব, বেগম, রাজা এবং জমিদারদিগের কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া, দীন-দুঃখী বাণেশ্বর ভট্টাচার্যকে একেবারে বিস্মৃত হইয়াছি।

পাঠক পাঠিকাগণ বোধহয় পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে বাণেশ্বরের নাম পাঠ করিয়া বলিয়া উঠিবেন—'একি অসম্ভব কথা। পূর্ব বাংলার বিক্রমপুরের একটা ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ শত বৎসর পূর্বে হাইদ্রাবাদ, পুনা প্রভৃতি প্রদেশ ভ্রমণ করিয়াছিল। এ কথা যে বিশ্বাস করিতে পারে সে হনুমানের যে শত যোজন সুদীর্ঘ লেজ ছিল তাহাও বিশ্বাস করিতে পারে। বিক্রমপুরের ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ কীর্তিনাশানদী পার হইবার সময়েই প্রাণের ভয়ে চীৎকার করেন। তিনি শতবৎসর পূর্বে হাইদ্রাবাদ রোহিলখণ্ড প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন ?

কিন্তু চিন্তাশীল পাঠক, এ সংসারের কার্য-কলাপ এবং অবস্থার বিষয় একটু চিন্তা কর। তাহা হইলে আর বাণেশ্বরের দেশ পর্যটনের কথা তোমার নিকট অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে না। সংসারে ঘটনাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে যে কোথাকার লোক কোথায় চলিয়া যায়, তাহা কি কেহ নির্ণয় করিতে পারে ? বাণেশ্বর ইচ্ছা করিয়া দেশ ভ্রমণ করিতেছেন, একথা বলিলে অবশ্যই অসম্ভব বোধ হইত। কিন্তু বাণেশ্বর সংসারের দুর্ঘটনার স্রোতে ভাসিতেছেন। বাণেশ্বর অমরসিংহের পিতা। গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জন করিতে গিয়াছিলেন। কোনো ঘটনা সংযোগে তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। পুত্র কন্যার শোকে পাগল হইয়া তিনি এখন নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেছেন। ইহার পক্ষে হাইদ্রাবাদ প্রভৃতি দেশ পর্যটন করা কি অসম্ভব কথা ?

পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে, যে, রোহিলাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে বাণেশ্বর শ্রীনিবাস পণ্ডিতের নিকট হইতে বিদায় লইয়া রোহিলখণ্ডে গমন

করেন। রোহিলাযুদ্ধের সময় বাণেশ্বর রোহিলখণ্ডে ছিলেন। রোহিলাযুদ্ধে হাফেজ রহমত খাঁর বীরত্ব দর্শনে এবং যুদ্ধাবসানে রোহিলা-রমণীদিগের দুরবস্থা দেখিয়া, বাণেশ্বরের হৃদয়স্থিত মৃতপ্রায় গুণগ্রাহিতা এবং সহানুভূতি উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। ইহাতেই বাণেশ্বরের ক্ষিপ্তাবস্থা দূর হইল।

মানব মন বিবিধ যন্ত্রে গঠিত। সেই সমুদয় যন্ত্র একত্র হইয়া যখন কার্য করে তখনই মানুষ প্রকৃতিস্থ থাকে। আর অন্যান্য সমুদয় যন্ত্রের কার্য রহিত হইয়া, যখন কেবলমাত্র দুই-একটা যন্ত্র কার্য করিতে থাকে, তখনই মানুষ পাগল হয়। অর্থাৎ একটা প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া মানুষ যখন কেবল বিষয় বিশেষের দিকে ধাবিত হয়, অন্য কোনো বিষয়ে সে মনোনিবেশ করিতে পারে না, তখন সকলেই তাহাকে পাগল বলে। সে বিষয় বিশেষের জন্য পাগল হইয়া পড়ে। কিন্তু একটা প্রবৃত্তির কার্যাধিক্য যখন অন্যান্য প্রবৃত্তির দ্বারা সংযত হয়, তখন আর লোক বিষয় বিশেষের নিমিত্ত পাগল হইতে পারে না, তখন সে প্রকৃতিস্থ থাকে। চিন্তা করিয়া দেখিলে অতি সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, এ সংসারে প্রায় সমুদয় লোকই পাগল। কৃপণ ধন সঞ্চয় করিবার নিমিত্ত পাগল, যশোলিপ্সু যশের জন্য পাগল; সহস্র সহস্র লোক পদ-প্রভুত্বের নিমিত্ত পাগল হইয়া রহিয়াছে। তবে সংসারের অধিকাংশ লোক যে সকল বিষয় লাভ করিবার নিমিত্ত পাগল হইয়া রহিয়াছে, সে বিষয় লাভ করিবার জন্য লোক পাগল হইলেও তাহাকে কেহ পাগল বলে না। তাহাকে সকলেই বুদ্ধিমান বলে। কিন্তু যে বিষয়ের নিমিত্ত জনসাধারণকে পাগল হইতে দেখা যায় না, তাহার জন্য যে ব্যক্তি পাগল হয়, তাহাকেই লোকে পাগল বলে। দল ছাড়া হইয়া সেই কেবল ধরা পড়ে।

* * * * * * * *

বাণেশ্বরের অন্তরে সমুদয় মানবমণ্ডলীর উপর একটা ঘোর বিদ্বেষের ভাব উপস্থিত হইয়াছিল। সেই বিদ্বেষের ভাব তাঁহার অন্তরস্থিত দয়া, মায়া, স্নেহ,—সমুদয়ই বিনাশ করিয়াছিল। সুতরাং বাণেশ্বর পাগল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু হাফেজ রহমতের বীরত্ব দর্শনে বাণেশ্বরের হৃদয়স্থিত মৃতপ্রায় গুণগ্রাহিতা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তৎপরে যুদ্ধাবসানে রোহিলা-রমণীদিগের চীৎকার ও আর্তনাদ শ্রবণে বাণেশ্বরের হৃদয়ে আবার দয়া মায়া পুনরুজ্জীবিত হইল। বাণেশ্বরের মন হইতে সে বিদ্বেষের ভাব হ্রাস হইতে লাগিল। তিনি ক্রমে ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলেন। কখনো ও কখনোও ইংরাজ সৈন্যের আক্রমণ হইতে

কোনো স্ত্রীলোককে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত তাঁহার ইচ্ছা হইত, কিন্তু তাঁহার শরীরে একেবারেই বল নাই, সুতরাং কাহারও সাহায্য করিতে পারিতেন না।

একদিন একটি ষোড়শবর্ষীয়া ক্ষত্রিয় কন্যাকে একটা মুসলমান সিপাহী ধরিয়া লইয়া চলিল। যুবতীর বৃদ্ধা মাতা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ক্রন্দন করিতে করিতে চলিলেন। বাণেশ্বর বৃদ্ধাকে এইরূপ আর্তনাদ করিতে দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত কষ্টানুভব করিতে লাগিলেন। তিনি আর আত্মসংযম করিতে পারিলেন না, দ্রুতপদে যাইয়া সিপাহীকে আক্রমণ করিবামাত্র সিপাহী তরবারি দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিল। তিনি মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া রহিলেন। বৃদ্ধা জননীও সিপাহী কর্তৃক আহত হইয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। সিপাহী যুবতীকে বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া গেল। বৃদ্ধা রমণীর গাত্রে কোনো অস্ত্রাঘাত লাগে নাই, তিনি কিছুকাল পরে চৈতন্যলাভ করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার কন্যাকে লইয়া সিপাহী চলিয়া গিয়াছে, আর এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহার উপকারার্থে আসিয়া অস্ত্রাঘাতে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছেন। ক্ষত্রিয় রমণীদিগের ব্রাহ্মণের প্রতি অত্যন্ত ভক্তি। বৃদ্ধা রমণী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, হায় আমার উপকারার্থে সিপাহীকে আক্রমণ করিয়া এই ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইল। তিনি গ্রামস্থ আর দুই-একটি স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া আনিয়া, মৃতপ্রায় বাণেশ্বরকে আপন গৃহে লইয়া গেলেন। বাণেশ্বরের মৃত্যু হয় নাই বৃদ্ধা দুই-তিনমাস বাণেশ্বরের সেবা-শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে পুনর্জীবিত করিল। বৃদ্ধা আপন আত্মীয়ের ন্যায় বাণেশ্বরের পরিচর্যা করিতে লাগিল। বাণেশ্বরের হৃদয়স্থিত সদ্ভাব ইহাতে আরও উত্তেজিত হইল। তিনি আরোগ্য লাভ করিয়াই বৃদ্ধাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার কন্যার অনুসন্ধানে অযোধ্যায় চলিলেন। ইহারা মনে করিলেন যে সিপাহী হয় তো যুবতীর ধর্মনাশের চেষ্টা করিয়া পরে ছাড়িয়া দিবে। অনেক রমণীদিগকে এই প্রকারে ছাড়িয়া দিয়াছিল। এইরূপ চিন্তা করিয়া ইহারা ফয়েজাবাদে যাত্রা করিলেন। দশ-বার দিনের মধ্যেই ফয়েজাবাদে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং ছয়-সাতমাস কাল ইহারা স্থানে স্থানে যুবতীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে একদিন অকস্মাৎ একখানি ভদ্রগৃহের দ্বারে সেই যুবতীকে দেখিতে পাইয়া, বাণেশ্বর এবং তাহার বৃদ্ধা জননী দৌড়িয়া তাহার নিকটে গেলেন। যুবতী আপন জননীকে দেখিয়া যারপর-নাই আনন্দ লাভ করিল। কিন্তু সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, যে ক্ষত্রিয় সিপাহী নরপিশাচের হস্ত হইতে তাহার ধর্ম রক্ষা করিয়াছেন, আজ দুইদিন হইল

তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার সমুদয় অর্থ-সম্পত্তি তিনি মৃত্যুকালে তাহাকে দিয়া গিয়াছেন।

কন্যার মুখে এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা জননীর প্রথমতঃ সন্দেহ হইল যে, হয় তো তাহার কন্যা সিপাহীর নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছে; কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তাহা নহে। এ যুবতীর বিলক্ষণ ধর্মাধর্ম জ্ঞান ছিল। তিনি জননীর সন্দেহ দূর করিবার নিমিত্ত সমুদয় অবস্থা তাহার নিকট বলিলেন।

যে মুসলমান সিপাহী এই যুবতীকে ধৃত করিয়া আনিয়াছিল, সে বাণেশ্বরকে আঘাত করিবামাত্র একজন ক্ষত্রিয় সিপাহী তাহাতে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে ইহাদের উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত বিবাদ উপস্থিত হইল। ক্ষত্রিয় সিপাহী সক্রোধে মুসলমানকে এক পদাঘাত করিলেন। মুসলমানও তাঁহাকে আক্রমণ করিল। অবশেষে সেই ক্ষত্রিয় মুসলমান সিপাহীকে প্রহার করিতে করিতে একেবারে মৃতপ্রায় করিলেন।

মুসলমান পরাস্ত হইলে পর এই যুবতী ক্ষত্রিয় সিপাহীর পদতলে পড়িয়া। বলিল,—'বাবা তুমি আমার পিতা। আমার ধর্ম-রক্ষার ভার তোমার হাতে।'

অনেকে মনে করেন যে সিপাহী হইলে সে দুর্দ্দান্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু এটি স্পষ্ট ভ্রম। পৃথিবীর অন্যান্য লোকের অন্তরে যদ্রূপ দয়া ধর্ম প্রভৃতি সদ্গুণ রহিয়াছে, সিপাহীর মধ্যেও তৎসমুদয়ই পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীর অন্যান্য লোকও যদ্রূপ হাঁটে, চলে, খায়,—সংগ্রামক্ষেত্র হইতে বাহির হইবামাত্র সিপাহীর মধ্যেও সেই সকল ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই ক্ষত্রিয় সিপাহী যুবতীর কাতরোক্তি শ্রবণ করিবামাত্র তাহার অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইল। সিপাহী বলিলেন,—'বাছা, তোমার কোনো ভয় নাই। আমি তোমাকে আপন কন্যার ন্যায় মনে করিব। আর তোমার জননীর নিকট আমি কল্য অপরাহ্নে তোমাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিব।' কিন্তু সিপাহী তাঁবুতে পৌঁছিবামাত্র ইহাদিগের তৎক্ষণাৎ তাঁবু ভাঙিয়া বিশুলিতে যাইবার হুকুম হইল। সিপাহী, যুবতীকে আর তাহার জননীর নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতে সমর্থ হইল না। রাত্রে এখন যুবতীকে কোথায় রাখিয়া যাইবে। এ দিকে রোহিলখণ্ডের সর্বত্রই সৈন্য বিচরণ করিতেছে। যুবতীরও একাকিনী আপন বাসস্থানে যাইতে সাহস হইল না। এই স্থান হইতে বাড়ি প্রায় দশ ক্রোশ দূর হইবে।

সিপাহী আর কোনো উপায় অবধারণ করিতে না পারিয়া, যুবতীকে সঙ্গে

করিয়া বিশুলিতে চলিল। এখানে পৌঁছিয়া দেখিল যে নবাব পূর্বেই ফায়েজাবাদে রওনা হইয়াছেন। তখন ইহারাও দুই-তিনদিন পরে ফায়েজাবাদে যাত্রা করিল। মনে করিল যে ফায়েজাবাদে যাইয়া পরে যুবতীকে তাহার মাতার নিকট রাখিয়া আসিবে। কিন্তু ফায়েজাবাদে পৌঁছিবার কিছুকাল পরেই এই সিপাহী জ্বর ও আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। কেণ্টনমেণ্টের প্রায় সকলের ব্যারাম হইতে লাগিল। সিপাহী এই যুবতীকে লইয়া বড়ই বিপদে পড়িল। এখন কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। বিশেষতঃ সঙ্গের এ স্ত্রীলোকটিকে লইয়া কেণ্টনমেণ্টের মধ্যে থাকিবার বড় সুবিধা নাই। সিপাহী তখন নবাবের প্রাসাদ হইতে পূর্বদিকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে একটি জনশূন্য ভগ্ন গৃহের মধ্যে গিয়া এই যুবতীর সঙ্গে একত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পাঠকগণের স্মরণার্থ বলিতেছি যে এই ভগ্ন গৃহেই অমরসিংহ এবং ছত্রসিংহ ফায়েজাবাদে আসিয়া অবস্থান করিতেছিল। অমরসিংহ এবং ছত্রসিংহ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার দুই-তিনদিন পরে এই সিপাহী আসিয়া যুবতীর সহিত একত্রে এই গৃহে আশ্রয় লইলেন।

প্রায় দুই-তিনমাসের মধ্যেও সিপাহী আরোগ্যলাভ করিতে পারিলেন না। বরং ক্রমেই তাঁহার রোগবৃদ্ধি হইতে লাগিল। যুবতী তাঁহাকে আপন পিতার ন্যায় সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিল। ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে ঠিক পিতা ও কন্যার সম্বন্ধই সংস্থাপিত হইল। বহু চেষ্টার পর দুইমাস মধ্যে উক্ত সিপাহীর মৃত্যু হইল।

কেণ্টনমেণ্টে এই সিপাহীর এক কনিষ্ঠ ভ্রাতাও সিপাহীর কার্যে নিযুক্ত ছিল। সিপাহীর মৃত্যুর একদিন পূর্বে এই যুবতীকে আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতার হস্তে সমর্পণ করিয়া তাহার সমুদয় অর্থ সম্পত্তির অর্ধাংশ এই কন্যাটিকে দিতে বলিল। যুবতী তাহার উপকারী সিপাহীর কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে দুই দিবস হইল এই গৃহেই রহিয়াছে। এই অবস্থায় অকস্মাৎ তৃতীয় দিন অপরাহ্ণে তাহার জননী এবং বাণেশ্বর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল।

মৃত সিপাহীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা আপন ভ্রাতার প্রদত্ত সমুদয় টাকা এই কন্যাটিকে প্রদান করিয়া, তাহাকে তাহার মাতার হস্তে সমর্পণ পূর্বক কেণ্টনমেণ্টে চলিয়া গেল।

বাণেশ্বর এবং রমণীদ্বয় দুইদিন পর্যন্ত এই ভগ্ন গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইহারা দশদিন একাদিক্রমে হাঁটিয়া এখানে আসিয়াছেন। দুই-তিনদিন বিশ্রাম না করিয়া আর ইহাদের কোথাও যাইবার সাধ্য নাই।

দুইদিন পরে যুবতী এবং তাঁহার বৃদ্ধা জননী পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, তাঁহারা আর রোহিলখণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিবেন না। রোহিলখণ্ড একেবারে অরাজক হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং তাঁহারা পরম পবিত্র তীর্থস্থান কাশীতে গিয়া বাস করিবেন। এই যুবতীর স্বামীও রোহিলাযুদ্ধেই প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন। ইঁহার পিতা এবং ভ্রাতাদিগেরও মৃত্যু হইয়াছে। এখন আর সংসারে ইঁহাদের কেহই নাই। যুদ্ধাবসানে ইঁহাদের বাড়ি-ঘর লুঠ হইয়াছে। সুতরাং কাশীতে যাইয়া বাস করিবে বলিয়াই স্থির করিলেন এবং বাণেশ্বরকেও ইঁহাদের সঙ্গে কাশীতে যাইতে অনুরোধ করিলেন। বাণেশ্বর ইঁহাদিগকে অন্ততঃ কাশী পর্যন্ত পৌছাইয়া দিতে সম্মত হইলেন।

এই তিনদিন বাণেশ্বর এবং এই রমণীদ্বয় ভগ্ন গৃহের একটি প্রকোষ্ঠের মধ্যেই বসিয়া থাকেন; ঘরের অন্যান্য প্রকোষ্ঠে বড় প্রবেশ করিতেন না। আজ কাশীতে যাইবার দিন। মৃতসিপাহী তাঁহার জিনিস-পত্র সমুদয় যুবতীকে দিয়া গিয়াছেন। এই সকল জিনিস-পত্র বান্ধিবার জন্য বাণেশ্বর গৃহের এদিক্-ওদিক্ দড়ি তল্লাশ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ এইগৃহের পশ্চিম-বারেন্দায় যাইয়া দেখিলেন যে বারেন্দার প্রাচীরের স্থানে স্থানে অঙ্গার দ্বারা বাংলা অক্ষরে কত কি লিখিত রহিয়াছে।

বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করার পর, বাণেশ্বরের চক্ষে বাংলা অক্ষর আর কোথাও পড়ে নাই। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে হয় দেবনাগর, না হয় পারস্য অক্ষরই সর্বত্র প্রচলিত। বাণেশ্বর প্রাচীরে বাংলা অক্ষর দেখিয়া নিকটে যাইয়া, যাহা লিখিত রহিয়াছে তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। একস্থানে লিখিত রহিয়াছে—

'দৃষ্ট্বা সীতাং পরামৃষ্টাং দেবো দিব্যেন চক্ষুষা।
কৃতং কার্যমিতি শ্রীমান্ ব্যাজহার পিতামহঃ॥'

ইহার নিচেই আবার লিখিত রহিয়াছে—

'হাফেজ-নন্দিনী সীতা—যে হাফেজ-নন্দিনীর ধর্মনষ্ট করিবে, সে নিশ্চয়ই মরিবে—নিশ্চই মরিবে; স্বয়ং ব্রহ্মা তাহার উদ্ধারার্থ আমাকে সাহায্য করিবেন।'

প্রাচীরের অন্য একপার্শ্বে লিখিত রহিয়াছে—

'দৃষ্ট্বা সীতাং পরামৃষ্টাং দণ্ডকারণ্য বাসিনঃ।
রাক্ষসান্ত বিনাশঞ্চ প্রাপ্তংবুদ্ধ্বা যদৃচ্ছয়া॥'

ইহার নিচে লিখিত রহিয়াছে—

'জালালউদ্দীন, এবার আর তোর নিস্তার নাই। হাফেজ-নন্দিনীকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিতে হইবে। তোর মৃত্যু আমার হাতে।'

বাণেশ্বর এই সকল পাঠ করিয়া একেবারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। ভাবিতে লাগিলেন,—

'এ কি আশ্চর্য! এই হস্তলিপি ঠিক আমার বাছা ভুবনেশ্বরের হস্তাক্ষরের ন্যায় বোধ হয়। আমার পুত্র এখানে কেমন করিয়া আসিবে? তবে কি আমার ন্যায় কোনো অভূতপূর্ব ঘটনা সংযোগে তাহারও প্রাণরক্ষা হইয়াছে? যদিই বা প্রাণরক্ষা হইয়া থাকে, তবে সে এখানে কিরূপে আসিল? পুত্রের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে আবার আমার মতিচ্ছিন্ন হইল নাকি? একি স্বপ্ন? না, যথার্থ বিষয় দেখিতেছি।'

এইরূপ চিন্তা করিয়া বাণেশ্বর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক আপনা-আপনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া উঠিলেন,—

'পরমেশ্বর, কেন তুমি সময়ে সময়ে মনোমধ্যে আবার আশার সঞ্চার করিয়া, আমার শোকানল পুনরুদ্দীপ্ত করিতেছ। আমার কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত এখনো হয় নাই?'

ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিবামাত্র বাণেশ্বরের পিতার বাক্য তাঁহার স্মৃতি-পথারূঢ় হইল। বাণেশ্বর আবার ভাবিতে লাগিলেন,—

'আমার পিতা তো একজন মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি আমার পুত্রবধূর অঙ্গের সমুদয় সুলক্ষণ দেখিয়া বলিয়া গিয়াছেন, ইহার গর্ভে ত্রিভুবনবিজয়ী পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। আমার পিতার কথা কি একেবারেই মিথ্যা হইবে? হয় তো আমার ভুবনেশ্বর জীবিত আছে। হয় তো আমার ন্যায় তাহাকেও কোনো লোক নদী হইতে উঠাইয়া থাকিবে! এ অযোধ্যায় তো কেহ বাংলা অক্ষর লিখিতে পারে না।'

বাণেশ্বর আবার সেই প্রাচীরের লিখিত শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন। শ্লোকের নিচে বাংলা ভাষায় লিখিত যে কথা কয়েকটি ছিল, তাহা আবার পড়িতে লাগিলেন। বিশেষ মনোযোগের সহিত হস্তাক্ষর পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। হস্তাক্ষর পরীক্ষা করিয়া মনে মনে আবার ভাবিতে লাগিলেন;—

'এ নিশ্চয়ই আমার পুত্রের হস্তাক্ষর। এ প্রদেশে একে তো বাংলা ভাষা প্রচলিত হয় নাই। যদি দুই-একজন লোক অল্প অল্প বাংলা শিখিয়াও

থাকে, তবে তাহাদের হস্তলিপি এই প্রকার উৎকৃষ্ট হইবে না। এ নিশ্চয়ই ভুবনেশ্বরের হস্তাক্ষর।

'কিন্তু লিখিয়াছে "হাফেজ-নন্দিনী সীতা" হাফেজ-নন্দিনী কে? হাফেজ মুসলমানের নাম। তবে কি আমার পুত্রের কোনো মুসলমান কন্যার প্রতি আসক্তি হইয়াছিল? এ অতি অসম্ভব কথা। আমার ভুবনেশ্বর ষোড়শ বৎসর বয়সের পূর্বে সকল শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল। ধর্মের প্রতি শাস্ত্রের প্রতি বাছার অটল ভক্তি। কোনো মুসলমানের কন্যার প্রতি কখনো তাহার আসক্তি হওয়া সম্ভবপর নহে। তবে ইহা আমার ভুবনেশ্বরের হস্তাক্ষর নহে। পুত্রশোকে দিন দিন আমার এই প্রকার ভ্রম উপস্থিত হইতেছে।'

আবার একটু চিন্তা করিয়াই মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—

'মুসলমান কন্যার প্রতি তাহার আসক্তি হওয়া অসম্ভব হইবে কি? তাহার এখন পূর্ণযৌবন কাল। যৌবন কাল বড় ভয়ানক। শাস্ত্র, ধর্মজ্ঞান, উন্মাদকারী-রিপু সকলের নিকট চিরকাল পরাজিত। হয় তো আমার ভুবনেশ্বর এখন জাতি, ধর্ম, সকলই বিসর্জন করিয়াছে। হা পরমেশ্বর! আমার পুত্রের শেষে এই গতি হইল। ইহা হইতে তাহার মৃত্যুই ভালো ছিল। একেবারে জাতি ধর্ম বিসর্জন করিয়াছে।

'হা পরমেশ্বর, ইহা হইতে তাহার মৃত্যুই ভালো ছিল'—এই চিন্তা অন্তরে উদয় হইবামাত্র বাণেশ্বরের চক্ষু হইতে কয়েক বিন্দু অশ্রু নিপতিত হইল। বারম্বার 'হা ঈশ্বর,'—'হা ঈশ্বর' এই শব্দ তাঁহার মুখ হইতে স্পষ্টাক্ষরে বাহির হইল।

উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে 'হা ঈশ্বর। হা ঈশ্বর!' এই কথা উচ্চারণ করিতে শুনিয়া, গৃহস্থিত সেই রমণীদ্বয় তাঁহার নিকট আসিলেন। বৃদ্ধা রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ঠাকুর গোসাই কি হইয়াছে?'

বাণেশ্বর মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

বাণেশ্বরের প্রতি বৃদ্ধা রমণীর অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং ভক্তির ভাব পূর্ব হইতেই হইয়াছে। বৃদ্ধা কাতরে বলিতে লাগিলেন,—'বাবা ঠাকুর, কি হইয়াছে বলুন। এখন আমি আপনার আপনলোক, আপনার কন্যা। আমাকে পর বলিয়া মনে করেন কেন?'

বাণেশ্বর তখন আনুপূর্বিক সমুদয় আত্মবিবরণ বৃদ্ধা এবং তাঁহার কন্যার নিকট বলিলেন। প্রাচীরে লিখিত শ্লোক বৃদ্ধাকে দেখাইয়া বলিলেন,—'এই হস্তলিপি আমার পুত্রের হস্তাক্ষরের ন্যায় দেখা যায়।'

বৃদ্ধা বলিলেন,—'তবে নিশ্চয়ই আপনার পুত্র জীবিত আছেন। না হয় আমরা চারি-পাঁচমাস অপেক্ষা করিয়া কাশীতে যাইব। আপনি এখানে পুত্রের অনুসন্ধান করুন। আমরা এখানে আপনার সঙ্গেই থাকিব।'

বাণেশ্বর বলিলেন,—'এখন আর অনুসন্ধান করিলে কি হইবে? আমার পুত্র বোধহয় স্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছে। হাফেজ-নন্দিনী সীতা,—জলাল-উদ্দীন এবার আর তোমার নিস্তার নাই। এই সকল কথা দ্বারা স্পষ্টই বোধ-হয় যে, একটা মুসলমান-কন্যাকে লইয়া জলালউদ্দীন এবং আমার পুত্রের সঙ্গে বিবাদ হইতেছিল। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে আমার পুত্র সেই হাফেজ-নন্দিনীর জন্য পাগল হইয়াছিল।'

বৃদ্ধা বলিল,—'যদি মুসলমান কন্যার উপরই আপনার পুত্রের আসক্তি হইয়া থাকে, তবে সে জন্য কেন পুত্রকে পরিত্যাগ করিবেন? আহা পুত্রকে কি কেহ পরিত্যাগ করিতে পারে? আমার তিনপুত্র যুদ্ধে মরিয়া গিয়াছে। (ক্রন্দন করিতে করিতে) তাহারা মুসলমান বিবাহ করিয়াও যদি বাঁচিয়া থাকিত, আমি তাহাদিগের সঙ্গে থাকিতাম।'

বৃদ্ধা পরে আবার কন্যাকে দেখাইয়া বলিল,—'আমার বাছাকে মুসলমান সিপাহী ধরিয়াছিল। সে নিষ্ঠুর মুসলমান যদি বলপূর্বক আমার কন্যার ধর্ম নষ্ট করিত, তথাপি আমি কন্যাকে পরিত্যাগ করিতাম না। আমার কন্যার কি দোষ হইত? ডাকাতে ডাকাতি করিলে কে কি করিতে পারে?'

এ সংসারে হৃদয়ের সত্তাই বোধহয় শুভবুদ্ধি প্রদান করে। এই অশিক্ষিতা বৃদ্ধাই আজ বাণেশ্বরকে সদুপদেশ প্রদান করিতে সমর্থা হইলেন। বৃদ্ধার কথা শুনিয়া বাণেশ্বর স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। মনোমধ্যে তাঁহার নানা চিন্তা উপস্থিত হইতে লাগিল। কিছুকাল পরে বাণেশ্বর যেন মোহনিদ্রা হইতে জাগ্রত হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—'বৃদ্ধা ঠিক কথাই বলিয়াছে। কেন বা আমি স্ত্রী, কন্যা এবং পুত্রকে আত্মহত্যা করিতে বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম? যে বাঁদীকে তাহাদিগের নিকট আত্মহত্যার কথা বলিবার জন্য পাঠাইয়াছিলাম, তাহার সঙ্গে আমার স্ত্রীর সাক্ষাৎ হইয়া থাকিলে, তিনি নিশ্চই আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। তিনি তো স্বামীর আজ্ঞা কখনোও লঙ্ঘন করিতেন না। কেনই বা পুত্র ও জামাতাকে আমার সঙ্গে একত্রে আত্মহত্যা করিতে বলিলাম। ভুবন আমার তখন ষোড়শ বৎসরের বালক। ভুবনের আর কি তখন আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা ছিল? বাছা

পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে না বলিয়াই আত্মহত্যার নিমিত্ত গঙ্গায় ঝাঁপ দিল। সকলই আমার দোষ। শ্রীনিবাস পণ্ডিতের কথা মিথ্যা নহে। নিজের পাপ না থাকিলে কেহ কষ্ট ভোগ করে না।'

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, বাণেশ্বর উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিল,—'আমি ঘোর পাপী, ঘোর নারকী, তাই এ জীবনে এত কষ্ট পাইতেছি।'

বৃদ্ধা ক্ষত্রিয় রমণী বাণেশ্বরকে সান্ত্বনা করিয়া আবার বলিল,—'ঠাকুর গোসাই বাবা ঠাকুর, আজ হইতেই চলুন আমরা তিনজনেই এখানকার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া আপনার পুত্রের অনুসন্ধান করি। আপনি যেরূপ ধার্মিক, পরমেশ্বর আপনার পুত্রকে অবশ্য আপনার ক্রোড়ে আনিয়া দিবেন।'

বাণেশ্বর তখন আবার মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—

'বৃদ্ধা ভালো কথাই বলিয়াছেন। না হয় আমার পুত্র মুসলমানের কন্যা বিবাহ করিয়াছে। পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে আমি কখনোও তাহাকে পরিত্যাগ করিব না। সে মুসলমান-কন্যাকেই আমি পুত্রবধূ বলিয়া মনে করিব। সে মুসলমান-নন্দিনীকেই আমি কন্যার ন্যায় স্নেহ করিব। আমার সকলই গিয়াছে। আমার আর এখন জাত-মান কি?'

বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন,—

'মা, তুমি ভালো কথাই বলিয়াছ। প্রাচীরেও লিখিত রহিয়াছে, হাফেজ-নন্দিনী সীতা। সে মুসলমান-কন্যা যদি সীতার ন্যায় সচ্চরিত্রা হয়, তবে কেন আমি তাহাকে পুত্রবধূ বলিয়া স্নেহ করিব না? আমার পুত্রের আমি অনুসন্ধান করিব। তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, তাহার সঙ্গে একত্রে থাকিব। আমার তো আর স্বদেশীয় বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে কখনোও সম্মিলন হইবে না।'

এই প্রকার স্থির করিয়া, বাণেশ্বর এই বৃদ্ধা রমণী এবং তাঁহার কন্যাকে লইয়া, ভগ্নগৃহে প্রায় ছয়মাস কাল বাস করিতে লাগিলেন মৃত সিপাহী বৃদ্ধার কন্যাকে প্রায় পাঁচ-ছয়হাজার টাকা দিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং ইঁহাদের খরচ-পত্রের কোনো অভাব হইল না। ছয়মাস পর্যন্ত বাণেশ্বর ফায়েজাবাদের ঘরে ঘরে এবং প্রত্যেক লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—'হাফেজ-নন্দিনী কোথায় থাকেন, বাছা তোমরা কেহ বলিতে পার? ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য নামে কোনো ব্যক্তি এখানে কখনো ছিল? জালাউদ্দিনকে তোমরা কেহ চেন?'

ফায়েজাবাদের কোনো লোক এই সকল প্রশ্নের উত্তরে কিছুই বলিতে পারিত

না। জলালউদ্দীন নামে চারি-পাঁচজন লোক ফায়েজাবাদে ছিল। তাহাদের ঠিকানা কোনো কোনো লোক বলিবামাত্র বাণেশ্বর ক্রমে ক্রমে তিন-চারিজন জলালউদ্দীনের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন,—'বাপু হাফেজ-নন্দিনী কে এবং তিনি কোথায় আছেন বলিতে পার ?'

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া, জলালউদ্দীন নামক মুসলমানেরা হাসিয়া উঠিত— সকলেই মনে করিত হাফেজ-নন্দিনী এই এক আশ্চর্য নাম।

বস্তুতঃ হাফেজ রহমত খাঁর কন্যার যে কি নাম ছিল, তাহা ফায়েজাবাদে কেহই জানিত না। কোনো ইতিহাসেও কথনোও সে নাম উল্লিখিত হয় নাই। অমরসিংহ ছত্রসিংহের সঙ্গে প্রথম কথা বলিবার সময় হাফেজ রহমত খাঁর কন্যাকে হাফেজ-নন্দিনী বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, সেই জন্যই এই উপন্যাসে আমরা তাঁহাকে হাফেজ-নন্দিনী নাম প্রদান করিয়া পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিয়াছি। কিন্তু তাঁহাব নাম কি ছিল, তাহা আজ পর্যন্ত কেহ জানে না। সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহিলাদিগেব প্রকৃত নাম সহজে কাহারও জানিবার সাধ্য নাই।

বাণেশ্বব ছয়মাস অনুসন্ধান করিয়াও পুত্রেব ঠিকানা করিতে পারিলেন না। একদিন কেণ্টনমেণ্টের একটা ক্ষত্রিয় সিপাহীর নিকট হাফেজ-নন্দিনীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিবামাত্র সে বলিল,—'হাফেজ-নন্দিনী নামে কোনো স্ত্রীলোক নাই। কিন্তু হাফেজ-নন্দিনী এই কথাটা একবার আমি পূর্বেও শুনিয়াছি। ছত্রসিংহ নামে আমাদের রেজিমেণ্টে একজন বৃদ্ধ সিপাহী ছিল। সে আর নেহালসিংহেব পুত্র অমরসিংহ, ইহারা দুইজনে ফায়েজাবাদের নবাবের কন্যাকে হাফেজ-নন্দিনী বলিত। ফায়েজাবাদের নবাবের স্ত্রী ও কন্যাকে ধৃত করিবার সময় তাহারা দুইজন আমাদের সঙ্গে ছিল।'

বাণেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন যে সে ছত্রসিংহ কোথায় আছে ? সিপাহী বলিল,—'এখন সে কোথায় আছে তাহা বলিতে পারি না। গোরকপুরে একদল সিপাহী চলিয়া গিয়াছে। তাহারা বোধহয় সেই রেজিমেণ্ট-ভুক্ত হইয়াছে। তুমি গোরকপুরে তাহাদের অনুসন্ধান কর। আমি নিশ্চই ইহার অধিক আর কিছু জানি না।'

বাণেশ্বর ভগ্নগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া, বৃদ্ধা এবং তাঁহার কন্যার নিকট বলিলেন যে বোধহয় গোরকপুরে চলিয়া গেলে আমার পুত্রের অনুসন্ধান পাইতে পারিব। তোমাদিগকে সঙ্গে করিয়া সেখানে যাইতে সাহস হয় না।'

বৃদ্ধা বলিলেন,—'বাবাঠাকুর তবে আমাদিগের দুইজনকে আপনি কাশীতে

রাখিয়া, একাকী গোরক্‌পুরে চলিয়া যাইবেন। আপনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আপনার কেহ কোনো অনিষ্ট করিবে না কিন্তু আমার কন্যা যুবতী। তাহাকে সঙ্গে করিয়া সেখানে গেলেও বিপদ ঘটিতে পারে। আর এখানেও বিপদের আশঙ্কা রহিয়াছে।'

কিন্তু এ সংসারে মানুষের স্বার্থপরতার ন্যায় শত্রু আর নাই। বাণেশ্বর আপন পুত্রের অন্বেষণে গোরকপুর যাইবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আর ইহাদিগকে কাশীতে পৌছাইয়া দেওয়ার ইচ্ছা হইল না। তিনি বৃদ্ধাকে বলিলেন,—'এখান হইতে কাশী অনেক দূর নহে। জৌনপুরের রাস্তা দিয়া তিন-চারিদিনের মধ্যেই তোমরা দুইজন কাশীতে পৌছিতে পারিবে। এ রাস্তায় আজ-কাল চোর-ডাকাতের বড় ভয় নাই। আমি বিলম্ব করিয়া গোরকপুর গেলে হয়তো সে ছত্রসিংহ কোথায় চলিয়া যাইতে পারে। এই অবস্থায় গোরক্‌পুর যাইতে আমার বিলম্ব করা উচিত নহে।'

একাকিনী কন্যাকে সঙ্গে করিয়া কাশীতে যাইতে বৃদ্ধার মনে নানা বিপদাশঙ্কা হইতে লাগিল। কিন্তু কি করিবেন। বাণেশ্বর তখন ইহাদিগকে কাশীতে পৌছাইয়া দিতে অসম্মত হইলেন, তখন একান্ত বাধ্য হইয়া বৃদ্ধা আপন কন্যাসহ কাশীতে চলিলেন। পথে দস্যুরা বৃদ্ধার সঙ্গে যে কিছু টাকা-কড়ি ছিল, তৎসমুদয় অপহরণ করিল। বৃদ্ধা রিক্তহস্তে কন্যাকে লইয়া কাশীতে পৌছিলেন। এদিকে বাণেশ্বর ফায়েজাবাদ হইতে রওনা হইয়া গোরক্‌পুরে চলিয়া গেলেন। বাণেশ্বর সঙ্গে থাকিলে বৃদ্ধার আর এ দুরবস্থা হইত না।

এ সংসারে মানুষ চিরান্ধ হইয়া বাস করিতেছে। হতভাগ্য বাণেশ্বর যদি কেবল কর্তব্যের অনুরোধে স্বার্থপরতা বিসর্জনপূর্বক বৃদ্ধা রমণীকে পৌছাইয়া দিবার নিমিত্ত কাশীতে চলিয়া যাইত, তবে নিশ্চয়ই স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইত। অমরসিংহ কাশীতে পৌছিয়াই কাশীর ভিন্ন ভিন্ন স্থান এবং ভিন্ন ভিন্ন সড়কের লোকের নিকট বৃদ্ধ পিতার আকৃতি বর্ণন করিয়া বলিয়া রাখিয়াছে, যে, এইরূপ আকৃতির লোক দেখিতে পাইলে যে আমার নিকট সংবাদ দিবে, আমি তাহাকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দিব। তদ্ভিন্ন এখন প্রত্যেক দিন প্রাতঃকালেই অমরসিংহ এবং ছত্রসিংহ কাশীর নানাস্থানে ভ্রমণ করে। তাহারা মনে করে যে হয়তো কোনো রাস্তা-ঘাটে বাণেশ্বরের সহিত একদিন-না-একদিন সাক্ষাৎ হইতে পারে। কিন্তু হতভাগ্য বাণেশ্বরের স্ত্রী পুত্রের সাক্ষাৎ লাভ করিবার সুযোগ একেবারে নষ্ট হইল।

পাঠক একবার চিন্তা করিয়া দেখ, এ সংসারে আমরা সকলেই অন্ধ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছি। কোন্ পথ অবলম্বন করিলে যে আমাদের সুখ শান্তি হইবে তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না। এই জন্ম আমরা সর্বদাই পরমেশ্বরের প্রতি দোষারোপ করি। কেন পরমেশ্বর মানুষকে এইরূপ চিরান্ধ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন? তিনি যদি পূর্ণ মঙ্গলময় হইতেন, পরম দয়াবান হইতেন, তবে কি মানুষকে এই প্রকার চিরান্ধ করিয়া সৃষ্টি করিতেন? এই চিরান্ধতা নিবন্ধন সংসারে মানুষ কেবলই দুঃখভোগ করিতেছে। কেন তিনি বাণেশ্বর ভট্টাচার্যের দুঃখ নিবারণার্থ স্বয়ং বাণেশ্বরের নিকটে আসিয়া বলিলেন না, যে এই রমণীদ্বয়কে পৌছাইয়া দিবার নিমিত্ত কাশীতে চলিয়া যাও, তোমার পুত্র কন্যার সঙ্গে সেখানে সাক্ষাৎ হইবে?

কিন্তু পাঠক, পরমেশ্বরকে নিষ্ঠুর বলিবার পূর্বে আর-একবার চিন্তা কর। কে বাণেশ্বরকে গোরক্‌পুর লইয়া চলিল? কেন বাণেশ্বর আপন স্ত্রী পুত্র দর্শনলাভের এই সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইল? স্বীকার করি, পরমেশ্বর আমাদিগকে চিরান্ধ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা এ সংসারের ঘটনার স্রোতে ভাসিতেছি। কোন্ পথ অবলম্বন করিলে যে সুখ ও শান্তি হয়, তাহা অবধারণ করিবার সাধ্য আমাদের নাই। কিন্তু সেই অন্ধ ঘটনার স্রোত বাণেশ্বরকে কোন্‌দিকে লইয়া চলিয়াছিল? কে আসিয়া সে স্রোতের গতি ফিরাইয়া দিল? কে সে গতি অবরোধ করিল?

পাঠক, ঈশ্বরকে নিষ্ঠুর বলিবার পূর্বে একবার বাণেশ্বরের অন্তরের ভাব তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ। সেই অন্ধ ঘটনায় স্রোত ভাসাইতে ভাসাইতে বাণেশ্বরকে কাশীধামে লইয়া চলিয়াছিল। স্বার্থপরতা এবং আত্ম-সুখচিন্তা আসিয়া সে স্রোতের গতি রোধ করিল। বাণেশ্বর আর পরম পবিত্র কাশীধামে যাইতে সমর্থ হইলেন না। স্বার্থপরতার অনুরোধে কর্তব্যের পথ বিসর্জন পূর্বক তিনি বেরুচ এবং গোরক্‌পুরে চলিলেন।

পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বর কাহাকেও চিরান্ধ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। হৃদয়স্থিত ঘোর স্বার্থপরতাই মানুষকে চিরান্ধ করিয়া রাখিয়াছে। স্বার্থপরতাই মানুষকে বিনাশের দিকে পরিচালন করিতেছে। কর্তব্যজ্ঞানই মানুষের এক-মাত্র চক্ষু। কর্তব্যজ্ঞান বিবর্জিত হইবামাত্র মানুষ চিরান্ধ হইয়া পড়ে। কর্তব্য-জ্ঞান-বিবর্জিত বাণেশ্বর আজ পথভ্রান্ত পথিক।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়

অসার সংসারে প্রভুর চরণ সার

বৃদ্ধ বাণেশ্বর ভট্টাচার্য গোরক্‌পুরে আসিয়া পৌঁছিলেন। কেণ্টনমেণ্টের প্রত্যেক সিপাহীর নিকট ছত্রসিংহ, অমরসিংহ এবং হাফেজ-নন্দিনী কোথায়—এই প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। গোরক্‌পুরের রেজিমেণ্টের একজন সিপাহীর সঙ্গেও তাঁহাদিগের পরিচয় ছিল না। কেহই তাঁহাদিগের কোনোরূপ ঠিকানা বলিতে পারিল না।

বাণেশ্বর নিরাশ হইয়া বেরুচে চলিয়া গেলেন। সেখানেও প্রত্যেক সিপাহীর নিকট ছত্রসিংহ, অমরসিংহ এবং হাফেজ-নন্দিনীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু কোনো অনুসন্ধানই পাইলেন না। বাণেশ্বর অন্যূন দুই বৎসর-কাল গোরক্‌পুর বেরুচের নানা স্থান পর্যটন করিতে লাগিলেন। দুই বৎসর পরে কর্নেল হ্যানে নূতন এক রেজিমেণ্ট সহ গোরকপুরে আসিল। সেই নূতন রেজিমেণ্টের সিপাহিদিগের নিকট বাণেশ্বর, ছত্রসিংহ ও অমরসিংহের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন সিপাহী বলিল, যে, ছত্রসিংহ ও অমরসিংহ বোধহয় এখন বিদায় লইয়া স্বদেশে গিয়াছে। তাহারা সত্বরই এখানে আসিবে। বাণেশ্বর ইহার কথার উপর নির্ভর করিয়া, গোরক্‌পুরে আর কিছুকাল অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে কর্নেল হ্যানের আগমনে গোরকপুরে ঘোর অত্যাচারানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। গোরক্‌পুর এবং বেরুচে কেবল হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। কর্নেল হ্যানের অত্যাচারের বিষয় পূর্ব অধ্যায়েই বিবৃত হইয়াছে। এখানে আর সে সকল কথা পুনর্বার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। সে অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। বারম্বার পাঠক ও পাঠিকাদিগের সম্মুখে কর্নেল হ্যানের পৈশাচিক মূর্তি, কাপ্তেন উইলিয়ামের রাক্ষসাকৃতি উপস্থিত করিলে, নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের মন কলুষিত হইবে। কর্নেল হ্যানের অত্যাচারে পতিপুত্রশোকাতুরা অবগুণ্ঠনবতী গোরক্‌পুর এবং বেরুচের ভদ্র মহিলাগণ পর্যন্ত অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। কাহার সাধ্য এ অত্যাচার ভাষা দ্বারা অভিব্যক্ত করিতে পারে?

বৃদ্ধ বাণেশ্বর গোরক্‌পুর এবং বেরুচের রমণীদিগকে ঈদৃশ ভীষণ অত্যাচারে নিপীড়িত হইতে দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—

'এ সংসারে তো কেহই সুখী নহে। সকলেই অত্যাচারানলে দগ্ধ হইতেছে। আমার স্ত্রী, কন্যা এবং পুত্রবধূর প্রতি যেরূপ অত্যাচার হইয়াছিল, তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক অত্যাচার এ প্রদেশের সহস্র সহস্র রমণী সহ্য করিতেছে। তবে আমি কেন আর পুত্র পুত্র বলিয়া শোকানলে জ্বলিয়া মরিতেছি। দূর হউক, এ অসার সংসারে একমাত্র বিভুর চরণই সার। আজ হইতে আর স্ত্রী পুত্রের চিন্তা কখনোও মনে স্থান প্রদান করিব না। যে আশালতা একেবারে ছিন্ন হইয়াছে, তাহাকে পুনর্জীবিত করিবার চেষ্টা কেনই বা করিলাম? যাই হরিদ্বারে। শ্রীনিবাস পণ্ডিত যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, সেই পথ অবলম্বন করিব। অহর্নিশ ঈশ্বর চিন্তায় দিন যাপন করিব। বৃথা এ সংসার। দূর হউক—এ অসার সংসারে একমাত্র বিভুর চরণই সার।'

'দূর হউক এ অসার সংসারে একমাত্র বিভুর চরণই সার'—মুখে এই ধ্বনি করিতে করিতে, বাণেশ্বর হরিদ্বারে চলিলেন। বাণেশ্বরের এই এক নূতন রোগ হইল। তাঁহার মুখে আর কোনো কথাই নাই। বাণেশ্বর আবার ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। 'দূর হউক এ অসার সংসারে একমাত্র বিভুর চরণই সার।' এই গান করিতে করিতে তিনি হরিদ্বারে আসিয়া পৌঁছিলেন।

এই অধ্যায় সমাপ্ত করিবার পূর্বে পাঠক ও পাঠিকাগণের কৌতূহল নিবারণার্থে সেই বৃদ্ধা ক্ষত্রিয় রমণী এবং তাঁহার বিধবা কন্যার কাশীতে যেরূপ দুরবস্থা হইয়াছিল, তাহাই এস্থানে উল্লেখ করিতেছি।

মৃত সিপাহীর নিকট হইতে বৃদ্ধার কন্যা প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার টাকার মোহর প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই টাকা পাইয়াছিল বলিয়াই ইহারা কাশীধামে যাইয়া বাস করিতে সাহস করিয়াছিল। নহিলে বোধহয় ফয়েজাবাদ হইতে ইহারা আবার রোহিলখণ্ডে চলিয়া যাইত। ইহারা ক্ষত্রিয় রমণী। প্রাণান্তেও ইহারা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে না। কাশীতে পৌঁছিয়া নিশ্চয়ই ইহাদিগকে অনাহারে মরিতে হইত। কিন্তু অনাথার নাথ পরমেশ্বর। কত কৌশলে যে তিনি জীবের প্রাণরক্ষা করিতেছেন তাহা কে বুঝিতে পারে। পথে দস্যুরা ইহাদিগের সমুদয় অর্থ এবং জিনিস-পত্র অপহরণ করিয়াছিল। কেবল দশ কি বারটি মাত্র মোহর যুবতীর পরিধেয় বস্ত্রের অঞ্চলে বাঁধা ছিল, তাহা দস্যুদিগের চক্ষে পড়ে নাই। দস্যুরা কতবার সে অঞ্চল পরীক্ষা করিয়া

দেখিয়াছিল, কিন্তু সে মোহর কয়েকটি তাহারা দেখিতে পায় নাই। এই কয়েকটি মোহরই ইহাদিগের একমাত্র সম্বল রহিল। কাশীতে প্রায় দুই বৎসর কাল অতিকষ্টে তদ্দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিল। দুই-তিন বৎসর পরে একেবারে নিরন্নাবস্থায় কাল-যাপন করিতে হইল। একদিন অনাহারে তাহারা বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের নিকট বসিয়া রোহিলা ভাষায় লোকের নিকট ভিক্ষা চাহিতেছিল। অমরসিংহ সেই সময় বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করিতেছিলেন। ইহাদিগকে রোহিলাদেশীয় ভাষায় কথা বলিতে শুনিয়া, তিনি ইহাদিগের সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি ইহাদিগকে কয়েকটি পয়সা দিলেন এবং ইহাদিগের বর্তমান দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধা অমরসিংহের নিকট সমুদয় আত্মবিবরণ বিবৃত করিতে লাগিলেন। আত্মবিবরণ বলিবার সময় তিনি বাণেশ্বরের সমুদয় কথাও বলিলেন। বাণেশ্বর ফায়েজাবাদের ভগ্ন গৃহের প্রাচীরে লিখিত বাংলা অক্ষর যে আপন পুত্রের হস্ত-লিপি বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ও একে একে বিবৃত করিলেন।

বৃদ্ধার সমুদয় কথা শ্রবণে অমরসিংহের হৃদয় হর্ষবিষাদ এবং আশ্চর্যে উদ্বেলিত হইতে লাগিল। বৃদ্ধা যে স্থানে বসিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন সেইস্থান হইতে ধীরে ধীরে দুই-চারিপদ অগ্রসর হইলেন। মহাদেবের মন্দির-দ্বারে আসিয়াই ভূমিতলে পড়িয়া প্রণাম করিলেন, এবং বারম্বার বলিতে লাগিলেন,—'ভগবান্ ভূতভাবন কৈলাসপতি, তোমার মহিমা কে বুঝিতে পারে? ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু, প্রভু তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।'

মন্দিরদ্বারে প্রণাম করিয়া, আবার সেই বৃদ্ধার নিকটে আসিলেন। বৃদ্ধা এবং তাঁহার কন্যাকে বলিলেন,—'মা, তোমরা আমার সঙ্গে চল। অনাথা দরিদ্রদিগকে মহারানী গোলাপকুমারী আপন গৃহে আশ্রয় প্রাদন করিতেছেন। তোমাদের সকল কষ্ট দূর হইয়াছে। আমি তোমাদিগকে জননীর ন্যায় পরিচর্যা করিব। যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তোমাদিগের সঙ্গী ছিলেন, তিনি আমার পিতা, প্রাচীরে আমার হস্তাক্ষর দেখিয়াই আমার অন্বেষণে গোরক্ষপুর চলিয়া গিয়াছেন। আমি তোমাদিগকে গৃহে রাখিয়া এখনই গোরক্ষপুর যাত্রা করিব।'

বৃদ্ধা ক্ষত্রিয়রমণী অত্যন্ত আশ্চর্য হইলেন। অমরসিংহের কথা শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া তিনি মনে বলিলেন, যে ইনি নিশ্চয়ই একজন সাধুপুরুষ হইবেন। কিন্তু বৃদ্ধার মনে হইতে লাগিল, যে অমরসিংহ হয়তো মুসলমান-কন্যাকে বিবাহ করিয়া জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন। এই চিন্তা বৃদ্ধার

মনে উদয় হইবামাত্র তিনি একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। অমরসিংহ বলিলেন,—'আপনাদের কোনো ভয় নাই, আমার সঙ্গে চলুন। মহারানী গোলাপকুমারী আপনাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিবেন।'

বৃদ্ধা বলিলেন,—'গোলাপকুমারী কি আপনার সেই হাফেজ-নন্দিনী?'

অমরসিংহ তখন বৃদ্ধার মনের ভাব বুঝিয়া বলিতে লাগিলেন,—'মা, আমার পিতার মনে অনর্থক সন্দেহ হইয়াছে। আমি কোনো মুসলমান কন্যাকে বিবাহ করি নাই। হাফেজ-নন্দিনী আপনাদের ফরাক্কাবাদের নবাবের কন্যা। রোহিলাযুদ্ধাবসানে তাঁহাকে এবং তাঁহার জননীকে ধৃত করিয়া আনিবার নিমিত্ত অন্যান্য সৈন্য সহ আমিও প্রেরিত হইয়াছিলাম। নবাবের আক্রমণ হইতে ফরক্কাবাদের নবাবের পত্নী এবং নবাবের কন্যাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি চেষ্টা করিয়াছিলাম। হাফেজ-নন্দিনীকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা কখনোও আমার মনে উদয় হয় নাই।'

অমরসিংহ ক্রমে বৃদ্ধা এবং তাঁহার কন্যার নিকট হাফেজ-নন্দিনীর সমুদয় বিবরণ বিবৃত করিলেন। বৃদ্ধা তখন অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া অমরসিংহের সঙ্গে রানী গোলাপকুমারীর গৃহে চলিলেন। অনাথাদিগের আশ্রয়দায়িনী মহারানী গোলাপকুমারী ইহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিলেন।

বৃদ্ধার নিকটে অমরসিংহ আপন পিতার বিষয় যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, তৎসমুদয় আপন জননী, ভগ্নী, স্ত্রী, চাঁদকুমারী এবং রানী গোলাপকুমারীর নিকট বলিলেন। অমরসিংহের জননী এখন সর্বদাই অমরসিংহের সন্তান দুইটিকে আপনার নিকটে রাখেন। তিনি পুত্রের মুখে এইসকল কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন,—আমার শ্বশুর দেবতা ছিলেন। তাঁহার কোনো কথাই নিষ্ফল হইবে না। পৌত্রের মুখচুম্বন করিয়া আবার বলিলেন, আমার পৌত্র নিশ্চয়ই বিশ্বজয়ী হইবে। প্রায় চারিবৎসর হইল, অমরসিংহ কাশীতে আসিয়াছেন। তাঁহার একটি কন্যা এবং একটি পুত্র জন্মিয়াছে। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী এবং অমরসিংহের ভগ্নী সর্বদাই ইহাদিগকে ক্রোড়ে ক্রোড়ে রাখেন, মুহূর্তের নিমিত্ত ইহাদিগকে সঙ্গছাড়া করেন না।

অমরসিংহ, ছত্রসিংহ এবং চাঁদকুমারীর পুত্র মহাবীরসিংহ—তিনজন তৎক্ষণাৎ বাণেশ্বরের অন্বেষণে গোরক্ষপুর যাত্রা করিলেন। সেখানে পৌঁছিয়া ক্রমে গোরক্ষপুর এবং বেরুচের স্থানে স্থানে বাণেশ্বরকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। গোরক্ষপুর এবং

বেরুচে কর্নেল হ্যানের অত্যাচার দর্শনে ইহাদিগের তিনজনের শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিল। ইহারা তিনজন সর্বদাই বলিতে লাগিলেন,—'মানুষের উপর কি মানুষ এত অত্যাচার করিতে পারে ?'

ইহারা প্রায় একমাস কাল বাণেশ্বরের অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিলেন না। বাণেশ্বর ইহাদিগের পৌঁছিবার পূর্ব্বেই হরিদ্বারে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু গোরক্‌পুর এবং বেরুচের লোকের দুরবস্থা দেখিয়া ইহাদিগের কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ইহারা তখন বাণেশ্বরের অনুসন্ধান পরিত্যাগপূর্বক গোরক্‌পুর এবং বেরুচের অত্যাচার-নিপীড়িত লোক-দিগের সাহায্যার্থ ইংরাজসৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই ঘটনাই মহাবীরের সংগ্রামিক জীবনের প্রারম্ভ।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়

পিতা ও মাতামহের তর্পণ

গোরকপুর এবং বেরুচের অত্যাচারের বিষয় পূর্ব পূর্ব অধ্যায়েই উল্লিখিত হইয়াছে। ১৭৭৮ সনে এ অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে। এখন ১৭৮০ সাল আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্যন্তও এ অত্যাচারানল নির্বাপিত হয় নাই। এখন পর্যন্তও বেরুচ এবং গোরক্‌পুরের স্ত্রী-পুরুষগণ অস্ত্র পরিত্যাগ করেন নাই। অমরসিংহ এবং মহাবীরসিংহ এই অত্যচার নিপীড়িত নর-নারীদিগের সঙ্গে একত্র হইয়া ইংরাজ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। কর্নেল হ্যানের প্রার্থনানুসারে লক্ষ্ণৌ হইতে রেজিমেণ্টের পর-রেজিমেণ্ট আসিয়া তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত করিল।

মহাবীর নিয়মিতরূপে কখনো অস্ত্র শিক্ষা করেন নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য রণকৌশলে তাঁহার পারদর্শিতা দেখিয়া ছত্রসিংহ এবং অমরসিংহ একেবারে চমৎকৃত হইলেন। এ বীর যুবক বোধহয় অর্জুন-নন্দন অভিমন্যুর ন্যায় জননী-গর্ভে অবস্থান কালেই অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছিলেন। দিন দিন মহাবীর শত শত ইংরাজ সৈন্যের প্রাণসংহার করিতে লাগিলেন। পূর্বে গোরক্‌পুর এবং বেরুচের লোকেরা কর্নেল হ্যানের সৈন্যগণের আক্রমণ হইতে কেবল আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ করিতে ছিলেন। ইংরাজ সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত না হইলে তাঁহারা আপনা

হইতে কখনোও ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিতেন না। কিন্তু এখন ইংরাজ সৈন্যই আত্মরক্ষার পথ অবলম্বন করিলেন। মহাবীর এবং অমরসিংহ কর্নেল হ্যানের শিরশ্ছেদনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

প্রাণের ভয়ে কর্নেল হ্যানে আবার নূতন রেজিমেণ্টের নিমিত্ত লক্ষ্ণৌ দরবারে পত্র লিখিলেন। কিন্তু নবাব আসফউদ্দৌলাও এখন গোরক্‌পুর এবং বেরুচের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিলেন। আপন প্রজাদিগের দুঃখের কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয়ও অত্যন্ত বিগলিত হইল। তিনি কর্নেল হ্যানের প্রার্থনানুসারে আর নূতন সৈন্য প্রেরণের আদেশ করিলেন না। নিস্তেজ, কিন্তু সহৃদয় আসফউদ্দৌলা এ পর্যন্ত ইংরাজ গবর্নমেণ্টের একটি কার্যেরও প্রতিবাদ করেন নাই। কিন্তু পুরাতন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিদিগের দুর্ব্যবহারে মৃত দেহেও ক্রোধের সঞ্চার হয়। তিনি কর্নেল হ্যানের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া, গবর্নর জেনেরল হেস্টিংস সাহেবের নিকট কর্নেল হ্যানের সমুদয় কুকার্য বিবৃত করিয়া পত্র লিখিলেন,—'আপনি সত্বর কর্নেল হ্যানেকে আমার রাজ্য হইতে চলিয়া যাইতে লিখিবেন। কর্নেল হ্যানেকে আমি আমার সরকারের কোনো কার্যে বহাল রাখিতে ইচ্ছা করি না।'

নির্বোধ নিস্তেজ আসফউদ্দৌলা বুঝিল না যে কর্নেল হ্যানে হেস্টিংসের প্রিয় বন্ধু ইলা ইজা ইম্পির আত্মীয় লোক। সমুদয় অযোধ্যা সে ছারখার করিলেও হেস্টিংস তাহাকে বরখাস্ত করিবেন না। আসফউদ্দৌলার পত্রের প্রত্যুত্তরে হেস্টিংস কোপাবিষ্ট হইয়া লিখিলেন,—'আমি কি নিজে ইচ্ছা করিয়া হ্যানেকে তোমার রাজ্যে প্রেরণ করিয়াছি? তুমি ইংরাজ কর্মচারী চাহিয়াছিলে, তাহাতে একজন উপযুক্ত লোককে প্রেরণ করিয়াছি।'

গবর্নর জেনেরল হেস্টিংসের এই পত্র পাইয়া নবাব আসফউদ্দৌলা ভয়ে নির্বাক রহিলেন। এদিকে আবার নূতন সৈন্যের প্রার্থনা করিয়া লক্ষ্ণৌর তদানীন্তন প্রধান অমাত্য হায়দরবেগ খাঁর নিকট পত্র লিখিলেন,—'আমার ন্যায় উপযুক্ত কলেক্টর * তোমরা কখনও পাইবে না। এখন আমার সাহায্যার্থ সৈন্য না পাঠাইলে গোরক্‌পুর এবং বেরুচ সুশাসিত হইবে না।

---

* কর্নেল হ্যানের আসিস্টাণ্ট আবুতালিবের ইতিহাসে এইরূপ পত্রের উল্লেখ রহিয়াছে। আবুতালিব ভিন্ন কোনো ইংরাজ ইতিহাস-লেখকও কর্নেল হ্যানেকে সমর্থন করিতে সাহস করেন নাই। চাকুরির প্রত্যাশায় আবুতালিবই এই প্রকার ইতিহাস লিখিয়াছেন। ভারতবর্ষে কেবল আবুতালিবের ন্যায় লোকই জন্মগ্রহণ করেন।

নিস্তেজ হায়দর বেগ খাঁও এবার একটু সাহস প্রকাশ করিলেন। হ্যানের সাহায্যার্থে আর সৈন্য প্রেরণ করিলেন না। সুতরাং কর্নেল হ্যানের এখন আর আত্মরক্ষা ভিন্ন অত্যাচার করিবার বড় সুযোগ রহিল না। বিশেষতঃ আর অত্যাচার করিবার প্রয়োজনও নাই। বেরুচ এবং গোরক্‌পুর প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। এই দুই জেলার বার্ষিক রাজস্ব নয় লক্ষ টাকা ছিল। কর্ণেল হ্যানে বিগত দুই বৎসর নবাবের প্রাপ্য নয় লক্ষ টাকা আদায় করিয়া তদ্দারা যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করিয়াছেন এবং নিজে সমুদয় খরচ বাদে ত্রিশ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়া, কলিকাতায় প্রেরণ করিয়াছেন। দুই বৎসরের মধ্যে কর্নেল হ্যানে ত্রিশ লক্ষ টাকা উপার্জন করিল। এদিকে বঙ্গদেশে রঙ্গপুরের কলেক্টর গুডলাও সাহেবের সহচর দেবীসিংহ-সদৃশ কর্নেল হ্যানের আসিস্টাণ্ট আবুতালিবও অনেক অর্থ সঞ্চয় করিলেন।

বেরুচ এবং গোরক্‌পুরের অত্যাচারানল এইরূপে কথঞ্চিত নির্বাপিত হইলে পর, অমরসিংহ ছত্রসিংহকে এবং মহাবীরকে কাশীতে প্রত্যাবর্তন করিতে বলিলেন। তিনি একাকী পিতার অন্বেষণে অযোধ্যার স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কিন্তু মহাবীর তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি বিশেষ গম্ভীরভাবে বলিলেন,—

'আমি পিতা এবং মাতামহের তর্পণ না করিয়া এ স্থান পরিত্যাগ করিব না।'

অমরসিংহ এবং ছত্রসিংহ মহাবীরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন মহাবীরের কথার অর্থ তাঁহারা কিছুই বুঝিতে সমর্থ হইলেন না।

অমরসিংহ বলিলেন,—'এখানে কি তর্পণ করিবে? পিতা এবং মাতামহের পিণ্ড প্রদান করিতে হইলে কাশীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পরে গয়ায় চলিয়া যাইও।'

মহাবীর বলিলেন,—'যে গয়া যাইয়া কলা এবং আতপ চাউলের পিণ্ড তোমার বাপের স্বর্গার্থে তোমায় বুড়ো মাতাকে দিতে বলিবে। আমার পিতা, আমার মাতামহের শুদ্ধ কেবল চাউল কলার পিণ্ডে স্বর্গলাভ হইবে না।'

অমরসিংহ। (হাসিতে হাসিতে) তবে তুমি কিরূপে পিণ্ড প্রদান করিতে চাও? তুমি একটা নূতন শাস্ত্র বাহির করিবে নাকি?

মহাবীর। আমি কি প্রকার পিণ্ড প্রদান করিতে চাহি, শুনিবে? পিতৃঋণ পরিশোধ করা পুত্রের কর্তব্য। আর পিতৃ পিতামহ প্রভৃতি পূর্বপুরুষদিগের ভ্রম সংশোধন করাও পুত্রের কর্তব্য। আমার পিতা ৺রণবীরসিংহ পলাশীর

যুদ্ধে প্রাণবিসর্জন করিয়া এই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রভুত্বের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন। আমার পিতামহ ৺নেহালসিংহ বক্সারের যুদ্ধে আপন প্রাণ দিয়া কোম্পানির রাজত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন। এই বেরুচ এবং গোরক্‌পুরে যত অত্যাচার হইতেছে তাহার মূল কারণ কে? আমার পিতা এবং মাতামহই ইহার মূল কারণ। তাঁহাদের এ ভুল সংশোধন না করিলে, কেবল চাউল কলার পিণ্ডে তাঁহাদের স্বর্গলাভ হইবে না। তোমার পিতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোক, গুরু পুরোহিতের ব্যবসা করিতেন। দুই-চারিজন লোককে চাউল কলা ঠকাইয়াছেন। এখন দুই সের আতপ চাউল আর দশটা কলা দ্বারা পিণ্ড প্রদান করিলে তাঁহার স্বর্গলাভ হইতে পারে। কিন্তু আমার পিতা এবং মাতামহের স্বর্গ লাভ কেবল চাউল কলার পিণ্ডে হইবে না।

অমরসিংহ এবং ছত্রসিংহ এই তেজস্বী যুবকের কথা শুনিয়া একেবারে অবাক হইয়া রহিলেন। কিছুকাল পরে অমরসিংহ বলিলেন,—

'তোমার এ সকল ঠাট্টা তামাশার কথা এখন ছাড়িয়া দাও। প্রায় ছয়মাস কাল আমরা কাশী হইতে চলিয়া আসিয়াছি। দিদি চাঁদকুমারী তোমার নিমিত্ত বড় উৎকণ্ঠিত হইবেন। তুমি এখন কাশীতে চলিয়া যাও।'

মহাবীর অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া বলিলেন,—'মামা, তুমি আমার কথা ঠাট্টা তামাশা বলিয়া মনে করিতেছ নাকি? পুত্র হইয়া যে আপন পিতৃ-পিতামহের ঋণ পরিশোধের চেষ্টা না করে, তাঁহাদের ভ্রম সংশোধনার্থ প্রাণ বিসর্জন করিতে প্রস্তুত না হয়, সে তাহার পিতার পুত্র নহে। সে জারজ সন্তান।'

অমরসিংহ মহাবীরের কথা শুনিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—'বীরত্বই মানুষের মধ্যে একমাত্র দেবত্ব।' কিন্তু প্রকাশ্যে বলিলেন,—'তবে তুমি এখন কি করিতে চাও?'

মহাবীর। আর কি করিব? কর্নেল হ্যানের শিরচ্ছেদন পূর্বক গোরক্‌পুর এবং বেরুচ হইতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সমুদয় লোক বহিষ্কৃত করিয়া দিব।

অমরসিংহ। বাছা; সে বড় দুঃসাধ্য ব্যাপার।

মহাবীর। তোমার ন্যায় টুলো বামনের নিকট সকলই দুঃসাধ্য। কিন্তু নিশ্চয়ই জানিবে রণবীরসিংহের পুত্র এবং নেহালসিংহের দৌহিত্রের নিকট কিছুই দুঃসাধ্য নহে।

মহাবীরের কথা শুনিবা বৃদ্ধ ছত্রসিংহেরও সংগ্রামিক স্পৃহা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। অমরসিংহ টোলের ছাত্র হইলেও এই কয়েক বৎসরের সংগ্রামিক

শিক্ষা তাঁহাকে বিলক্ষণ তেজস্বী করিয়া তুলিয়াছে। ইহারা কর্নেল হ্যানেকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার নিমিত্ত বেরুচ এবং গোরক্‌পুরের সমুদয় লোক সংগ্রহ করিল। কর্নেল হ্যানের সৈন্যগণের সঙ্গে অন্যূন তিনবার যুদ্ধ হইল, তিনবারেই ইংরাজ সৈন্যদিগকে পরাজিত হইয়া রণক্ষেত্র হইতে শৃগালের ন্যায় পলায়ন করিতে হইল।

ইহার পর আর কর্নেল হ্যানের লোকেরা গোরক্‌পুর এবং বেরুচের অধিবাসিদের উপর অত্যাচার করিতে সাহস করিল না। এ দিকে গোরক্‌পুর এবং বেরুচে ঘোর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। দুর্ভিক্ষনিবন্ধন কাহারোও আর যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হইল না। তখন মহাবীর গোরক্‌পুরের কয়েকজন লোক সঙ্গে করিয়া কাশীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। অমরসিংহ ছত্রসিংহকে সঙ্গে করিয়া স্বীয় পিতার অনুসন্ধানার্থ অযোধ্যার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ঊনত্রিংশত্তম অধ্যায়

শ্রীনিবাস পণ্ডিত

শ্রীনিবাস পণ্ডিতের সঙ্গে পাঠকগণের পুস্তকের প্রথম অধ্যায়েই সাক্ষাৎ হইয়াছে। শ্রীনিবাস পূর্বে বৃক্ষতলে যোগাসনে বসিয়া অহর্নিশ ধ্যান করিতেন। কিন্তু এখন আর তিনি অহর্নিশ নয়ন মুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাকেন না। নিশাবসানের দুইঘণ্টা পূর্ব হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং সূর্যাস্তের পর দুই-তিনঘণ্টা বসিয়া কেবল ধ্যান করেন এবং সমস্ত দিবস নানা কার্যে ব্যাপৃত থাকেন। হরিদ্বারে তাঁহার এখন অনেক শিষ্য-সেবক জুটিয়াছে। কখনোও শিষ্যদিগকে নানা শাস্ত্রে উপদেশ প্রদান করেন। কখনোও কোনো গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কৃষক ও কৃষক-রমণীদিগের সহিত আলাপ করেন; কখনোও কৃষক-বালক-বালিকাদিগকে লইয়া আমোদ-প্রমোদ করেন। কৃষক এবং কৃষক-রমণীগণ সকলেই তাঁহাকে বাবা বলিয়া সম্বোধন করে। শ্রীনিবাস পণ্ডিত এখন হরিদ্বারবাসী সকলেরই পিতা হইয়া পড়িয়াছেন।

পূর্বে প্রায়ই তিনি বৃক্ষতলে শয়ন এবং অনশনে দিন যাপন করিতেন। কিন্তু হরিদ্বারের কৃষকগণ কয়েক বৎসর হইল তাঁহার নিমিত্ত একখানি কুটির নির্মাণ করিয়া দিয়াছে। পণ্ডিত শ্রীনিবাস এখন কুটিরে বাস করেন এবং আহারাদি সম্বন্ধে কখনোও নিয়ম লঙ্ঘন করেন না।

বাণেশ্বর ভট্টাচার্য হরিদ্বারে পৌঁছিয়া, শ্রীনিবাস পণ্ডিতকে কুটিরে বাস করিতে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, যে, পণ্ডিত মহাশয় কি আবার অত্যন্ত সংসারাসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন? বাণেশ্বরের মুখে এখনোও সেই ধ্বনিই রহিয়াছে,—'অসার সংসারে প্রভুর চরণ সার।'

বাণেশ্বর—'অসার সংসারে প্রভুর চরণ সার'—এই কথা বলিতে বলিতে, যখন শ্রীনিবাস পণ্ডিতের কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন একটি অশিক্ষিত কৃষক কয়েকটি ফল শ্রীনিবাস পণ্ডিতকে প্রদান করিবার নিমিত্ত হাতে করিয়া কুটির দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল। সে একেবারে কুটিরের দরজা বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পণ্ডিত মহাশয় শিষ্যগণকে উপদেশ প্রদান কালে যে-যে কথা বলিতেছিলেন সে তাহাই শুনিতেছে। কিন্তু তাহার এক কথাও সে বুঝিতে পারে না।

এই কৃষকের পশ্চাৎ হইতে যাই বাণেশ্বর বলিয়াছে,—'অসার সংসারে প্রভুর চরণ সার,' কৃষক বাণেশ্বরের দিকে ফিরিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—'সার হবে সংসার, এ পাগলামি ছাড়।'

শ্রীনিবাস পণ্ডিত কুটিরের দ্বারের নিকট ইহাদের চীৎকারের শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া দেখেন যে বাণেশ্বর আসিয়াছেন। পাচ বৎসর পূর্বে বাণেশ্বর শ্রীনিবাস পণ্ডিতের নিকট হইতে বিদায় লইয়া রোহিলখণ্ডে গিয়াছিলেন। বাণেশ্বরকে দেখিবামাত্র শ্রীনিবাস গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া বসাইলেন। শ্রীনিবাস কেবল ভদ্রোচিত ব্যবহার প্রদর্শনার্থ বাণেশ্বরের হাত ধরিয়া বসাইয়াছিলেন তাহা নহে। তিনি হৃদয়াবেগ দ্বারা পরিচালিত হইয়াই এইরূপ করিয়াছিলেন। বাণেশ্বরের প্রতি তাঁহার বিশেষ ভালোবাসা ছিল।

বাণেশ্বরের সঙ্গে শ্রীনিবাস কথা বলিতে আরম্ভ করিলে পর শিষ্যগণ নিজ নিজ কার্যে চলিয়া গেল।

শ্রীনিবাস জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এবার কোন্ কোন্ প্রদেশ ভ্রমণ করিলে?'

বাণেশ্বর বলিলেন,—'রোহিলখণ্ড এবং অযোধ্যা।'

শ্রীনিবাস দেখিলেন যে, বাণেশ্বর পূর্বাপেক্ষা কিছু ভালো হইয়াছেন।

তাঁহার শারীরিক অবস্থাও পূর্বাপেক্ষা ভালো দেখাইতেছে। 'পৃথিবী লোক-শূন্য হউক,'—এই কামনা বাণেশ্বরের মন হইতে দূর হইয়াছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে, শ্রীনিবাস আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—'রোহিলখণ্ডে কি দেখিলে ?'

বাণেশ্বর। ঠাকুর রোহিলখণ্ডের কথা আর কি বলিব। যুদ্ধের পর রোহিলা রমণীদিগকে ইংরাজ এবং নবাব-সৈন্যগণ যেরূপ কষ্ট দিয়াছে, তাহা দেখিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। হা পরমেশ্বর! আর যেন পৃথিবীতে কেহ যুদ্ধ না করে। রমণীগণের এত কষ্ট! ইহারা অবলা, কাহারোও কোনো অনিষ্ট করে না। ইহাদিগের উপর এই অত্যাচার!

শ্রীনিবাস পণ্ডিত আশ্চর্য হইয়া বাণেশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বাণেশ্বরের পূর্বের ক্ষিপ্তাবস্থা একেবারে দূর হইয়াছে দেখিয়া, তিনি মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তাঁহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—'রোহিলা যুদ্ধে আর কি দেখিলে ? এ তো যুদ্ধের পরের কথা বলিলে।'

বাণেশ্বর। ঠাকুর যুদ্ধের কথা তোমাকে আর কি বলিব। রোহিলাদিগের সরদার হাফেজ রহমত খাঁর আশি বৎসরের ন্যূন বয়ঃক্রম ছিল না। কিন্তু এই বৃদ্ধ সরদার নিঃশঙ্ক হৃদয়ে এমন বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাহা মনে হইলে, আমারও যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হয়। তাঁহার তৎকালের অবস্থা স্মরণ হইলে আমি পুত্রশোক, কন্যার শোক, সকলই বিস্মৃত হইয়া পড়ি।

বাণেশ্বর এই কথা বলিবামাত্র শ্রীনিবাসের দুই চক্ষু হইতে অশ্রু বিসর্জিত হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—'বৃথা জীবন যাপন করিলাম। আমার এখনো আশি বৎসর বয়স হয় নাই। আমার বয়ঃক্রম ষাট বৎসরের অধিক হইবে না। কিন্তু জীবনটাকে একেবারে অকর্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছি।'

এইরূপ চিন্তা করিবার পর শ্রীনিবাস পুনর্বার বাণেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'রোহিলা যুদ্ধের পর এ পাঁচ বৎসর কোথায় ছিলে ?'

বাণেশ্বর তখন সমুদয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত শ্রীনিবাসের নিকট বলিলেন এবং অবশেষে পুত্রের সাক্ষাৎলাভ আশাতে বঞ্চিত হইয়া, বৃদ্ধ কেবল ঈশ্বরের ধ্যানে জীবন যাপন করিবেন বলিয়া যে মনে মনে স্থির করিয়াছেন, তাহাও শ্রীনিবাসের নিকট প্রকাশ করিলেন।

শ্রীনিবাস ইহার সমুদয় কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—'এখনোও তুমি প্রকৃত

পথ অবলম্বন করিতে পার নাই। আমার বোধহয় সেই নিরাশ্রয়া বৃদ্ধা রোহিলা রমণীকে সঙ্গে করিয়া যখন তাঁহার কন্যার অনুসন্ধান করিতেছিলে, তখনই একবার কর্তব্যের পথে উঠিয়াছিলে, সেই কর্তব্যের পথই তোমাকে হয় তো পুত্র এবং কলত্রসহ সম্মিলনের পথে পরিচালন করিত। কিন্তু রমণীদ্বয়কে একাকিনী কাশীতে প্রেরণ করিয়া নিশ্চয়ই কর্তব্যের পথ পরিত্যাগ করিয়াছ।'

বাণেশ্বর বলিলেন,—'আর স্ত্রী পুত্রের চিন্তা মনে স্থান দিব না। আমি আপনার সঙ্গে এই হরিদ্বারে বসিয়া, অহর্নিশ কেবল ঈশ্বর চিন্তায় জীবন যাপন করিব বলিয়াই আসিয়াছি। কিন্তু আপনার মধ্যে এখন বিলক্ষণ পরিবর্তন দেখিতেছি। আপনি পূর্বে বৃক্ষতলে শয়ন করিতেন। এখন কুটিরে বাস করেন। পূর্বে কোনো লোকের সঙ্গে বড় কথাবার্তা বলিতেন না। এখন শত শত লোক আপনার নিকট যাতায়াত করিতেছে। ইহার অর্থ আমি কিছুই বুঝিতে পারি না।'

বাণেশ্বরের কথার প্রত্যুত্তরে শ্রীনিবাস বলিতে লাগিলেন,—'তোমার কোনো অবস্থাই আমার অবিদিত নাই। বঙ্গদেশের দুরাত্মা নবাবপুত্র মীরণ তোমার স্ত্রী, কন্যা এবং পুত্রবধূকে হরণ করিলে পর তোমার যে-যে দুরবস্থা হইয়াছে, তাহা সকলই আমি তোমার মুখে শুনিয়াছি। কিন্তু আমি কে, এবং কি প্রকারে আমার এরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহা তুমি কিছুই জান না। তুমি কখনো আমার সে সকল কথা শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ কর নাই। তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, আমি সমুদয়ই তোমার নিকট বলিতাম। কিন্তু "জগৎ লোক শূন্য হউক" এই চিন্তা পূর্বে তোমার হৃদয়-মন অধিকার করিয়াছিল। অন্য কোনো কথা তোমার চিত্তাকর্ষণ করিত না অন্য কোনো কথা তোমার শ্রবণ করিতেও ইচ্ছা হইত না। সুতরাং আমি আমার অবস্থা তোমার নিকট কখনো বলিবারও সুযোগ পাই নাই। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধের সময় যখন তোমার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন তোমার দুঃখের কথা শুনিয়া আমার মন অত্যন্ত বিগলিত হইল। তোমার দুরবস্থার কথা আমাকে প্রথম মোহনিদ্রা হইতে জাগ্রত করিল। তখন আমার নিজের কুকার্যের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। তখন বুঝিতে পারিলাম, যে কর্তব্য লঙ্ঘনই কেবল মানুষকে বিনাশের দিকে পরিচালন করে। তোমাকে আমি সেই সময় হইতেই বড় উপকারী বন্ধু বলিয়া মনে করি। কারণ তোমার দুরবস্থার ইতিহাস আমার মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিয়া দিয়াছে। তুমি আমার এক প্রকার গুরু।'

বাণেশ্বর। আমার দুরবস্থার ইতিহাস কিরূপে আপনার মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিল?

শ্রীনিবাস। আমার কথা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক শ্রবণ কর। ক্রমে সকল কথাই আজ তোমার নিকট বলিব।

'আমাকে লোকে পণ্ডিত বলিয়া জানে, কিন্তু আমি পণ্ডিত নহি। তবে নিরবচ্ছিন্ন বিপদরাশি আমাকে পণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। যৌবনকাল পর্য্যন্ত আমি কখনোও শাস্ত্রাধ্যয়ন করি নাই। যৌবনাবসানে কাশীতে অবস্থান-কালে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করি। কাশীতেই প্রথম লোকে আমাকে পণ্ডিত বলিয়া অভিহিত করে। কিন্তু শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা আমার কিঞ্চিন্মাত্রও লাভ হইল না। যদি সত্য সত্যই আমি পণ্ডিত হইয়া থাকি, তবে বিপদরাশি এবং আত্ম-চিন্তাই আমাকে পণ্ডিত করিয়াছে। আমার সমুদয় পূর্ব্ব বিবরণ তোমার নিকট বলিতেছি।

'রাজপুতানার উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত প্রদেশেই আমার জন্মভূমি। আমার পূর্ব্বপুরুষগণও মহারাজ মানসিংহের ন্যায় দিল্লীর বাদশাহের অধীনে সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন। পিতৃ বিয়োগের পর পিতার ক্ষুদ্র রাজ্যের আমি একমাত্র অধিকারী হইলাম। আমার পিতা প্রজাদিগকে অপত্য-নির্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন। আমার পিতার প্রতি প্রজাগণেরও বিশেষ ভক্তি ছিল বলিয়াই, আমার সিংহাসনারোহণের পর, আমার প্রতি তাহারা যার-পর-নাই শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। আমার সহধর্ম্মিণীর নাম লক্ষ্মীবাঈ। তিনি সত্য সত্যই লক্ষ্মী-স্বরূপা ছিলেন। তিনিও প্রজাদিগকে আপন গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেন। প্রজাগণও তাঁহাকে আপন গর্ভধারিণী মনে করিত। যৌবনে এই প্রকার পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলাম।

'কিন্তু এ মানব জীবনে সময়ে সময়ে বিপদের সঙ্গে সংগ্রাম না করিলে মনুষ্য সুখশয্যায় পড়িয়া অচিরাৎ মনুষ্যত্ব-বিহীন হইয়া পড়ে। আমার সেই দশাই ঘটিল। আমার পিতা, পিতামহ অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহাদের তেজ ছিল, সাহস ছিল। কিন্তু অস্ত্রশিক্ষার অভাবে আমি বাল্যকাল হইতে কাপুরুষ।

'নাদের শাহ সসৈন্যে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবামাত্র আমি অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলাম। আমার প্রজাগণ, সৈন্যগণ, সকলেই আমাকে তখন সাহস প্রদানপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—

'ভয় কি? কত সৈন্য লইয়াই বা নাদের শাহ ভারতে আসিবে। তাহার সৈন্যগণ দলে দলে বিভক্ত হইয়া যদি এক এক দেশ আক্রমণ করে, তবে নিশ্চয়ই তাহারা পরাজিত হইবে। আর সমুদয় সৈন্য লইয়া যদি ভারতের প্রত্যেক দেশ এক এক করিয়া আক্রমণ করিতে থাকে, তবে সমুদয় দেশের লোক একত্র হইয়াও কি তাহাকে পরাস্ত করিতে পারিবে না? বিদেশ হইতে আসিয়া কি কেহ পররাজ্য দখল করিতে পারে?'

কিন্তু প্রজাদিগের এ আশ্বাস বাক্য শুনিয়াও আমার মন আশ্বস্ত হইল না। আমি আত্মরক্ষার্থ পলায়ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম; এবং আমার স্ত্রীর নিকট মনোগত এই গুপ্ত ভাব ব্যক্ত করিলাম। আমার স্ত্রী আমার এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। স্বাধ্বী রমণীগণের অন্তরে স্বয়ং ঈশ্বর বিরাজ করেন। তাঁহারা অশিক্ষিতা হইলেও, কি ন্যায় কি অন্যায় সহজে অবধারণ করিতে পারেন। হৃদয়ের পবিত্র ভাব তাঁহাদের বিচার শক্তিকে সতেজ করে, জ্ঞান-চক্ষুকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি প্রদান করে। তিনি বলিতে লাগিলেন, এইরূপ আচরণ নিতান্তই রাজধর্ম বিরুদ্ধ হইবে। প্রজাগণকে শত্রুহস্তে অর্পণ করিয়া রাজা পলায়ন করিলে তাহাকে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইতে হয়।

'কিন্তু আমি স্ত্রীর কথায় কর্ণপাত করিলাম না। তাঁহাকে নির্বোধ বলিয়া মনে করিলাম। আমার স্ত্রী আবার বলিলেন, না-হয় তুমি তীর্থ দর্শন উপলক্ষে কিছুকাল এই সময়ে কাশীতে যাইয়া থাক। আমি প্রজাদিগের রক্ষার্থ স্বদেশে থাকিব। আমার কেহ কিছু করিতে পারিবে না। স্ত্রীর এই দ্বিতীয় পরামর্শও আমি গ্রহণ করিলাম না। তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া পূর্ব-প্রদেশে কাশী প্রভৃতি অঞ্চলে পলায়ন করিব বলিয়াই স্থির করিলাম। পলায়ন পূর্বক আত্মরক্ষাই আমার একমাত্র শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিলাম। আমার স্ত্রী নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্বক আমার সঙ্গে পলায়ন করিতে সম্মতা হইলেন।

'আমি পলায়ন করিলে পর প্রজাগণ একেবারে অসহায় হইয়া পড়িল। নেতা বিহীনে এবং রাজার অভাবে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। তাহারা প্রত্যেকেই আপন আপন স্ত্রীপুত্রসহ পলায়ন করিতে লাগিল। প্রত্যেককেই গৃহত্যাগী হইতে হইল। আমার রাজ্য একেবারে জনশূন্য হইয়া পড়িল।

'আমার স্ত্রী এই সময় অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তিনি পলায়ন কালেই বলিয়াছিলেন,—আমার আসন্ন মৃত্যু কিছুতেই নিবারিত হইবে না। প্রজাদিগকে এই প্রকার অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করা অপেক্ষা গুরুতর পাপ

এ সংসারে আর কিছুই হইতে পারে না। আমার স্ত্রীর একটি কথাও নিষ্ফল হইল না। প্রয়াগ পর্যন্ত পৌঁছিবামাত্র তাঁহার প্রসববেদনা উপস্থিত হইল। সঙ্গে দাস-দাসী অধিক ছিল না। একটিমাত্র দাসী ছিল। আমি নিজেই তাঁহাকে নিদ্রিত করিবার নিমিত্ত বাতাস করিতে লাগিলাম। পৌর্ণমাসী রজনী। তিনি কিছুকালের নিমিত্ত নিদ্রিতা হইয়া পড়িলেন। কিন্তু প্রসব বেদনা আরম্ভ হইবামাত্র আবার তিনি জাগ্রত হইলেন। জাগ্রত হইয়াই আমাকে বলিলেন,—তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন চন্দ্রমণ্ডল হইতে স্বয়ং লক্ষ্মী তাঁহাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। তিনি আর এ সংসারে থাকিবেন না। স্বপ্নে লোকে কতো অদ্ভুত কাণ্ড দর্শন করে। আমি তাঁহার কথায় কোনোরূপ বিশ্বাস স্থাপন করিলাম না। কিন্তু ইহার দুই ঘণ্টা পরে রাত্রি তৃতীয় প্রহরের পর তিনি একটি কন্যা প্রসব করিলেন। এবং প্রসবের অব্যবহিত পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

'স্ত্রীর মৃত্যুর পর এই কন্যাটিকে কিরূপে বাঁচাইব, তাহাই আমার একমাত্র চিন্তা হইল। এই কন্যাটির প্রাণ বাঁচাইবার নিমিত্ত দিবারাত্রি আমি এবং আমার সঙ্গিনী সেই দাসী, দুইজনে যত্ন করিতে লাগিলাম। 'কন্যাটিকে লইয়া অন্যূন এক বৎসর প্রয়াগে অবস্থান করিলাম। বৎসরেক পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিলাম যে, আমার পিতৃরাজ্য জনশূন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। বারম্বার পথপর্যটনে আমার সঙ্গিনী দাসীরও মৃত্যু হইল। তখন কন্যার প্রতিপালনের ভার সম্পূর্ণরূপে আমারই হাতে পড়িল।

'একাকী পিতৃরাজ্যে বাস করিবার আর ইচ্ছা হইল না। দেড় বৎসর বয়স্কা কন্যাটিকে সঙ্গে কাশীতে যাত্রা করিলাম। কাশীতে পৌঁছিয়া প্রায় দশবৎসর কাল সেইখানেই অবস্থান করিতে লাগিলাম। এই সময় আমার অন্য কোনো কার্য ছিল না। আমি কাশীতে অবস্থানকালে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। পিতৃরাজ্য হইতে যে-কিছু অর্থ আনিয়াছিলাম, তদ্দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতাম।

'কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা আমার কিছুই লাভ হয় নাই। অনেক শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি, অনেক বিষয় জানিতে পারিয়াছি, এই প্রকার এক অভিমানের ভাব আমার অন্তরে উদয় হইল। শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা কেবল একটি নূতন রোগের সৃষ্টি হইল। অহঙ্কার এবং অভিমানে হৃদয় পূর্ণ হইল।

'আমার কন্যাটি দিন দিন বড় হইতে লাগিল। আমার হৃদয়ের যত-কিছু

ভালোবাসা স্নেহ এবং দয়া সকলই সেই কন্যাতে অর্পিত হইল। কন্যাও পিতা ভিন্ন আর কিছুই জানিত না। কোনো স্থান হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবামাত্র কন্যা দৌড়িয়া আসিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিত। পৌর্ণমাসী রজনীতে ইহার জন্ম হইয়াছিল, সেই জন্য তাহাকে আমি পূর্ণিমা নাম প্রদান করিয়াছিলাম। কিন্তু পান্না বলিয়াই তাহাকে সম্বোধন করিতাম।

'পান্নার বয়ঃক্রম যখন এগার কি বার বৎসর হইল, তখন একদিন তাহাকে গৃহে রাখিয়া আমি কার্যোপলক্ষে কোনো স্থানে গিয়াছিলাম কিন্তু গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। সমস্ত দিবস স্থানে স্থানে তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। কোথাও তাহাকে দেখিতে না পাইয়া মনে করিলাম যে, বঙ্গদেশের তীর্থ-যাত্রিগণ আমার কন্যাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশের লোকদিগের প্রতি আমার চির ঘৃণা এবং বিদ্বেষের ভাব ছিল।

'আমি এক মুহূর্তও বিলম্ব না করিয়া, সে দিন বঙ্গদেশের যে সকল যাত্রিক গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল, তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বঙ্গদেশাভিমুখে ধাবিত হইলাম। কন্যার অনুসন্ধানে অন্যূন দশ বৎসর আমি বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থান পর্যটন করিতে লাগিলাম। কিন্তু কোথাও তাহার তত্ত্বানুসন্ধান না পাইয়া, প্রায় দশ-বারবৎসর পরে পুনর্বার কাশীতে যাত্রা করিলাম। বঙ্গদেশ পর্যটনকালে কলিকাতা নগরে আমার সঙ্গে প্রয়াগ অঞ্চল নিবাসী নেহালসিংহ নামক এক সুবেদারের আলাপ-পরিচয় হয়। যখন আমি বঙ্গদেশ হইতে কাশীতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলাম, তখন আবার নেহালসিংহের সহিত বক্সারেই সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সেই বক্সারের যুদ্ধেই নেহালসিংহের মৃত্যু হয়। তোমার সঙ্গেও আমার প্রথম বক্সারেই সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধের পর তুমি আমার কথা না শুনিয়া,—"জগৎ লোক শূন্য।"—দেখিবার জন্য এলাহাবাদে চলিয়া গেলে, আমি একাকী কাশীতে আসিয়া মহাদেবের মন্দির-দ্বারে ধরনা দিয়া পড়িলাম। মনে মনে স্থির করিলাম যে আমার কন্যা কোথায় আছে, তৎসম্বন্ধে স্বপ্নাদেশ না হইলে নিশ্চয়ই আমি প্রাণত্যাগ করিব।

'কিন্তু কন্যা কোথা আছে, কে তাহাকে অপহরণ করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে কোনো স্বপ্নাদেশ হইল না। দুই দিবস কাল ধরনা দিয়া পড়িয়া রহিলাম। তখন কেবল তোমার প্রকৃতি এবং অন্যান্য শত শত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মুখচ্ছবি আমার মনোমধ্যে উদয় হইতে লাগিল। তোমার এবং সেই সকল ব্রাহ্মণ-

পণ্ডিতের মুখাকৃতি আমার নিকট কি ভয়ঙ্কর বোধ হইতে লাগিল। দেখিতে লাগিলাম যেন স্বচ্ছ স্বার্থপরতা দ্বেষ হিংসা অহঙ্কার অভিমান এবং অর্থগৃধ্নুতা তোমার এবং অন্যান্য পণ্ডিতগণের মুখমণ্ডল পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তোমরা সকলেই জন্তুর ন্যায় জিগীষা-পরবশ হইয়া পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে ন্যায়শাস্ত্রের বাগযুদ্ধ করিতেছ। তোমাদিগকে স্বপ্নাবেশে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তোমাদিগের সংসর্গ আমার অসহনীয় হইয়া উঠিল। আমি তৎক্ষণাৎ ধরনার অবস্থা হইতে জাগ্রত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্বক গঙ্গাতীরে চলিয়া গেলাম। সায়ংকালে নদীতীরস্থ সুশীতল সমীরণ সংস্পর্শে আমার শরীর একটু স্নিগ্ধ হইল, এবং উত্তেজিত মন একটু সাম্যভাবাবলম্বন করিল। আমি স্বপ্নাবস্থায় তোমাদের যে আকৃতি দেখিয়াছিলাম, সেই আকৃতি স্মরণ করিয়া আবার চিন্তা করিতে লাগিলাম। এই সকল বিষয় ভাবিতে ভাবিতে, তোমাদের বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে লোকের যে দুরবস্থা দেখিয়াছিলাম, তাহাই মনে হইতে লাগিল। বঙ্গদেশ পর্যটন-কালে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকের হাহাকার ধ্বনি সর্বদাই আমি শুনিতাম। অরাজকতা নিবন্ধন বঙ্গের এক এক গ্রামের প্রজাদিগের উপর ইংরাজ বণিকগণ ঘোর অত্যাচার করিতেছিল। এক গ্রামের দশজন লোক একত্র হইলে অনায়াসে ইংরাজের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিত। কিন্তু একজনের উপর যখন অত্যাচার হয়, তখন আর দশজন ইংরাজের প্রসাদাকাঙ্ক্ষী হইয়া, ইংরাজদিগকে সে অত্যাচারের সাহায্য করে। পরে এক এক করিয়া ক্রমে সে অত্যাচার সকলের প্রতিই অনুষ্ঠিত হইতে থাকে।

'তোমার এবং অন্যান্য পণ্ডিতের মুখাকৃতি এবং বঙ্গদেশের প্রজার সেই দুরবস্থা ভাবিতে ভাবিতেই আমার জ্ঞানের উদয় হইল। আমার মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল। যে জন্য সংসারে মানুষ এত কষ্ট পাইতেছে, যে জন্য বঙ্গদেশ অত্যাচারানলে দগ্ধ হইতেছে, তাহার মূল কারণ নির্ণয় করিতে তখন সমর্থ হইলাম। তখন আমার নিজের হৃদয়স্থিত পাপের প্রতিও দৃষ্টি পড়িল। তখন নিশ্চয়ই অবধারণ করিলাম যে, এ সংসারে আমরা সকলেই নিজ নিজ পাপের ফল ভোগ করিতেছি। হৃদয়স্থিত ঘোর স্বার্থপরতা এবং নীচাশয়তাই আমাদের বিনাশের একমাত্র কারণ। সেই স্বার্থপরতা, নীচাশয়তা এবং কাপুরুষতার অনুরোধে আমরা আত্মরক্ষার্থ যে পথ অবলম্বন করি, সে একমাত্র আত্ম-বিনাশের পথ।

এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবামাত্র আমার স্ত্রীর উপদেশ স্মরণ হইতে লাগিল। তখন সেই লক্ষ্মীস্বরূপা আমার প্রাণসমা পত্নীর শোকে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। মনে করিতে লাগিলাম, যে, আমি স্বার্থপরতা, নীচাশয়তা এবং কাপুরুষতার অনুরোধে আত্মরক্ষার্থ ভ্রমে আত্মবিনাশের পথ অবলম্বন করিয়া আমার সহধর্মিণীর প্রাণ সংহার করিয়াছি। তিনি তো প্রজাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কখনো পলায়ন করিতে ইচ্ছা করেন নাই। স্বদেশে থাকিলে কখনো তাঁহার মৃত্যু হইত না। সুদ্ধ কেবল অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় আমার সঙ্গে পথ পর্যটন ক্লেশে তিনি প্রাণ হারাইলেন।

'আমি তখন আপনাকে আপনি স্ত্রীহত্যার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করিলাম, আত্মগ্লানিতে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। "আমি স্ত্রীঘাতক" "আমি স্ত্রীঘাতক"—"আমি স্ত্রীঘাতক"—এই শব্দগুলি তিনবার স্পষ্টাক্ষরে আমার মুখ হইতে বাহির হইল।

'এই সময় কাশ্মীর কোতোয়ালের তিনজন পেয়াদা আমার নিকট দিয়া যাইতেছিল। অন্য কোনো লোক যে আমার নিকট দিয়া যাইতেছে, তাহা আমি দেখিতে পাই নাই। সেই তিনজন পেয়াদা "আসামী পাইয়াছি" বলিয়া, চীৎকার পূর্বক আমাকে ধৃত করিল এবং তৎক্ষণাৎ বন্ধন করিয়া আমাকে কোতোয়ালের নিকট লইয়া চলিল। কোতোয়ালের নিকট আমাকে উপস্থিত করিবামাত্র কোতোয়াল বলিল,—"এ লোকটা সন্ন্যাসী হইবে, ইহাকে কেন ধৃত করিয়া আনিয়াছিস্?"

'পদাতিকগণ বলিল,—"হুজুর ও স্বীকার করিয়াছে, যে ওই খুন করিয়াছে।"

'পদাতিকের কথা শুনিয়া কোতোয়াল তখন বলিল,—"তবে সেই স্ত্রীলোকটার নিকট ইহাকে লইয়া যাও। তাহার এখনো মৃত্যু হয় নাই। তাহাকে জিজ্ঞাসা কর এই ব্যক্তিই তাহার উপপতি ছিল কি না।"

কোতোয়ালের আদেশানুসারে পদাতিকগণ আমাকে সঙ্গে করিয়া একটা স্ত্রীলোকের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। স্ত্রীলোকটা তরবারীর আঘাতে মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। আমাকে দেখাইয়া পদাতিকগণ স্ত্রীলোকটাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এই ব্যক্তি তোর উপপতি ছিল কি না?"

'স্ত্রীলোকটা আমাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল; এবং বারম্বার কপালে করাঘাত পূর্বক বলিতে লাগিল,—"ঠাকুর তোমার সর্বনাশ করিয়াই আমার সর্বনাশ হইয়াছে। আমি টাকার লোভে তোমার মেয়েকে চুরি করিয়া

মহারানীকে দিয়াছিলাম। সেই টাকা লইয়াই আমার সঙ্গে ঝগড়া হইয়াছে। আমাকে ঠাকুর আর শাপ দিও না। আমার পাপের ফল হাতে পাইয়াছি। তোমায় মেয়ে এখন রানী হইয়াছে।”

‘আমি স্ত্রীলোকটার কথা প্রথমতঃ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু পরে শুনিলাম যে, এই স্ত্রীলোকটার একটা উপপতি ছিল, ইহার বৃদ্ধাবস্থায় সে ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া, অন্য উপপত্নী গ্রহণ করে। পরে পূর্বোপার্জিত টাকা লইয়া উভয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। সেই বিবাদ উপলক্ষে ইহার উপপতি প্রাণবিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে ইহাকে তরবারির আঘাত করিয়া সমুদয় টাকা অপহরণ পূর্বক পলায়ন করিয়াছে।

‘পদাতিকগণের নিকট স্ত্রীলোকটা আমাকে নির্দোষী বলিবামাত্র তাহারা আমাকে ছাড়িয়া দিল। আমি পুনর্বার নদীর পারে আসিয়া ভাবিতে লাগিলাম যে বাঙালী যাত্রিকগণ আমার কন্যাকে অপহরণ করিয়াছে বলিয়া, অনর্থক আমি তাহাদিগকে সন্দেহ করিয়াছিলাম। এই স্ত্রীলোকটাই আমার কন্যাকে চুরি করিয়া রাজা বলবন্তসিংহের নিকট দিয়াছে। রাজা বলবন্ত সিংহের প্রতি অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত গঙ্গা পার হইয়া রামনগরে চলিলাম। কিন্তু রাজা কিংবা নবাব-দিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করা সহজ ব্যাপার নহে। তিন-চারিদিনের মধ্যেও বলবন্ত সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না। অবশেষে অনেক কষ্টে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। কিন্তু দরবারের মধ্যে তাঁহার নিকট আমার বক্তব্য বিষয় বলিবার সুযোগ হইবে না বলিয়া পূর্বেই একখানি পত্র তাঁহার নিকট লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। সেই পত্রখানি হাতে দিয়া বলিলাম,—‘মহারাজ গোপনে এই পত্রখানি পাঠ করিবেন।’

‘পত্র প্রদানের পরদিবস বলবন্তসিংহ আমাকে ডাকাইয়া নিয়া গোপনে এক নির্জন গৃহে বসিয়া আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। আমাকে কোপাবিষ্ট দেখিয়া পদতলে পড়িয়া, আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; এবং পূর্ণিমা ও রানী গোলাপকুমারীর সঙ্গে আমাকে সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন *।

---

* চৈৎসিংহের মাতা পান্না অর্থাৎ পূর্ণিমা যে নীচকুলে ভবা ছিলেন না তাহা বলবন্তনামার লেখকও একস্থানে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বলবন্তনামায় লিখিত আছে যে পূর্ণিমা বলবন্তসিংহের পঞ্চম স্ত্রী। বলবন্তনামা লেখক বলেন গোলাপ-কুমারীর গর্ভে বলবন্তসিংহের পুত্র জন্মে নাই বলিয়াই তিনি ক্রমে তিনস্ত্রী গ্রহণ করেন। তৎপরে পূর্ণিমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ণিমাকে বিবাহ করিবার সময় সেই তিনস্ত্রীর মধ্যে যে কেহ জীবিত ছিলেন, তাহার কোনো প্রমাণ নাই।

'আমার পূর্ণিমাকে বলবন্তসিংহ ধর্মপত্নী স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকে রানীর পদ প্রদান করিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া আমি ক্রোধ সম্বরণ করিলাম। পূর্ণিমাকে দেখিবার নিমিত্ত আমার বড়ই ইচ্ছা হইল। মনে করিলাম আমার পূর্ণিমা আমাকে দেখিবামাত্র পূর্বের ন্যায় দৌড়িয়া আসিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিবে।

'কিন্তু এ সংসারের ধন সম্পত্তি অনেক সময়ে হৃদয়কে পাষাণের ন্যায় কঠিন করে। সৌভাগ্যের গর্ব, বিলাস-প্রিয়তা, ঐশ্বর্যাভিমান, প্রভুত্বলিপ্সা মানব হৃদয়কে সময়ে সময়ে স্নেহ, দয়া, ভক্তি ও বিনয় পরিশূন্য করে।

'রাজা বলবন্তসিংহের আদেশানুসারে চারি-পাঁচজন দাসী আমাকে অন্দরের মধ্যে লইয়া চলিল। রানী গোলাপকুমারী এবং পূর্ণিমা উভয়ের সঙ্গেই আমার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা উভয়েই আমার প্রতি যথোচিত পিতৃ-ভক্তি প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু আমার পূর্ণিমাকে আর আমার পূর্ণিমা বলিয়া বোধ হইল না। পূর্ণিমার হৃদয় যেন আবেগহীন হইয়াছে। তাঁহার হৃদয়াবেগ উষ্ণতা পরিশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। সাদর সম্ভাষণে পূর্ণিমা আমাকে যাহা-কিছু বলিলেন, সে সকল কথা তাঁহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইতেছে বলিয়া আমার মনে হইতে লাগিল। সে সকল হৃদয়ের কথা নহে।

'পূর্ণিমার মুখাবলোকন করিয়া আমি আশানুরূপ আনন্দ লাভ করিতে পারিলাম না, বরং আমার মনে আরও কষ্ট বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আমি তখন মনে করিলাম, যে, এ সংসারে পূর্ণিমাই আমার একমাত্র জীবনের অবলম্বন ছিল। কিন্তু তাহার বিবাহ হইয়াছে, তাহার সন্তান-সন্ততি হইয়াছে, তাহার জন্য আমার কোনো চিন্তা করিতে হইবে না। অতএব আমি এখন সংসার পরি-ত্যাগ পূর্বক ভগবানের চরণ অবলম্বন করিব। এই প্রকার স্থির করিয়া হরিদ্বারে চলিয়া আসিলাম। এখানে নির্জনে বসিয়া সর্বদাই ঈশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতাম। তখন বৃক্ষতলই আমার একমাত্র আশ্রয় হইল। প্রায় দুই-তিনবৎসর পর্যন্ত এইরূপে সর্বদাই নয়ন মুদ্রিত করিয়া ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতাম। শরীর ধারণার্থ দুই-একদিন পরে এক-একবার আহার করিতাম। কিন্তু দুই-তিনবৎসরের মধ্যেও ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারিলাম না। কোথায় যে সে অনন্ত ঈশ্বর রহিয়াছেন, কিরূপে যে তাঁহাকে লাভ করা যায়, তৎসম্বন্ধেও কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। তখন আমার মনে নানা সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল। মনে করিতে লাগিলাম যে, হয়তো সে অনন্ত মহান্

ঈশ্বরকে লাভ করিবার প্রকৃত পথ আমি অবলম্বন করিতে পারি নাই। তখন আবার ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। কখনোও নয়ন মুদ্রিত করিয়া চিন্তা করিতে বসিতাম, কখনোও নদীর পারে বসিয়া চিন্তা করিতাম। একদিন অকস্মাৎ একটি কৃষককে ক্ষেত্রে কার্য করিতে দেখিয়া, আমার সেই ভগবৎ গীতার কর্মযোগের কথা স্মরণ হইল। সেইদিন হইতে কর্মযোগের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। অত্যল্পকাল মধ্যেই আবার আপন-জীবনের বিবিধ ভ্রম এবং কুসংস্কার দেখিতে পাইলাম। ক্রমে আমার হৃদয়স্থিত মোহান্ধকার দূর হইতে লাগিল। অবশেষে আমি এই সিদ্ধান্ত করিলাম, এ সংসার মানুষের একমাত্র কার্যক্ষেত্র। এ সংসারে কর্মযোগ ভিন্ন আর মুক্তির উপায় নাই। কর্ম-বিনা জ্ঞান নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। কর্ম-বিহীন-হৃদয় আবেগ-শূন্য হয়। মনুষ্য মাত্রেই ঈশ্বরের সেনা। এ সংসারে প্রত্যেককেই সৈনিক পুরুষ হইতে হইবে। ঈশ্বর প্রদত্ত প্রকৃতি বিবর্জিত হইয়া, আমরা সকলেই বৃথা জীবন যাপন করিতেছি।

'আমার এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কিছুকাল পূর্বে কি পরে ঠিক্ স্মরণ নাই, তুমি এখানে আসিয়াছিলে। আমার ইচ্ছা ছিল তোমাকে এখানে রাখি। কিন্তু তুমি আমার কথা না শুনিয়া, তখন রোহিলখণ্ডে চলিয়া গেলে। আমি তদবধিই এখানে আছি।'

শ্রীনিবাস পণ্ডিতের কথা সমাপ্ত হইবামাত্র বাণেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আমার দুরবস্থা দেখিয়া, আপনার হৃদয়ের মোহান্ধকার কিরূপে দূর হইল, তাহা তো বলিলেন না?'

শ্রীনিবাস ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—'তুমি আমার কথা বোধহয় বিশেষ প্রণিধানপূর্বক শ্রবণ কর নাই। সে কথা তো আমি এখনই বলিয়াছি। স্বপ্নাবেশে যখন তোমার এবং শত শত পণ্ডিতদিগের সেই ভয়ঙ্কর মুখাকৃতি দেখিলাম, যখন তোমাদিগকে হিংস্র-জন্তুর-ন্যায় জিগিষা-পরবশ হইয়া, পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরকে ন্যায়শাস্ত্রের বাগ্‌যুদ্ধ করিতে দেখিলাম; যখন তোমাদিগের মধ্যে কেবল দ্বেষ, হিংসা, অভিমান, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা এবং কাপুরুষতা অবলোকন করিলাম, তখনই আমার মনে হইল যে, জনবিশেষের স্বার্থপরতা সংসারের সকল কষ্ট এবং সকল যন্ত্রণার মূল। একমাত্র স্বার্থপরতাই তোমাকে এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে। আমিও স্বার্থপরতা এবং কাপুরুষতানিবন্ধন স্ত্রীর উপদেশ লঙ্ঘনপূর্বক প্রজাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াই নানা বিপদ ও যন্ত্রণা সহ্য করিতেছি।

বাণেশ্বর। আমার কি স্বার্থপরতা ছিল? আমার উপরেই তো দুর্বৃত্ত মীরণ অত্যাচার করিল।

শ্রীনিবাস। তোমার দেশের অপর কোনো ব্রাহ্মণের প্রতি যদি মীরণ এইরূপ অত্যাচার করিত তবে তুমি কি তাহার সাহায্য করিতে?

বাণেশ্বর। তাহা করিতাম কি না তাহা কিরূপে বলিব? আর আমার সাহায্য করিবার ক্ষমতাই বা কি ছিল? মীরণ দেশের নবাব। আমি তাহার কি করিতে পারি?

শ্রীনিবাস। ক্ষমতা থাকিলেও তুমি কখনো সাহায্য করিতে না। তোমার ক্ষমতা আছে বই কি। এখনোও তোমার মন হইতে স্বার্থপরতা এবং কাপুরুষতা বিদূরিত হয় নাই। এখনোও তুমি ঘোর স্বার্থপরায়ণ। নহিলে ফায়েজাবাদ হইতে সে রোহিলা রমণীদ্বয়কে একাকিনী কাশীতে পাঠাইলে কেন?

বাণেশ্বর। এইরূপ স্বার্থপরতা তো পৃথিবীর সকল লোকের মধ্যেই রহিয়াছে।

শ্রীনিবাস। কষ্ট যন্ত্রণাও পৃথিবীর সকল লোকেই ভোগ করিতেছে।

বাণেশ্বর। তবে সংসারের প্রত্যেক লোক কি আপন স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিয়া কেবল পরোপকার করিতে থাকিবে?

শ্রীনিবাস। ইহার মধ্যে পরোপকারের কোনো কথা নাই। মানুষ ঈশ্বর হইতে যে প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই প্রকৃতি রক্ষা করিতে পারিলেই সে সুখী হইতে পারে। আর সেই প্রকৃতি বিবর্জিত হইলেই সে কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করে। শরীর সম্বন্ধেও এই নিয়ম। মানবিক কার্যকলাপ সম্বন্ধেও এই নিয়ম। শরীর, স্বাভাবিক প্রকৃতিভ্রষ্ট হইলেই রোগগ্রস্ত হয়। রোগই শারীরিক দুঃখ-কষ্টের একমাত্র কারণ। আর মনও স্বাভাবিক ধর্ম কিংবা স্বাভাবিক অবস্থা বিবর্জিত হইবামাত্র কুকার্যে রত হয়। সেই কুকার্য এবং কর্তব্য লঙ্ঘনই মানুষের বিপদের মূল কারণ।

বাণেশ্বর। মনের স্বাভাবিক অবস্থা কি?

শ্রীনিবাস। স্বাভাবিক অবস্থায় মন হৃদয়াবেগ দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্তব্য সাধন করে। তখন কুটিলতা, দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থপরতা মনের সে গতিকে অবরোধ করে না। কর্তব্য সাধন করিলে সম্পত্তি লাভ হইবে সে চিন্তা তখন মনে প্রবেশ করে না।

বাণেশ্বর। আপনার এ কথার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

শ্রীনিবাস। এ কথাটা বুঝিতে পারিলে না। তবে তোমার নিজের কার্য

এবং কথার দ্বারাই তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি। তুমি কি উদ্দেশ্যে রোহিল-খণ্ড হইতে সেই বৃদ্ধা রোহিলা রমণীকে সঙ্গে করিয়া স্থানে স্থানে তাহার কন্যার অন্বেষণার্থ ভ্রমণ করিয়াছিলে?

বাণেশ্বর। আমার কোনো উদ্দেশ্যই ছিল না। সেই রমণীর দুঃখ দেখিয়া মনে বড়ই কষ্ট হইল। তখন মনে করিলাম যে, যদি আমার প্রাণ বিসর্জন দিয়াও ইহার কন্যাকে আনিয়া দিতে পারি, তবে ইহার কষ্ট দূর হইবে।

শ্রীনিবাস। তবে কেবল তাহার দুঃখ দেখিয়াই তোমার মনের মধ্যে এইরূপ একটি আবেগের সঞ্চার হইয়াছিল?

বাণেশ্বর। হাঁ তা বই কি? মনের মধ্যে এইরূপ একটা আবেগের উদয় হইয়াছিল বলিয়াই তাহাকে সঙ্গে করিয়া ফায়েজাবাদে চলিয়া গেলাম।

শ্রীনিবাস। তবে মনের সেই আবেগই কেবল তোমাকে এই কষ্টকর কার্যে, এই দুঃসাধ্য ব্যাপার সাধনে, নিযুক্ত করিল।

বাণেশ্বর। হাঁ—তাই তো—।

শ্রীনিবাস। তবে সেই মনের সদ্ভাবের নামই হৃদয়াবেগ। অগ্র-পশ্চাৎ, ভালো-মন্দ-হিতাহিত, কিছুই বিবেচনা না করিয়া, মানুষ যখন কেবল এই প্রকার হৃদয়ের সদ্ভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্তব্য সাধন করে, তখনই সে প্রকৃত কর্মযোগী। তখনই তাহার মনের স্বাভাবিক অবস্থা সংরক্ষিত হয়। আর প্রত্যেক কার্যের পূর্বেই যাহারা কেবল লাভালাভ হিসাব করে, তাহারা স্বার্থপরায়ণ, নীচাশয় এবং কাপুরুষ। চরমে তাহাদিগকে তোমার এবং আমার ন্যায় দুরবস্থাপন্ন হইতে হয়।

বাণেশ্বর। মানুষ কি কখনো লাভালাভ এবং হিতাহিতের হিসাব না করিয়া কার্য করিতে পারে?

শ্রীনিবাস। নিশ্চয়ই পারে। প্রকৃতিভ্রষ্ট না হইলে নিশ্চয়ই পারিবে। তুমিও তো তাহা এ জীবনে একবার করিয়াছ। তুমি তো লাভালাভ হিসাব করিয়া বৃদ্ধার সঙ্গে ফায়েজাবাদ যাও নাই।

বাণেশ্বর। এমন মানুষ তো সংসারে দেখি না, যে লাভালাভের হিসাব না করিয়া কর্তব্য সাধন করে।

শ্রীনিবাস। সংসারে এইরূপ মানুষ আছে, কি না, কিম্বা থাকিলে কত জন আছে, বলিতে পারি না। কিন্তু পরমেশ্বরের প্রতি এবং পরমেশ্বরের ন্যায় বিচারের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে, মানুষ অনায়াসেই আপন হৃদয়স্থিত

সদ্ভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া দুঃসাধ্য ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে পারে। অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে পারে, পর্বত উল্লঙ্ঘন করিতে পারে। যাহার ঈশ্বরেতে বিশ্বাস নাই, সে প্রকৃত কর্মযোগী হইতে পারে না। এক-প্রকার, না এক-প্রকার ফলের প্রত্যাশায় সে কর্তব্য-কর্ম সাধন করে। সেই ফল প্রত্যাশাই ক্রমে ঘোর স্বার্থপরতায় পরিণত হয়। স্বার্থপরতাই মানুষের বিনাশের কারণ। আমি স্বার্থপরতার অনুরোধে আপন প্রজাদিগকে শত্রু-হস্তে পরিত্যাগ করিয়া, এ দুরবস্থা ভোগ করিতেছি। তোমাদিগের বঙ্গদেশের সমুদয় লোক কেবল আপন স্ত্রী-পুত্র-রক্ষণই আত্মরক্ষার পথ মনে করিয়া দিন দিন বিপদগ্রস্ত হইতেছে।

বাণেশ্বর। তবে আপনি বঙ্গদেশের লোকদিগকে কি করিতে বলেন? পূর্বে কয়েক দিন মীরণের অত্যাচার ছিল। এখন তো ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির লোক মীরণ অপেক্ষাও শতগুণে অত্যাচার করিতেছে।

শ্রীনিবাস। সত্যেরপ্রতি, ঈশ্বরের ন্যায় বিচারের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, প্রত্যেক বাঙালী যদি দেশব্যাপ্ত অত্যাচার নিবারণার্থ চেষ্টা করে, তবে আর কাহাকেও এ অত্যাচারানলে দগ্ধ হইতে হয় না। ঈশ্বরের ন্যায়-বিচারের প্রতি বিশ্বাস নাই, এই জন্য বাঙালী কাপুরুষ। আর আত্মাভিমান এবং অহংকার তাহাদিগের হৃদয়স্থিত সদ্ভাব বিনাশ করিয়াছে বলিয়াই তাহারা ঘোর স্বার্থপর। এই স্বার্থপরতা এবং কাপুরুষতাই তাহাদের বিনাশের মূল কারণ।

বাণেশ্বর। ঠাকুর, দেশসুদ্ধ সমুদয় লোকই যখন স্বার্থপরায়ণ এবং কাপুরুষ হইয়া পড়িয়াছে, তখন দুই-একজন লোক স্বার্থপরতা পরিত্যাগ এবং কাপুরুষতা পরিহার করিলে কি উপকার হইবে?

শ্রীনিবাস। তুমি বারম্বার উপকার অনুপকারের কথা তুলিতেছ কেন? লাভালাভ, উপকার অনুপকারের কোনো কথাই ইহার মধ্যে নাই। যে ব্যক্তি আপনার হৃদয়স্থিত স্বার্থপরতা এবং কাপুরুষতা পরিত্যাগ করিবে, সেই কেবল পশুত্ব পরিহার করিয়া মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে। দশজনে স্বার্থপরতা এবং কাপুরুষতা পরিহার না করিলে, আমিও স্বার্থপরতা এবং কাপুরুষতা পরিহার করিব না, এইরূপ যাহার মনের ভাব সে কখনো মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না।

বাণেশ্বর। তবে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাকেই কি আপনি মনুষ্যত্ব লাভ করা বলিতেছেন?

শ্রীনিবাস। মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে মরিতে হইবে কেন?

বাণেশ্বর। তা বই কি, যখন দেশসুদ্ধ লোক স্বার্থ-পরায়ণ এবং কাপুরুষ, তখন প্রথমে যে ব্যক্তি কাপুরুষতা পরিহার করিবে নিশ্চয়ই তাহাকে মরিতে হইবে।

শ্রীনিবাস। মনুষ্যত্ব লাভ করিবার নিমিত্ত যদি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হয় তাহাও ভালো। তুমি এবং আমি যে শোক দুঃখ এ জীবনে সহ্য করিতেছি, তাহাপেক্ষা কি মৃত্যু শতগুণে প্রার্থনীয় নহে?

বাণেশ্বর। এ ঠিক কথা বলিয়াছেন। মৃত্যুই আমাদের পক্ষে ভালো ছিল। কিন্তু অদৃষ্টে দুঃখ থাকিলে মৃত্যুকেও লাভ করা যায় না। মরিবার নিমিত্ত তো গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছিলাম। কিন্তু পাপী বলিয়া ভগবতী গঙ্গাও আমাকে গ্রহণ করিলেন না। বেরুচ এবং গোরক্‌পুরের লোকেরা বেশ করিতেছে। তাহারা এখন আর মৃত্যুকে ভয় করে না। স্ত্রী-পুরুষ একত্র হইয়া ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে।

শ্রীনিবাস। বেরুচ এবং গোরক্‌পুরে কি হইয়াছে?

বাণেশ্বর। যাহা হইয়াছে তাহা আর কি বলিব। ইংরাজের লোকেরা খাজনা আদায় উপলক্ষে দেশসুদ্ধ স্ত্রী-পুরুষের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলে পর, দেশের স্ত্রী-পুরুষ একত্র হইয়া অস্ত্রধারণ পূর্বক ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে।

শ্রীনিবাস। বেরুচ এবং গোরক্‌পুরের নিকটস্থ অন্যান্য জেলার লোক আসিয়া কি তাহাদিগের সঙ্গে যোগ দিয়াছে?

বাণেশ্বর। অযোধ্যা এবং রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত প্রায় সমুদয় জেলায় এইরূপ অত্যাচার হইতেছে। কোনো জেলার লোকই সুখে নাই। তবে গোরক্‌পুর এবং বেরুচেই ঘোরতর অত্যাচার হইয়াছে।

এই অত্যাচারের কথা শ্রবণমাত্র শ্রীনিবাসের দুই চক্ষু হইতে অবিরল অশ্রু বিসর্জিত হইতে লাগিল। তিনি সজলনয়নে বলিতে লাগিলেন,—'হা বিধাতঃ! আমার পিতা-পিতামহ অস্ত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। অনাথা এবং দুর্বলকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহারা অস্ত্রধারণ করিতেন। আমি কুলাঙ্গার, পিতার কুপুত্র, অস্ত্রশিক্ষা না করিয়াই ঈদৃশ ঘৃণিত জীবন যাপন করিতেছি। মানুষ মাত্রেই ঈশ্বরের সেনা। এ সংসারে প্রত্যেকেই সৈনিক-পুরুষ হইতে হইবে। হায় হায় ঈশ্বর প্রদত্ত প্রকৃতি বিবর্জিত হইয়াই বৃথা জীবন যাপন করিতেছি।'

বাণেশ্বর শ্রীনিবাসের এই আত্মলোক্তি শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—ঠাকুর

কিরূপে আমাদের দেশের লোক সৈনিক-পুরুষ হইবে? কি প্রকারে তাহারা অস্ত্রশিক্ষা করিবে? মীরজাফর বঙ্গের সুবাদার হইবার পর আর হিন্দুদিগকে সৈনিক-দল-ভুক্ত করেন না। তাঁহার বিশ্বাসী কেবল দুই-একজন মুসলমানকেই সৈনিক পুরুষের পদ প্রদান করিতেছেন। মেদিনীপুরের রাজা রামরামসিংহ বিদ্রোহী হইলে পর এই নিয়ম করিয়াছেন।

শ্রীনিবাস বাণেশ্বরের এই কথা শ্রবণমাত্র কোপাবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন,—'নরপিশাচ, কামাসক্ত, লম্পট মীরজাফরের কথা মুখেও আনিও না। যে রাজা প্রজাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া, আপন রাজপদ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে সে রাজা নহে, সে দস্যু। রাজা সর্বদাই প্রজাদিগের মঙ্গল সাধনের চেষ্টা করিবেন, প্রজাগণ যাহাতে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে তাহাই করিবেন। কিন্তু বঙ্গের দস্যু-কামাসক্ত-লম্পট মীরজাফর—প্রজাদিগের হস্ত পদ কর্তন করিয়া তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিতে চাহেন। বঙ্গবাসিগণ যদি মানুষ হইত, তবে এ নরপিশাচ মীরজাফরকে তৎক্ষণাৎ সিংহাসনচ্যুত করিতে চেষ্টা করিত। রাজা কে? রাজা প্রজার ভৃত্য। প্রজাগণ যাহাকে স্বেচ্ছাপূর্বক রাজা বলিয়া স্বীকার করিবেন সেই প্রকৃত রাজা। প্রজাগণের রাজভক্তির উপর যাহার সিংহাসন সংস্থাপিত নহে সে কি রাজা? সে যে দস্যু। মীরজাফরকে তুমি রাজা বলিলে কেন? মীরজাফর সত্য সত্যই দস্যু। তাহার সে অপবিত্র নাম মুখে আনিলেও হৃদয় কলুষিত হয়।'

বাণেশ্বর। মহাশয়, ঈশ্বরের চক্ষে, ন্যায়ের দৃষ্টিতে এবং রাজধর্মানুসারে মীরজাফর দস্যু হইতে পারে। কিন্তু মীরজাফরের বিরুদ্ধে যদি কেহ অস্ত্র ধারণ করে, তবে তো তাহাকে রাজদ্রোহী বলিয়া দণ্ডনীয় হইতে হইবে। এই তো সে দিন আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলাম, গোরক্ষপুরের দেড়শত লোককে কর্নেল হ্যানে খাজনা আদায় করিবার নিমিত্ত কয়েদ রাখিয়া বিবিধ যন্ত্রণা এবং শারীরিক কষ্ট প্রদান করিতেছিল। সেই সকল কয়েদীর স্ত্রী-পুত্র অস্ত্র হাতে করিয়া, তাহাদিগের উদ্ধারার্থ কর্নেল হ্যানের মালকাছারিতে পৌঁছাইবামাত্র কর্নেল হ্যানের হুকুমানুসারে তাহার লোকেরা প্রায় বিশজন কয়েদীর মাথা কাটিয়া তাহাদের স্ত্রী-পুত্রদিগের সম্মুখে সেই ছিন্ন মস্তক

* Eighteen persons were beheaded—Vide The papers relating to the trial of Hestings.

নিক্ষেপ করিল। লক্ষ্ণৌ নবাব-দরবারে এই সংবাদ পৌঁছিলে পর ইংরাজ রেসিডেন্ট এবং নবাব আসফউদ্দৌলার বিচারে সাব্যস্ত হইল যে, রাজবিদ্রোহীর প্রাণদণ্ড করিলে কোনো অপরাধ হয় না। সুতরাং কর্নেল হ্যানে আঠারজন লোককে খুন করিয়াও দোষী সাব্যস্ত হইল না।

বাণেশ্বরের মুখে এই বিশজন লোকের প্রাণ সংহারের কথা শ্রবণমাত্র শ্রীনিবাস আকস্মাৎ মূর্ছিত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। শ্রীনিবাসের হৃদয় বাল্যকাল হইতে দয়া-মায়া এবং স্নেহে পরিপূর্ণ। তাঁহার চরিত্র অতি নির্মল। তিনি ধনীর সন্তান হইলেও কামাসক্ত ছিলেন না। একজন শিষ্য তখন গৃহে প্রবেশ করিয়া শ্রীনিবাসের মস্তকে জলসিঞ্চন করিতে লাগিল। কিছুকাল পরে শ্রীনিবাস চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—'হায় হায় অর্থের লোভে মানুষের উপর মানুষ এত অত্যাচারও করে।'

এই বলিয়াই তিনি নয়ন মুদ্রিত করিলেন। কিছুকাল পরে তিনি বদ্ধাঞ্জলি হইয়া করপুটে বলিয়া উঠিলেন,—'ভগবন্ অনাথের নাথ এদেশীয় লোকের পাপের ভোগ কি এখনোও শেষ হয় নাই। আজ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত এই অত্যাচারানল প্রজ্বলিত হইয়াছে।'

ইহার পর শ্রীনিবাস এবং বাণেশ্বর একত্রে আহারাদি করিয়া পরামর্শ করিলেন যে, তাঁহারা উভয়েই একত্র হইয়া অযোধ্যায় গমন করিবেন। বাণেশ্বর যোগসাধনে জীবন যাপন করিবেন বলিয়া এখানে আসিয়াছেন। কিন্তু শ্রীনিবাস তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, চিত্তশুদ্ধি না হইলে, কোনো যোগই সংসিদ্ধ হইবে না। কর্মযোগ ভিন্ন জ্ঞান পরিপক্ক হয় না। কর্মশূন্য জ্ঞান মানব মনে কেবল অভিমান এবং অহঙ্কারস্বরূপ রোগ উৎপাদন করে। অভিমান এবং অহঙ্কার হইতে স্বার্থপরতা সমুৎপন্ন হয়। স্বার্থপরতা হইতে কাপুরুষতাই মানুষকে পশু-জীবন প্রদান করে।

বাণেশ্বর মুখে "অসার সংসারে প্রভুর চরণ সার" বলিতেছেন; কিন্তু এখনোও সময়ে সময়ে পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ লাভ আশা তাঁহার অন্তরে উদয় হয়। তিনি প্রথমতঃ অযোধ্যার যাইতে অসম্মত হইলেন। তখন শ্রীনিবাস পণ্ডিত তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন,—'হয়তো এবার অযোধ্যায় গেলে তোমার পুত্রের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হইতে পারে।'

বাণেশ্বর বলিলেন,—'সে আশা আর আমার নাই। আমার পুত্র এখনোও জীবিত থাকিলে হাকেজনন্দিনীর প্রেমপাশেই আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু

অযোধ্যাবাসী লোকের ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি যে, হাফেজ-নন্দিনী নামে কখনো কোনো স্ত্রীলোক অযোধ্যায় ছিল না।

শ্রীনিবাস বলিলেন,—'তুমি নিতান্ত নির্বোধ। হাফেজ-নন্দিনী নামে কোনো স্ত্রীলোক অযোধ্যায় থাকিবার একেবারেই সম্ভব নাই। ফায়েজাবাদের সেই সিপাহী তোমার নিকট বোধহয় যথার্থ কথা বলিয়াছে। ফায়েজাবাদের নবাবের কন্যাকে হয়ত তোমার পুত্র হাফেজ-নন্দিনী নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। আপন প্রণয়িনীকে একটা নূতন নাম প্রদান করিয়াছিলেন। ফায়েজাবাদের নবাব হাফেজ রহমত খাঁর সঙ্গে আমার পিতা-পিতামহের আলাপ-পরিচয় ছিল। আমার বোধহয় হাফেজ রহমত খাঁর কন্যার প্রণয়পাশেই তোমার পুত্র আবদ্ধ হইয়াছেন। অযোধ্যায় ভ্রমণকালে "ফায়েজাবাদের নবাব-কন্যা কোথায় আছেন" এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে নিশ্চয়ই তুমি তোমার পুত্রের অনুসন্ধানে কৃতকার্য হইতে। তুমি আবার আমার সঙ্গে একত্রে অযোধ্যায় চল। সেখানে তোমার পুত্রেরও অনুসন্ধান করিব; আর অযোধ্যাবাসী সেই নিপীড়িতদিগকে যদি কোনো প্রকারে আমরা সাহায্য করিতে পারি তবে তাহার চেষ্টা দেখিব।

বাণেশ্বর বলিলেন,—'আমরা কিরূপে সাহায্য করিব? আমাদের কি আর অস্ত্রধারণ করিবার ক্ষমতা আছে। আপনি যথার্থ কথাই বলিয়াছেন, যাহার অস্ত্রধারণ করিবার ক্ষমতা নাই সে মানুষই নহে। অশীতি-বৎসর-বয়স্ক বৃদ্ধ হাফেজ রহমত খাঁ ঠিক্ কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্মদেবের ন্যায় রোহিলাযুদ্ধে শরশয্যায় শয়ন করিলেন। আমি তাঁহার বীরত্ব দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম।

শ্রীনিবাস বাণেশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—'হায়,—এ জীবন বৃথা যাপন করিলাম। হাফেজ রহমত খাঁ আশি-বৎসর-বয়সের সময় সংগ্রাম ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছে। আর আমি যৌবনকালে দ্বাবিংশতি বৎসর বয়সের সময় নাদের শাহার আক্রমণের কথা শুনিয়াই রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিলাম। ধিক্ এ জীবনে; ধিক্ এ জীবনে। এখনো আমার আশি বৎসর বয়স হয় নাই। প্রায় চৌষট্টি বৎসর হইয়াছে। যদি সহজে অস্ত্রশিক্ষার সুবিধা থাকিত, তবে না হয় এই বৃদ্ধ বয়সে অস্ত্রশিক্ষা করিতে আরম্ভ করিতাম। তিন বৎসর অস্ত্রশিক্ষা করিয়া এ অত্যাচার নিপীড়িতদিগের সাহায্যার্থে একবার অস্ত্রধারণ পূর্বক মানবজীবন সার্থক করিতাম।'

মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া বাণেশ্বরকে বলিলেন,—'চল একবার অযোধ্যায় যাই। অন্ততঃ একজন রোগীকে এক বিন্দু জল, ক্ষুধার্তকে দুইটি অন্ন প্রদান করিয়াও তাহাদের সাহায্য করিতে পারিব।'

বাণেশ্বরের পুত্র-দর্শন-আশা মনোমধ্যে আবার পুনরুদ্দীপ্ত হইল। তিনি অযোধ্যায় যাইতে সম্মত হইলেন। শ্রীনিবাস এবং বাণেশ্বর একত্র হইয়া অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়

কুটিলতার প্রায়শ্চিত্ত

কুটিলতা এবং কপটাচরণ সর্বদাই মানুষকে কুপথে পরিচালন করে। অন্তরস্থিত কুটিলতা-নিবন্ধন মানুষের হিতাহিত এবং ন্যায়-অন্যায়-বিচারশক্তি একেবারে বিনষ্ট হয়। কুটিল মন সর্বদাই অন্যের ব্যবহার এবং আচরণের মধ্যে একটা-না-একটা দুরভিসন্ধি অনুসন্ধান করে, সুতরাং কুটিলের অনেক সময়েই বন্ধুকে শত্রু এবং শত্রুকে বন্ধু বলিয়া মনে হয়।

হৃদয়-স্থিত কুটিলতা নিবন্ধন বেনারসের রাজা চেৎসিংহ স্বীয় বিমাতা মহারানী গোলাপকুমারীকে এবং জ্যেষ্ঠতাত পুত্র মনিয়ারসিংহকে এখনো শত্রু বলিয়া মনে করেন। গোলাপকুমারী কোনো সৎপরামর্শ প্রদান করিলেও তিনি তাঁহাকে শত্রু মনে করিয়া, তাঁহার কোনো উপদেশানুসারে কার্য করেন না।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, যে নবাব সুজাউদ্দৌলার মৃত্যুর পর ১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দের মে মাসে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে যখন নবাব আসফউদ্দৌলার নূতন সন্ধি সংস্থাপিত হয়, তখন চেৎসিংহের রাজ্য অযোধ্যার সুবেদারি হইতে পৃথক করা হয়, এবং বেনারস গাজিপুর জৌনপুর প্রভৃতি প্রদেশ সুবে-বাংলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এই সময়ে দিল্লীর বাদশাহের কোনো ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং সুবে-বাংলা সুবে-আউদ্ কেবল নাম মাত্রেই সুবে। দেশের প্রকৃত অবস্থানুসারে তখন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিই সুবে-বাংলার স্বাধীন রাজা। আর অযোধ্যার উজীরই সুবে-অযোধ্যার রাজা।

চেৎসিংহের রাজ্য সুবে-আউদ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, সুবে-বাংলার

অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রস্তাব হইলে পর, রানী গোলাপকুমারী চেৎসিংহকে এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। রানী বিশেষ করিয়া চেৎসিংহকে বুঝাইয়া বলিয়াছেন যে, বেনারসের রাজগণ দিল্লীর বাদশাহকে কর-প্রদান-পূর্বক চিরকাল রাজ্য-ভোগ করিতেছেন। অযোধ্যার উজিরের সঙ্গে বেনারসের রাজার পূর্বে কোনো সম্বন্ধ ছিল না। এখন অযোধ্যার উজির কেবল দিল্লীর বাদসাহের প্রতিনিধি স্বরূপ বাদশাহের প্রাপ্য কর আদায় করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। উজির নিজে বাদশাহের অধীনতা স্বীকার না করিলেও, বেনারসের রাজাকে মনে করিতে হইবে যে বাদশাহের প্রাপ্য কর উজিরের মারফতে আদায় হইতেছে। উজিরের কোনো ক্ষমতা নাই যে তিনি এ রাজ্য কোনো সুবাদারের হাতে অর্পণ করেন।

কিন্তু চেৎসিংহ রানী গোলাপকুমারীর পরামর্শ শ্রবণ করিলেন না। তিনি মনে করিলেন, যে রানী গোলাপকুমারী তাঁহার শত্রু। তাঁহার মনে আরও এক দুরভিসন্ধির উদয় হইল। কুটিল এবং নিস্তেজ মনে এইরূপ ভাবেরই উদয় হয়। তিনি মনে মনে আশা করিতে লাগিলেন যে, এই বন্দোবস্ত দ্বারা ভবিষ্যতে তিনি স্বাধীন রাজা হইতে পারেন। ইংরাজেরা বিদেশীয় লোক। বাণিজ্য করিতে এ দেশে আসিয়াছে। হয় তো কয়েক বৎসর পরেই ইহারা চলিয়া যাইবে। এ দিকে দিল্লীর বাদশাহও ক্ষমতাশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। কেবল এক অযোধ্যার উজিরই তাঁহার উপর প্রভুত্ব করিয়াছেন। সুতরাং উজিরের অধীনতা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেই তিনি একেবারে স্বাধীন রাজা হইয়া পড়িবেন।

এই প্রকার বৃথা আশায় প্রতারিত হইয়া চেৎসিংহ দিল্লীর বাদশাহের প্রাপ্য কর সুবে-বাংগার দেওয়ান ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে দিতে সম্মত হইলেন।

চেৎসিংহের সঙ্গে কি প্রকার বন্দোবস্ত হইবে, সেই বিষয় লইয়া কলিকাতা কৌন্সিলে বাদানুবাদ হইতে লাগিল। কলিকাতা কৌন্সিলে সর্বশুদ্ধ পাঁচজন মেম্বর। তন্মধ্যে গবর্নর জেনেরল ওয়ারেন হেস্টিংস সভাপতি। জেনেরল ক্লেবারিং, কর্নেল মনসন্, রিচার্ড বারওয়েল এবং ফিলিপ ফ্রান্সিস্—এই চারিজন কৌন্সিলের মেম্বর।

কৌন্সিলের প্রথম প্রস্তাব হইল, চেৎসিংহের নিকট হইতে কোনো কর গ্রহণ করা হইবে কি না?

এই প্রস্তাবে রিচার্ড বারওয়েল সাহেব বলিলেন,—'চেৎসিংহের নিকট হইতে

কোনো কর গ্রহণ করা উচিত নহে। চেৎসিংহের রাজ্য আমাদের রাজ্যের সংলগ্ন। তাঁহাকে মিত্ররাজা মনে করিয়া সর্বদাই তাঁহার সঙ্গে বন্ধুত্বভাব সংরক্ষণ করিতে হইবে। তাঁহার উপর কোনো কর ধার্য করিলে তিনি কর প্রদানের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার নিমিত্ত আমাদিগের কোনো শত্রুর সঙ্গে যোগ দিতে পারেন।'

কিন্তু গবর্নর জেনেরল এবং কৌন্সিলের অন্য তিনজন মেম্বার বারওয়েল সাহেবের সঙ্গে মতৈক্য হইল না। অধিকাংশের মতানুসারে স্থিরীকৃত হইল, যে চেৎসিংহের নিকট হইতে উজীর যে পরিমাণ কর গ্রহণ করিতেন, তদপেক্ষা তিনলক্ষ টাকা ন্যূন কর ধার্য করা হইবে। অধিকাংশের মতানুসারে বাইশ লক্ষ ছয়ষট্টী হাজার একশত আশি টাকা কর ধার্য করা হইল।

কিন্তু উজীরের আমলে নামেই কেবল পঁচিশ লক্ষ টাকা কর ধার্য ছিল। চেৎসিংহকে বার্ষিক পাঁচ-ছয় লক্ষের অধিক কর দিতে হইত না।

দ্বিতীয় প্রস্তাব। নূতন সন্ধিপত্রে এই প্রকার প্রতিজ্ঞা থাকিবে যে চেৎসিংহ আপন রাজ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সহকারে ক্ষমতা সঞ্চালন করিবেন। তাঁহার এই কর প্রদান ভিন্ন অন্য কোনো বিষয়ে ইংরাজ গবর্নমেণ্টের অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে না। এই নির্ধারিত করের অতিরিক্ত একটি পয়সাও তাঁহার নিকট দাবি করা যাইবে না।

এই প্রস্তাবে ফ্রান্সিস বলিলেন (Yes) হাঁ।

গবর্নর জেনেরল। (Yes) হাঁ।

বারওয়েল। (Yes) হাঁ।

জেনেরল ক্লেবারিং বলিলেন,—'চেৎসিংহ নিয়মিতরূপে কর আদায় করিলেই সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকিবেন।' কর্নেল মন্সন এই প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ পূর্বক বলিলেন,—'ইহাতে কোম্পানির কোনো লাভ নাই। ইহাতে কোম্পানির অধিকার একপ্রকার খর্ব করা হইবে।'

অধিকাংশের মতানুসারে স্থিরীকৃত হইল, চেৎসিংহ পূর্ণ স্বাধীনতা সহকারে স্বরাজ্যে আপন ক্ষমতা সঞ্চালন করিবেন। ইংরাজদিগকে কেবল তাঁহার নির্দিষ্ট কর দিতে হইবে। ইংরাজেরা কোনো কারণেই ভবিষ্যতে কখনো তাঁহার কর বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না, কিংবা তাঁহার উপর অন্য কোনো প্রকার দাবি-দাওয়া করিতে পারিবেন না।

এই সকল প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইলে পর চেৎসিংহ ইংরাজদিগকে কর প্রদান

করিবেন বলিয়া এক কবুলনামা লিখিয়া দিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে ইংরাজেরা অঙ্গীকার করিলেন যে চেৎসিংহের উপর তাঁহারা ভবিষ্যতে আর কোনো দাবি করিতে পারিবেন না; চেৎসিংহের দেয় কর কখনো বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না।

১৭৭৫, ১৭৭৬, ১৭৭৭—এই তিন সনের দেয় কর চেৎসিংহ নিয়মিতরূপে প্রদান করিলেন। ১৭৭৮ সনে ইংরাজদিগের সঙ্গে ফরাশিদের যুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। এই যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহার্থ গবর্নর জেনেরল ওয়ারেন হেস্টিংস চেৎসিংহের নিকট নিয়মিত কর ভিন্ন বার্ষিক আর পাঁচলক্ষ টাকা অতিরিক্ত দাবি করিলেন। পূর্বোল্লিখিত সন্ধি অনুসারে ইংরাজদিগের এই প্রকার টাকা দাবি করিবার কোনো ক্ষমতা ছিল না। কৌন্সিলের মেম্বার জেনেরল ক্লেবারিং এবং মন্সনের মৃত্যু হইয়াছে। ফ্রান্সিস সাহেব এবং হুইলার সাহেব গভর্নর জেনেরলের এই অন্যায় দাবিতে সম্মতি প্রদান করিলেন না। কিন্তু এখন ওয়ারেন হেস্টিংসের মতানুসারেই কৌন্সিলের সকল কার্য নির্বাহ হইতেছে। ওয়ারেন হেস্টিংস এবং বারওয়েল সাহব এক পক্ষ। হুইলার এবং ফ্রান্সিস অপর পক্ষ। সমানে সমানে মতভেদ স্থলে সভাপতির মতানুসারেই কার্য হয়। হেস্টিংসের মতই প্রবল হইল। চেৎসিংহের উপর অতিরিক্ত পাঁচলক্ষ টাকার দাবি হইল।

চেৎসিংহ টাকা দিতে প্রথমতঃ আপত্তি করিলেন। কিন্তু পরে ইংরাজদিগের ভয়ে অগত্যা কেবল এই বৎসরের নিমিত্ত পাঁচলক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইলেন; এবং অবিলম্বে পাঁচলক্ষ টাকা ইংরাজদিগকে প্রদান করিলেন।

কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস যে চেৎসিংহের সর্বনাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন; তাহা এখন পর্যন্তও চেৎসিংহ বুঝিতে পারেন নাই। ওয়ারেন হেস্টিংসের পদত্যাগের ইস্তফা-পত্র লইয়া যখন কলিকাতায় গোলযোগ হইয়াছিল, যখন ওয়ারেন হেস্টিংসকে পদচ্যুত করিয়া জেনেরল ক্লেবারিং গবর্নরের পদ গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন চেৎসিংহের পক্ষ হইতে একজন লোক জেনেরল ক্লেবারিং-এর সাহায্যার্থ মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই কথা ক্রমে ওয়ারেন হেস্টিংসের কর্ণগোচর হইল। ওয়ারেন হেস্টিংস চেৎসিংহের সর্বনাশ করিবেন বলিয়া, সেই সময় হইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। কিন্তু ১৭৭৮ সনের পূর্বে তাঁহার এই দুরভিসন্ধি সংসাধনের সুযোগ উপস্থিত হইল না।

এদিকে ১৭৭৮ সনে চেৎসিংহ অতিরিক্ত পাঁচলক্ষ টাকা প্রদান করিয়া মনে মনে আশা করিলেন যে, ইংরাজেরা আর তাহার নিকট কোনো অতিরিক্ত

কর চাহিবে না। কিন্তু ১৭৭৯ সনেও ওয়ারেন হেস্টিংস বার্ষিক অতিরিক্ত পাঁচলক্ষ টাকা চাহিলেন।

চেৎসিংহের রাজ্যের মোট রাজস্ব চল্লিশ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে প্রায় তেইশ লক্ষ টাকা ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে কর দিতে হয়, সুতরাং এই অতিরিক্ত পাঁচলক্ষ টাকা তাঁহার আর দিবার সাধ্য নাই। তিনি অত্যন্ত বিনীত ভাবে হেস্টিংসের নিকট লিখিলেন যে তাঁহার এই অতিরিক্ত টাকা প্রদান করিবার সাধ্য একেবারেই নাই। হেস্টিংস তাঁহার উপর কোপাবিষ্ট হইয়া লিখিলেন যে এ টাকা অবশ্য তাঁহাকে দিতে হইবে।

কাপুরুষ চেৎসিংহ গৃহের মণিমুক্তা বিক্রয় করিয়া ১৭৭৯ সনের বাবত আবার পাঁচলক্ষ টাকা দিলেন।

১৭৮০ সনে আবার চেৎসিংহের উপর পাঁচলক্ষ টাকার দাবি হইল। চেৎসিংহ কাতরে হেস্টিংসকে আপন দুরবস্থার কথা জানাইলেন। কিন্তু হেস্টিংস অবিলম্বে তাঁহাকে টাকা দিতে হুকুম করিয়া পাঠাইলেন। চেৎসিংহ অনন্যোপায় হইয়া এই অতিরিক্ত দাবি হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার নিমিত্ত হেস্টিংসকে দুই লক্ষ টাকা উৎকোচ দিতে সম্মত হইলেন। হেস্টিংস প্রথমতঃ উৎকোচ লইতে অসম্মত হইয়া, কেবল কোম্পানির প্রাপ্য পাঁচলক্ষ টাকার দাবি করিলেন। তখন চেৎসিংহ লিখিয়া পাঠাইলেন যে কিছু সময় প্রদান না করিলে টাকা সংগ্রহের উপায় নাই। হেস্টিংস কৌন্সিলের পুস্তকে লিখিলেন যে চেৎসিংহ ইচ্ছা করিলে অনায়াসে টাকা দিতে পারে। অনতিবিলম্বে আমার পদচ্যুত হইবার সম্ভবনা আছে। কৌন্সিলের অপর দুইজন মেম্বর এই টাকা লইতে সম্মত নহে। এই সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়াই চেৎসিংহ টাকা দিতে বিলম্ব করিতেছে। অতএব টাকা দিতে বিলম্ব করিবার নিমিত্ত চেৎসিংহের আর অতিরিক্ত এক লক্ষ টাকা জরিমানা করা হউক। বেনারসের রেসিডেন্ট অবিলম্বে চেৎসিংহের নিকট হইতে এই টাকা আদায় করিবেন

নির্বোধ কাপুরুষ চেৎসিং অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। আপনার স্ত্রী এবং জননীর গাত্রাভরণ বিক্রয় করিয়া ১৭৮০ সনের অতিরিক্ত পাঁচলক্ষ টাকা এবং জরিমানার এক লক্ষ সমুদয়ই পরিশোধ করিলেন।

কিন্তু হেস্টিংসের ন্যায় স্বার্থপর এবং ধর্মাধর্ম-জ্ঞান-শূন্য লোক সংসারে অতি অল্পই পরিলক্ষিত হয়। দস্যুবৃত্তি অবলম্বী ওয়ারেন হেস্টিংস চেৎসিংহের কেবল অর্থ শোষণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। চেৎসিংহের উপর আবার দুই সহস্র

অশ্বারোহী প্রদানের হুকুম জারি হইল। কৌন্সিলের অন্যতম মেম্বর ফ্রান্সিস এবং হুইলার সাহেব এইরূপ অন্যায় দাবি অনুমোদন করিলেন না। কিন্তু হেস্টিংস এবং তাঁহার সহচর বারওয়েলের মতানুসারে এই দাবিও ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া সাব্যস্ত হইল।

চেৎসিংহের তেরশত মাত্র অশ্বারোহী সেনা ছিল। তাহাদিগের এক একদল সৈন্যকে রাজস্ব আদায় উপলক্ষে রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখিতে হইত। চেৎসিংহ অগত্যা হেস্টিংসের মনোরঞ্জনার্থ এক হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন।

এই সময় কোম্পানির ধনাগার প্রায় শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। অনতি-বিলম্বে এককোটি টাকা সংগ্রহ করিতে না পারিলে রাজ্য রক্ষার উপাই নাই। হেস্টিংস চেৎসিংহের ভীরুতা দর্শনে তাঁহার উপর আরও অত্যাচার করিতে উৎসাহিত হইলেন, এবং তাঁহার ধনাগার লুণ্ঠন করিবার দুরভিসন্ধি করিলেন *।

১৭৮১ খ্রীঃ অব্দের আগস্ট মাসের প্রারম্ভে অর্থসংগ্রহার্থ ওয়ারেণ হেস্টিংস স্বয়ং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন। অর্থ সংগ্রহার্থ তিনি আপনি মনে মনে যে সকল দুরভিসন্ধি করিয়াছেন, তাহা কৌন্সিলের অন্যান্য মেম্বারদিগের নিকট ব্যক্ত করিলেন না। কিন্তু উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থানকালে তিনি কৌন্সিলের পূর্ণ ক্ষমতা সহকারে একাকী সকল কার্য করিবার নিমিত্ত অন্যান্য মেম্বারের অনুমতি চাহিলেন। মেম্বারগণ তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করিলেন।

১৪ই আগস্টের পূর্বেই তিনি বেনারসের প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিলেন। চেৎসিংহ হেস্টিংসের আগমন-বার্তা শ্রবণে সসৈন্যে আপন রাজ্যের প্রান্ত-প্রদেশে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু অর্থগৃধ্নু নীচাশয় হেস্টিংস চেৎসিংহকে সাদর সম্ভাষণ পর্যন্ত করিলেন না। এদিকে চেৎসিংহ দীনতা প্রদর্শনার্থ আপন উষ্ণীষ হেস্টিংসের ক্রোড়ে রাখিয়া বলিতে লাগিলেন—

'আমার যদি কোনো অপরাধ হইয়া থাকে, আমাকে রক্ষা করুন। আমার এ রাজ্যে এবং ধন সম্পত্তি সকলই আমি আপনার হাতে সমর্পণ করিতেছি।'

হীনবুদ্ধি চেৎসিংহ এখনোও বুঝিতে পারে নাই যে, ইংরাজ হৃদয় দয়া মায়া

---

* হেস্টিংস আত্মসমর্থনার্থ যে মিনিট লিখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছেন—I was resolved to draw from his guilt the means of relief to the Company's distress.

পরিশূন্য। ইহাদিগের নিকট বিনয় এবং সৌজন্য প্রদর্শন করিলে ইহারা শত-গুনে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। একমাত্র পাশব বলই ইহাদিগকে অন্যায়াচরণ হইতে বিরত রাখিতে পারে।

চেৎসিংহ নিরাশ-প্রায় হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এদিকে হেস্টিংস তৎপর দিবস প্রাতে বেনারসে পেঁছাইয়া মাধবদাসের উদ্যানে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

চেৎসিংহ আবার হেস্টিংসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তাঁহার অনুমতি চাহিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু হেস্টিংস সাক্ষাৎ করিতে আসিতে তাঁহাকে অনুমতি দিলেন না। চেৎসিংহ এখন বুঝিলেন যে নিশ্চয়ই হেস্টিংস তাঁহার রাজ্য নষ্ট করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। সুতরাং বিশ লক্ষ টাকা ইংরাজদিগকে দিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। এপর্যন্ত হেস্টিংস চেৎসিংহের কোনো কথার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেন না। কিন্তু এখন টাকা প্রদানের প্রস্তাব শ্রবণে বলিয়া পাঠাইলেন যে, পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিলে চেৎসিংহের সকল অপরাধ মার্জনা করা হইবে। রাজ্যের কতকাংশ বিক্রয় না করিয়া আর চেৎসিংহের পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিবার সাধ্য নাই। সুতারাং তিনি নিরুপায় হইয়া নির্বাক রহিলেন।

পরদিবস হেস্টিংসের আদেশানুসারে বেনারসের রেসিডেন্ট চেৎসিংহের নিকট যাইয়া তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিবেন। কিন্তু চেৎসিংহের আর টাকা দিবার সাধ্য নাই। ভয় প্রদর্শনে কোনো ফল হইল না। হেস্টিংস তৎপর দিবস চেৎসিংহকে তাহার বারাণসীর বাড়িতে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিবার নিমিত্ত মার্কহ্যাম সাহেবকে কয়েকজন সৈন্যসহ প্রেরণ করিলেন। মার্কহ্যাম সাহেব চেৎসিংহের নিজের ভৃত্য এবং সিপাহীদিগকে তাড়াইয়া দিয়া তাঁহাকে কয়েদ করিলেন।

পাঠক ও পাঠিকা চেৎসিংহের এই দুরবস্থার কথা শুনিয়াও মনে করিবেন যে বেনারসের মহারাজ চেৎসিংহ এতাদৃশ ভীরুতা প্রদর্শন করিলেন কেন? তিনি মনে করিলে তৎক্ষনাৎ হেস্টিংসের শিরশ্ছেদন করিতে পারিতেন। এ অপমান কেবল কুটিলতার প্রায়শ্চিত্ত। কুটিল-হৃদয় চেৎসিংহ সর্বদাই মনে করেন যে ইংরাজদিগের সাহায্য না পাইলে হয় তো রানী গোলাপকুমারী কিম্বা মনিয়ারসিংহ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবেন। কিন্তু ধিক্ চেৎসিংহের রাজ্যপদ, ধিক্ তাঁহার জীবন। চেৎসিংহ একবার চিন্তা করিল না এই যে

নীচাশয় বিদেশীয় বণিকের হস্তে অপমানিত হওয়া অপেক্ষা আপন বিমাতা কিম্বা জ্যেষ্ঠতাত পুত্র মনিয়ারসিংহ কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হওয়াও শ্রেয়ঃ।

চেৎসিংহ আপন হৃদয়স্থিত কুটিলতা নিবন্ধন রানী গোলাপকুমারী এবং মনিয়ারসিংহকে শত্রু বলিয়া মনে করিতেন। এ সংসারে কুটিলতার প্রায়শ্চিত্ত এই প্রকারেই হয়। আজ চেৎসিংহের কুটিলতার প্রায়শ্চিত্ত হইল।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়

কাপুরুষতা

হৃদয়স্থিত কুটিলতা এবং স্বার্থপরতাই কাপুরুষতা উৎপাদন করে। বীরোচিত হৃদয়ে কুটিলতা এবং স্বার্থপরতা প্রবেশ করিতে পারে না; সুতরাং বীরের হৃদয়ে কাপুরুষতা বিন্দুমাত্রও পরিলক্ষিত হয় না; আজ হৃদয়স্থিত কুটিলতা নিবন্ধন চেৎসিংহ কারারুদ্ধ হইলেন। কিন্তু কাপুরুষতার প্রায়শ্চিত্ত এখনো সম্যক্‌রূপে হয় নাই।

বেনারসের অধিপতি চেৎসিংহ সর্বজন-ঘৃণিত ফিরিঙ্গীদিগের কর্তৃক কারারুদ্ধ হইয়াছেন এই কথা সর্বত্র প্রচার হইবামাত্র, ঘরে ঘরে হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল। মনিয়ারসিংহ তাঁহার উদ্ধারার্থ রামনগরে সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ বলবন্তসিংহের প্রতি প্রজাসাধারণের অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল। বলবন্তসিংহের রাজত্বকালে প্রজাগণ পরম সুখে কাল যাপন করিত *।

* বলবন্ত সিংহের রাজত্বকালে প্রজাগণ যে পরম সুখে ছিল তাহা কাপ্তেন হার্পার (Captain Harper) সাহেবের সাক্ষ্য দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়। হার্পার সাহেব সিলেক্ট কমিটির নিকট আপন জবানবন্দীতে বলেন—The provinces of Beneras and Gazipoor were more highly cultivated, compared with those parts of Behar (situated within the British territory). He (Captain Harper) attributed this comparative prosperity of those provinces to the more secure and lenient Governmeut they lived under.

কিন্তু আমাদের স্বদেশীয় একজন বাঙ্গালী লিখিয়াছেন যে বলবন্ত সিংহের সময় প্রজাগণ বড় কষ্টে ছিল। এই বাঙ্গালী বাবু উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থান করেন। তিনি হিন্দি ভাষাতে ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার লিখিত পুস্তক কেহ পাঠ করে না বলিয়াই ইতিহাস লিখিবার উদ্যম পরিত্যাগ করিতে হইল। পাঠকদিগের জ্ঞানার্থে এই

চেৎসিংহও প্রজাদিগের উপর কখনো কোনো অত্যাচার করিতেন না। সুতরাং প্রজাগণ চেৎসিংহের নিমিত্ত অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিল।

লোক পরম্পরায় রানী গোলাপকুমারী শুনিলেন যে চেৎসিংহকে ইংরাজেরা কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। চেৎসিংহের ভৃত্যগণও তাঁহার নিকট যাইতে পারে না। গোলাপকুমারী এখনোও চেৎসিংহকে আপন গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় স্নেহ করেন। চেৎসিংহ কি অবস্থায় আছেন, তাহা জানিয়া আসিবার নিমিত্ত একজন ভৃত্যকে চেৎসিংহের বারাণসীর প্রাসাদে প্রেরণ করিলেন। ভৃত্য দুই প্রহরের কিছুকাল পরে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিল যে, ইংরাজদিগের সৈন্য তাহাকে রাজবাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিতে দিল না। সে চেৎসিংহকে দেখিতে পায় নাই।

এই সময় মহাবীরসিংহ গোরক্পুর হইতে কাশীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। ভৃত্য রাজবাটিতে প্রবেশ করিতে পারে নাই শুনিয়া মহাবীর রানীকে বলিলেন,—'মা আপনি আজ্ঞা করিলে আমি যাইয়া মহারাজের তত্ত্ব লইয়া আসিতে পারি।'

রানী বলিলেন,—'বাছা তুমি বড় কলহপ্রিয়। সহজে লোকের সঙ্গে তোমার বিবাদ হয়। কিন্তু সাবধান কাহারও সঙ্গে বিবাদ করিবে না। রাজপুত্রকে কি অবস্থায় রাখিয়াছে, কেবল তাহাই দেখিয়া চলিয়া আসিবে।'

মহাবীর বিশেষ উৎসাহ সহকারে চেৎসিংহের প্রাসাদে চলিলেন। রাজ-বাড়ির সমুদয় সিপাহি, পাহারাওয়ালা এবং ভৃত্য বাহির বাড়ি বসিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতেছে। রামনগর হইতে রাজার অনেকানেক কর্মচারী এবং সিপাহী আসিয়া বিড়াল কুকুরের ন্যায় বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। রাজবাড়ির

বাঙালীবাবুর লেখনীপ্রসূত কথা কয়েকটা এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি। আবুতালিব (পারস্য ভাষায় লিখিত তাঁহার অযোধ্যার ইতিহাস) কর্নেল হ্যানেকে পর্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। পাঠক দেখিবেন যে এই বাঙালী বাবুও একজন হিন্দু আবুতালিব। বাঙালীবাবু বলেন,—'ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে অধিকার হোনে কে পহিলে বনারস কী জো অবস্থা থী উসে বর্তমান অবস্থা কে সাথ মিলাকর দেখনেসে ব্রিটিস অধিকারী সে ইসকা কাহাতক উপকার হুঁয়া হৈ প্রত্যক্ষ বোধ হোতা হৈ। রাজা বলবন্তসিংহ আউর রাজা চেৎসিংহ কী আমলদারিমে বনারস মে কুছ আইন বা কানুন জারী ন থা।

কিন্তু অনেকানেক আইন-কানুন দ্বারা যে দেশের দরিদ্রতা বৃদ্ধি হইতেছে তাহা বাঙালীবাবু বুঝিতে পারেন না।

দ্বারে একজন ইংরাজ কাপ্তান এবং তিন-চারিজন গোরা, চারি-পাঁচজন সিপাহী বন্দুক হাতে করিয়া দ্বার রক্ষা করিতেছে।

মহাবীর দ্বারে আসিয়া কাপ্তেনের নিকট বলিলেন,—'আমি বাড়ির মধ্যে যাইব। আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে।'

কাপ্তেন সগর্বে বলিয়া উঠিল,—'বাড়ির মধ্যে যাইবার হুকুম নাই। চলিয়া যাও।'

মহাবীর। মহারাজ চেৎসিংহ কেমন আছেন, তাহাই কেবল দেখিয়া যাইব। আমার আর কোনো উদ্দেশ্য নাই।

কাপ্তেন। তুমি চলিয়া যাও। ভিতরে যাইতে পারিবে না।

মহাবীর। রানীমার হুকুম আমাকে অবশ্য পালন করিতে হইবে। পথ ছাড়িয়া দেও।

মহাবীর এই কথা বলিবামাত্র কাপ্তেন সক্রোধে মহাবীরকে এক চপেটাঘাত করিল।

চপেটাঘাত প্রাপ্তিমাত্র মহাবীর,—'শালা ফিরিঙ্গী' এই বলিয়াই কাপ্তেনের হাতের বন্দুকটি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কাড়িয়া লইয়া, বাম হস্ত দ্বারা তাহার ঘাড় ধরিয়া টানিয়া দ্বারের বাহির করিল। অন্য একজন সিপাহী তখন অগ্রসর হইয়া মহাবীরকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িল। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গুলি মহাবীরের গাত্র স্পর্শ করিল না। মহাবীর তখন তাড়াতাড়ি নিজের হাতের বন্দুক সিপাহির কপালে লাগাইয়া তাহাকে এক গুলিতেই ধরাশায়ী করিলেন। এদিকে তিন পদাঘাতে কাপ্তেনের মস্তক একেবারে চূর্ণ করিলেন।

এই বিবাদ দেখিয়া চতুর্দিক হইতে লোক দৌড়াইয়া আসিতে লাগিল। সকলের মুখেই 'মার ডালো শালা ফিরিঙ্গী লোককো'—'মার ডালো শালা ফিরিঙ্গী লোককো' এই শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। ক্রমে দুই-তিনশত লোক একত্র হইয়া, যে কয়েকজন ইংরাজ সৈন্য সেখানে ছিল, তাহাদের সকলেরই প্রাণ সংহার করিল। একজন ইংরাজ সৈন্যও প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইল না। রেসিডেন্ট হেস্টিংসের নিকট এই গোলযোগের সংবাদ পাঠাইলেন। কিন্তু রেসিডেন্টের পত্র প্রাপ্তির পূর্বেই হেস্টিংস লোক পরম্পরায় শুনিলেন যে চেৎসিংহকে তাঁহার প্রজাগণ কারামুক্ত করিয়াছে, সমুদয় ইংরাজ সৈন্যের প্রাণ বিনাশ করিয়াছে, এবং তাঁহার শিয়রস্থলসার্থ সেই সকল সৈন্য মাধবদাসের বাগানে আসিতেছে।

হেস্টিংস বারাসসীতে এখনো মাধবদাসের উদ্যানে অবস্থান করেন। সৈন্যগন তাঁহাকে ধৃত করিতে আসিতেছে শুনিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ বেনারস হইতে পলায়ন করিবার নিমিত্ত আপন শরীররক্ষক বলভদ্রসিংহ জমাদারকে হস্তী এবং অশ্ব আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন।

এদিকে বেলা প্রায় অবসান হইয়াছে। তাঁহার আহারের সময় উপস্থিত, আহার্যদ্রব্য সমুদয়ই প্রস্তত। সেলামৎ আলি খানসামা টেবিলের উপর কাপড় বিছাইতেছে। রেসফৎ আলি খানসামা গরম কাবাব এবং মুরগীর রোস্ট হস্তে করিয়া টেবিলের নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। হেস্টিংস পায়জামা পরিত্যাগ পূর্বক সায়ংকালিক পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছেন। কামিজটি মাত্র পরিধান করিয়াছেন, পেন্টালুনের বোতাম লাগাইতেছেন, এখন পর্যন্ত কোট পরিধান করেন নাই। এই সময় বলভদ্রসিংহ জমাদার বাহির হইতে চীৎকার করিয়া বলিল—

'হাতিকা পর হাওদা, ঘোড়েকা পর জীন।
জলদি আও জলদি আও ওয়ারেন হেস্টিং।'

বলভদ্রসিংহ বাহির হইতে এই কথা বলিবামাত্র হেস্টিংস মনে করিলেন যে, হয়তো চেৎসিংহের সৈন্যগণ তাঁহার অবস্থানের নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাঁহার আর কোট পরিধান করিবার সময় হইল না। পরিধানে কেবল এক কামিজ এবং পেন্টালুন। পায়ে মোজা কি বুট কিছুই নাই। কেবল বামপদে একখানি স্লিপার (চটি জুতা)। ওয়ারেন হেস্টিংস উর্ধ্বশ্বাসে গৃহের বাহির হইয়া অশ্বারোহন করিলেন। 'বল বড়ো—হাটী—মাল—কাণ্ট্ বাবু'—'এই বলিয়াই অশ্বপৃষ্ঠে চুনারের কেল্লার দিকে ধাবিত হইলেন।

"বলবড়ো—হাটী—মাল—কাণ্ট্ বাবু"—এই কথার অর্থ বোধহয় পাঠকগণ সহজে বুঝিতে পারিবেন না।

'বলভদ্র তুমি এবং কান্তবাবু মালামাল সঙ্গে করিয়া এই হস্তী আরোহণ যাইবে, এই কথাই হেস্টিংসের বলিবার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু এত কথা বলিবার অবকাশ নাই। সুতরাং 'বলবড়ো—হাটী—মাল কাণ্ট্ বাবু' বলিয়াই চলিয়া গেলেন।

সেলামৎ আলি এবং রেসফৎ আলি খানসামা অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মুহূর্তের মধ্যে অবলাহ হেস্টিংস দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন। বলভদ্রসিংহ কান্তপোদ্দারের অন্বেষণে রেসিডেন্সিতে চলিয়া গেল। সেলামৎ আলি এবং

রেসন্ধৎ আলি টেবিলের উপর কাবাব এবং রোস্ট রাখিয়া, চেয়ারে বসিয়া আজ আহার্য দ্রব্যের যথোচিত সদ্ব্যবহার করিতে লাগিল।

এদিকে বলভদ্রসিংহ জমাদার মাধব দাসের উদ্যান হইতে রেসিডেন্সিতে * আসিয়া কান্তপোদ্দারের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। রেসিডেন্সির লোকেরা বলিল,—'কান্তবাবুকে রাজা চেৎসিংহ ডাকাইয়া লইয়া গিয়াছেন। কান্তবাবু রামনগর গিয়াছেন।'

কাপুরুষ চেৎসিংহ কারামুক্ত হইবার পর গঙ্গা পার হইয়া, রামনগর চলিয়া গেলেন। মনিয়ারসিংহ তাঁহার উদ্ধারার্থ সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে রেসিডেন্টের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন যে, এ গোলযোগ তাঁহার ইচ্ছানুসারে হয় নাই। তিনি এ গোলযোগের বিন্দুবিসর্গও জানেন না। তিনি এখন আপনাকে বন্দী-স্বরূপ মনে করেন। রেসিডেন্ট চেৎসিংহের কথায় কোনো প্রত্যুত্তর করিলেন না। তখন চেৎসিংহ রেসিডেন্সি হইতে কান্তপোদ্দারকে ডাকাইয়া আনিলেন। কান্তের হাত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন,—'আপনি আমাকে রক্ষা করুন। হেস্টিংস সাহেবকে বলিয়া-কহিয়া আমাকে উদ্ধার করুন।'

কান্তপোদ্দারের স্বভাব-প্রকৃতি চেৎসিংহের অবিদিত ছিল না। জলপানির বাবত কিছু হাতে না পড়িলে কান্ত কোনো বিষয়ে বড় মনোযোগ করিতেন না। কিন্তু চেৎসিংহের নগদ টাকা ঘরে নাই। আপন স্ত্রীর গাত্রাভরণ হইতে দুইটি বহুমূল্য মুক্তা † আনিয়া নজর স্বরূপ কান্তের হস্তে প্রদান করিলেন। হায় কি কাপুরুষতা! বেনারসের মহারাজ আজ কান্তপোদ্দারকে উৎকোচ প্রদান করিতেছেন। চেৎসিংহের এই কাপুরুষতা দেখিয়া মনিয়ারসিংহ তাঁহার সংসর্গ একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। কান্তকে ডাকাইয়া আনিবার পূর্বে মনিয়ারসিংহ হেস্টিংসকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্ত চেৎসিংহকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু চেৎসিংহ তাঁহার কথা শুনিলেন না।

কান্তপোদ্দার চেৎসিংহের নিকট হইতে এই বহুমূল্য মুক্তা লাভ করিয়া যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইল।—'আমার চেষ্টার কোনো ত্রুটি হইবে না।' এই

---

* ইংরাজদের রেসিডেন্ট সাহেব যে বাড়িতে থাকেন তাহাকে রেসিডেন্সি বলে।

† কান্তপোদ্দার বেনারস হইতে যে সকল মুক্তা ও হীরক আনিয়াছিল তৎসমুদয় মহারাজ কৃষ্ণনাথের আত্মহত্যার পর ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক ক্রোক হইয়াছিল। মহারানী স্বর্ণময়ী বিলাত আপীলে মকদ্দমায় জয়লাভ করিয়া ঐ সকল বহুমূল্য মুক্তা পুনঃপ্রাপ্ত হন।

বলিয়া বিদায় গ্রহণ পূর্বক দ্বারে আসিবামাত্র বলভদ্রসিংহের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

বলভদ্র বলিল,—'পোদ্দার' তোমাকে শীঘ্র শীঘ্র সাহেবের মালামাল সহ চুনারে যাইতে হইবে। সাহেব কেবল এক কামিজ আর এক পেণ্টালুন পরিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমাকেও তোমার সঙ্গে যাইতে বলিয়া গিয়াছেন।'

কান্তপোদ্দার বলভদ্রের কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—'এ কি বিপদ? এখন এখানে থাকিয়া এক-এক বার চেৎসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেই কিছু লাভ হইবে। এই সময় চুনারে যাইতে হইলে তো সর্বনাশ। এখন যদি ইহাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ হয় তাহাতেই বা আমার ভয় কি। আমি মুদি-পোদ্দার লোক। যুদ্ধের নাম শুনিলে পূর্বদিনই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তিন ক্রোশ দূরে যাইয়া পালাইয়া থাকিব। সে কামানের দুরুম দুরুম শব্দ আমার কানেও প্রবেশ করিবে না।'

প্রকাশ্যে কান্ত বলিলেন,—'বলভদ্র, আজ আর এ অন্ধকার রাত্রে কোথায় যাইব। আমরা বিদেশী লোক, রাস্তা-ঘাট চিনি না। যাহা হয় কাল পরামর্শ করিয়া স্থির করিব।'

বলভদ্র। তুমি তো আচ্ছা আদমি। সাহেব আহার না করিয়া এক কামিজ এক পেণ্টালুন পরিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তুমি কাল পরামর্শ করিবে? এখনই চল।

কান্ত। বাছা, বলভদ্র এ বিপদের সময় এত চটা-চটি করা উচিত নহে। বুড়া মানুষ। কোনো বিষয়েই অগ্র-পশ্চাৎ না দেখিয়া কাজ করি না। তোমার আর কোনো ভয় নাই। কান্তপোদ্দার জীবিত থাকিতে সাহেবের কে কি করিতে পারে? কাল আমি চলিয়া যাইব।

বলভদ্র। সাহেবের সঙ্গে একখানি বই কাপড় নাই। তুমি এখনই চল, আর বিলম্ব করা যায় না।

কান্ত। বাছা, তুমিও হিন্দুর সন্তান আমিও হিন্দু। এই তীর্থস্থানে আসিয়াছি; এখানে তিনরাত্রি বাস না করিয়া কেমন করিয়া চলিয়া যাইব। সাহেব লোকের তো আর পূজা-আহ্নিক নাই। এক কাপড়ে দশ দিন চলিবে। কাপড় ছাড়িয়া লেঙটা হইয়া সাহেব লোক স্নান করে। আমি কাল আর-একবার গঙ্গাস্নান করিয়া, না হয় প্রত্যুষে দুইটা ভাতে-ভাত খাইয়া চলিয়া যাইব।

বলভদ্র। তুমি মজার লোক। কালও আবার ভাতে-ভাত। যে মলিবের

লবণ খাইতেছ, তাঁহার আহার হইল না। তুমি আবার কালও ভাতে-ভাত?

কান্ত। বাছা স্থির হও তোমার ভয় নাই। সাহেবের কোনো কষ্টের কথা শুনিলে আমার বুক ফাটিয়া যায়। সাহেবের যাহাতে কষ্ট না হয় তাহার চেষ্টা আমি কাল করিব।

বলভদ্রসিংহ দেখিল যে কান্তপোদ্দার একান্তই রাত্রে যাইতে সম্মত হইল না। সে তখন মাধবদাসের বাগানে প্রত্যাবর্তন করিয়া, সেলামৎ আলি এবং রেসফৎ আলিকে বলিল যে, তোমরা দুজন এই হাতিতে চড়িয়া সাহেবের কাপড় এবং খানা সঙ্গে করিয়া চলিয়া যাও। সাহেব রাস্তায় অবশ্য বিশ্রাম করিবেন। পথে কোনো আড্ডায় দেখা হইলে সাহেবকে বলিয়া-কহিয়া খাওয়াইবে। মনিবের যাহাতে কষ্ট না হয় তাহাই করিবে। আমি কান্তপোদ্দারকে সঙ্গে করিয়া কাল চলিয়া যাইব।

যে আহার্য দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা সেলামৎ আলি এবং রেসফৎ আলির উদরস্থ হইয়াছে। তাহারা এখন দুজনে সজল নয়নে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক বলিল,—'সোবান আল্লা? জমাদার সাহেব, আমাদের কি সেই অন্যান্য খানসামার ন্যায় মনে করেন। আপন মনিবের জন্য এ জান দিতে পারি। আজ সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া ভালো খানা তৈয়ারি করিয়াছিলাম। সাহেব যখন খানা না খাইয়া চলিয়া গেলেন, তখন দেলটার মধ্যে বড় ক্ষোভ হইল। ঐ খানা কি আর সামনে রাখিয়া দেখতে ইচ্ছা হয়। পাতকুয়ার মধ্যে তখনই সব ফেলিয়া দিয়াছি। আপনি তবে আর দুইটা টাকা দিন্। এখনই একঘণ্টার মধ্যে দুইটা মুরগীর রোস্ট তৈয়ার হইবে। তাই সঙ্গে করিয়া চলিয়া যাইব।

বলভদ্রসিংহ একজন রাজপুত সিপাহী। প্রভুভক্তি ইহাদের জাতীয় স্বভাব। সেলামৎ আলি এবং রেসফৎ আলির সকল কথাই সে বুঝিতে পারিল। কিন্তু এখন আর কি করিবে। সন্ধ্যাকালে হেস্টিংস অশ্বারোহণে চলিয়া গিয়াছেন। এখন রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হইয়াছে। এখন খানা প্রস্তুত করিয়া চলিয়া যাইতে হইলে হেস্টিংসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং পরদিন সকালে একত্রে যাইবে বলিয়াই স্থির করিল।

এদিকে ওয়ারেন হেস্টিংস এক কামিজ আর এক পেণ্টালুন পরিধান করিয়া বায়ুবেগে অশ্ব পৃষ্ঠে ধাবিত হইয়াছেন। তাঁহার কোট এবং বুট পরিধান করিবার সুযোগ ছিল না। কিন্তু হাতের কাছে টুপি ছিল। সেই হ্যাট মাথায় দিয়া

চলিতেছেন। পদদ্বয় জুতাশূন্য। প্রথমরাত্রে অন্ধকার ছিল! জ্যোৎস্না উঠিবামাত্র তদবস্থাপন্ন হেষ্টিংসকে গ্রাম্য লোকেরা দেখিয়া বিলাতি ভূত বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতে লাগিল।

একজন হীনবুদ্ধি কৃষক ক্ষেত্র হইতে এক বোঝা খড় মাথায় করিয়া আপন গৃহাভিমুখে চলিয়াছে। সে আপন পশ্চাতে অশ্বের পদশব্দ শুনিয়া পশ্চাতের দিকে চাহিবামাত্র হেষ্টিংসকে দেখিতে পাইল। তদবস্থাপন্ন হেষ্টিংসকে দেখিবামাত্র মাথায় বোঝা ভূমিতলে ফেলিয়া, "বাবারে ভূত ভূত" এইরূপ চীৎকার করিতে করিতে আপন গৃহে পৌঁছিয়াই মূর্ছিত হইয়া পড়িল। তাহার স্ত্রী, পুত্র এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা একঘণ্টার মধ্যেও তাহাকে আর চেতন করিতে পারিল না। তখন গ্রাম্য ওঝাকে ডাকিয়া আনিল। ওঝা অনেক মন্ত্রপাঠ করিয়া তাহাকে জাগ্রত করিল।

ওঝা ব্রাহ্মণ ছিল। বেনারস, মৃজাপুর, কানপুর প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলের ব্রাহ্মণকে মহারাজ বলে। কৃষকের স্ত্রী ওঝাকে জিজ্ঞাসা করিল,—'মহারাজ সত্য সত্যই কি ইহাকে ভূতে পাইয়াছিল!'

ওঝা বলিল, বাছা,—'ভূত ওকথা আর মুখে আনিবে না। একটা বিলাতি ভূত। আজ আমাদের মহারাজ চেৎসিংহ যুদ্ধ করিয়া একশত ফিরিঙ্গীর মাথা কাটিয়াছেন। ফিরিঙ্গী কাশীতে মরিলে তো আর সেখানে থাকিতে পারে না। হিন্দু মরিলে শিব হয়। ফিরিঙ্গী কাশীতে মরিলে তৎক্ষণাৎ ভূত হইয়া মক্কার দিকে চলিয়া যায়। আজ কাল তোমরা সকলেই ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া, ঘরের মধ্যে বসিয়া থাক। একশত ভূত মক্কার দিকে ছুটিয়াছে।'

গ্রামের মধ্যে ওঝার এই কথা সর্বত্র প্রচার হইবামাত্র তিনদিনের মধ্যে গ্রাম্য-কৃষক ঘরের বাহির হইল না। অশ্বের পদশব্দ শুনিলেই সকলে ঘরে দরজা বন্ধ করিত। তিনদিন একক্রমে সমুদয় কৃষকের কাজ-কর্ম বন্ধ রহিল।

হেষ্টিংস আসিয়া চুনারে পৌঁছিলেন। এদিকে দুইদিনের মধ্যেও কান্ত পোদ্দার-মালামাল সহ পৌঁছিল না। হেষ্টিংস মহা বিপদে পড়িলেন! তাঁহার সঙ্গে দুই হাজার টাকা মাত্র ছিল। তাহাও কান্তপোদ্দারের নিকট রহিয়াছে। চুনারে ইংরাজদিগের যে সকল লোক ছিল, তাহাদিগের এক-একজনকে পত্রসহ স্থানে স্থানে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। অযোধ্যার রেসিডেণ্ট * মিডলটন

* ইহার কয়েক বৎসর পূর্বে ব্রিষ্টো সাহেবকে পদচ্যুত করিয়া হেষ্টিংস আবার মিডলটনকে অযোধ্যার রেসিডেণ্টের পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

সাহেবকে, গোরক্ষপুরে কর্নেল হ্যানেকে, কানপুরে মরগ্যানকে সসৈন্যে অবিলম্বে বেনারসে আসিতে পত্র লিখিলেন। এবার হেস্টিংসের এই অবিমৃষ্যকারিতা নিবন্ধন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইত। কিন্তু একমাত্র চেৎসিংহের কাপুরুষতাই কোম্পানির রাজত্ব চিরস্থায়ী করিল।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়

কাপুরুষতার প্রায়শ্চিত্ত

বারাণসীর এই গোলযোগ উপলক্ষে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব একেবারে সমূলে উৎসন্ন হইবার উপক্রম হইল। অযোধ্যার প্রত্যেক জেলার প্রজাগণ ইংরাজ কলেক্টরদিগের অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া ইংরাজদিগকে দেশবহিষ্কৃত করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু মুস্তফা খাঁ প্রভৃতির মৃত্যু হইয়াছে বলিয়াই তাহারা নেতা এবং পরিচালক শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। নেতাবিহীনে কোনো কার্যে অগ্রসর হইতে পারে না। কাশী অঞ্চলের সমুদয় প্রজা চেৎসিংহের অপমানের কথা শুনিয়া স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইতেছে। এতদ্ভিন্ন ইংরাজদিগের আপন অধিকারের মধ্যে বেহার অঞ্চলের সমুদয় প্রজা চেৎসিংহের সাহায্য করিবে বলিয়া দলে দলে বেনারসে আসিতেছে। ওয়ারেন হেস্টিংস উৎকোচের প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া, সিতাব রায়ের পুত্র কল্যাণসিংহের নিকট বেহার প্রদেশ ইজারা দিয়াছিলেন। কল্যাণসিংহের অত্যাচারে বেহার অঞ্চলের প্রজাগণও বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। নেতা পাইলেই তাহারা সংগ্রামক্ষেত্রে অগ্রসর হয়। এদিকে বঙ্গদেশেও রংপুর দিনাজপুর এবং পূর্ণিয়ায় বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

ইংরাজ ইতিহাস লেখকগণ বলেন যে ওয়ারেন হেস্টিংসই ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু এটি তাঁহাদের দৃষ্টিভ্রম। বরং ওয়ারেন হেস্টিংসের দস্যুবৃত্তি নিবন্ধন সময়ে সময়ে ইংরাজরাজত্ব সমূলে বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল

বারাণসীর গোলযোগের পর চতুর্দিক হইতে এই প্রকার যুদ্ধার্থিদিগকে বারাণসীতে সমবেত হইতে দেখিয়া মহাবীরসিংহ মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। অন্যূন পনের হাজার লোক ক্রমে একত্রিত হইল। ইহার মধ্যে অধিকাংশই বেহার অঞ্চলবাসী ছিল। মহাবীরসিংহ মনে করিলেন যে এইবার পূর্বপুরুষের ভ্রম সংশোধন করিবেন।

মহাবীর ইহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চেৎসিংহের নিকট যাইলে, তিনি ইংরাজদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি এখনো রেসিডেন্টের নিকট যাইয়া দিন দিন ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। এখনো বলিতেছেন,—'আমার রাজত্ব, ধন, সম্পত্তি—সকলই আপনাদের হস্তে সমর্পণ করিতেছি, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।'

রেসিডেন্ট চেৎসিংহের প্রস্তাব ও কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া হাঁ-না, কিছুই বলিতে পারিলেন না। হেস্টিংস সন্ধি করিবেন, কি যুদ্ধ করিবেন, তৎসম্বন্ধে তিনি কিছুই জানিতেন না।

চেৎসিংহ মনে মনে আশা করিতে লাগিলেন, যে কান্তপোদ্দারকে তিনি অনেক মণি-মুক্তা প্রদান করিয়াছেন, কান্তপোদ্দার এখন চুনারে গিয়াছে। সে নিশ্চয়ই হেস্টিংসকে বশীভূত করিতে পারিবে।

চেৎসিংহকে যুদ্ধে অগ্রসর হইতে অনিচ্ছুক দর্শনে বেহার এবং গোরক্ষপুরের লোকেরা ভগ্নোৎসাহ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে লাগিল। কিন্তু মহাবীর তাহাদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান লোকদিগকে নানা প্রকার কথা-বার্তায় আশ্বস্ত করিয়া বারাণসীতে রাখিলেন। হীনবুদ্ধি চেৎসিংহ এখনো যদি কাপুরুষতা পরিত্যাগ পূর্বক মনিয়ারসিংহের পরামর্শানুসারে হেস্টিংসকে কারারুদ্ধ করে, তবে আপন রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু চির-কাপুরুষতা-নিবন্ধন এ শুভ বুদ্ধি তাহার মনে উদয় হইল না।

মহাবীরের মাতা চাঁদকুমারী আপন পুত্রকে এই যুদ্ধের প্রধান উদ্যোগী মনে করিয়া, অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি অহর্নিশ পুত্রকে এই উদ্যম হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, চাঁদকুমারী বাঙালী মহিলাদিগের সংসর্গে জীবন যাপন করিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেক কার্যে ও আচরণে বাঙালী রমণীর স্বভাব ও প্রকৃতি পরিলক্ষিত হয়। সংসর্গদোষের ন্যায় গুরুতর দোষ আর কিছুই নাই। সংসর্গদোষ লোকের মজ্জাগত হইয়া পড়ে। অরণ্যে বাস করাও ভালো, অথচ যেন কেহ কুসংসর্গে বাস না করে। বাঙালী-রমণী-স্বভাব-ভীরুতা চাঁদকুমারীর মজ্জাগত দোষ হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে পুত্রকে বলিতে লাগিলেন,—'বাছা তুমি বিনা আমার এ সংসারে আর কেহই নাই। আমি এ প্রাণ থাকিতে তোমাকে যুদ্ধে যাইতে দিব না। আমার বুকে ছুরি মারিয়া আগে আমাকে বধ কর, তার পর তুমি যুদ্ধে যাইও।'

হাতে একখানা ছুরি লইয়া আবার বলিলেন,—'বাছা তুমি যুদ্ধে গেলে এই ছুরি বুকে বিদ্ধ করিয়া আমি আত্মহত্যা করিব। এ যুদ্ধে গেলে তোমার মাতৃহত্যার পাপ হইবে।'

মহাবীর জননীর এই সকল আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—'মা, তোমার বাবা আসিলেও আমাকে এ যুদ্ধ হইতে বিরত রাখিতে পারিবেন না। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলেই আমার মাতামহ এবং পিতার স্বর্গলাভ হইবে। আমি কি সাধে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছি? এ যুদ্ধ নহে—তোমার পিতার পিণ্ড প্রদান।'

চাঁদকুমারী। বাছা, আমি শতবার গয়ায় যাইয়া পিণ্ড দিব। তাহাতেই আমার পিতার স্বর্গলাভ হইবে। তোমার এ যুদ্ধে যাইয়া কাজ নাই।

মহাবীর। তোমার পিতা এবং আমার পিতার কুকার্য নিবন্ধন দেশ-সুদ্ধ লোক অত্যাচারানলে দগ্ধ হইতেছে। শুদ্ধ গয়ায় পিণ্ড দান করিলে ইহাদের পাপক্ষয় হইবে না। আমার এই শরীরের দ্বারাই ইহাদের পিণ্ড দান করিতে হইবে।

চাঁদকুমারী কাঁপিয়া উঠিয়া বলিলেন,—'বাছা ও রক্তপাতের কথা আমার শুনিলেও ভয় হয়। চিকিৎসক যখন কাহাকেও অস্ত্র করে তখন আমি সেখানে থাকিতে পারি না। তুই বাছা এ দুর্বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। অমর, ছত্রসিংহ কেহই এখন এখানে নাই। তাহারা কেহ এখানে থাকিলেও আমার এত ভয় হইত না। যুদ্ধের সময় অমর উপস্থিত থাকিলে সে আপন প্রাণ দিয়াও তোর প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করিত।'

মহাবীর। (হাসিতে হাসিতে) তোমার ভ্রাতার প্রতি তোমার কি অপার স্নেহ! ভ্রাতার প্রাণ নষ্ট হইয়াও যদি পুত্রটির প্রাণ থাকে, তবে সে তোমার সুখের বিষয়। আর প্রতিদিন মুখে বল যে, ভাইকে তুমি প্রাণাপেক্ষা ভালোবাস।

চাঁদকুমারী পুত্রের কথা শুনিয়া কিছুকাল নির্বাক রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন,—'বাছা একান্তই যদি তোর যুদ্ধে যাইতে ইচ্ছা হয়, তবে সকলের পিছে থাকিস। তোর পিতা তোর মাতাসহ সর্বদাই সৈন্যের অগ্রে অগ্রে থাকিতেন। তাহাতেই আমার এই বিপদ হইয়াছে। আমার সর্বনাশ হইয়াছে।'

মহাবীর মাতার কথায় আর কোনো প্রত্যুত্তর করিলেন না। কিন্তু তিনি মনে মনে জানিতেন যে, সংগ্রামক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেই তাঁহাকে "নিরাপ-

দল” (Forlorn hope) ভুক্ত হইতে হইবে। সংগ্রামকালে যে একদল সৈন্য সম্মুখে থাকে, তাহাদিগকেই “নিরাশ-দল” বলা যায়। মহাবীর এবং অমরসিংহ গোরক্‌পুরে যে কয়েকবার যুদ্ধ করিয়াছেন, সে কয়েকবারই অন্যান্য সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য স্বয়ং তাঁহারা অগ্রে যাইয়া “নিরাশ-দল” ভুক্ত হইতেন। মহাবীর মনে করিলেন যে মাতার নিকট এই সব কথা বলিলে তিনি আরও শোকার্ত্ত হইয়া পড়িবেন। সুতরাং আপন জননীর নিকট সে সকল কথা কিছু ব্যক্ত করিলেন না।

এদিকে চেৎসিংহকে একেবারে সংগ্রামবিমুখ দেখিয়া মহাবীর গোরক্‌পুর এবং বেহারের যে কয়েকজন লোককে বারাণসীতে রাখিয়াছিলেন, তাহাদিগকেও বিদায় দিলেন। বিদেশ হইতে যে পনের হাজার সৈনিক-পুরুষ বারাণসীতে আসিয়া একত্র হইয়াছিল, তাহারা একে একে সকলেই নিরাশ হইয়া আপন আপন গৃহে চলিয়া গেল।

চেৎসিংহ আপন পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে সঙ্গে করিয়া লতিপপুরের দুর্গে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। রামনগরের দুর্গ রক্ষণাবেক্ষণার্থ গজরাজসিংহকে রামনগরের প্রাসাদে রাখিয়া গেলেন। চেৎসিংহকে এখনো ইংরাজদিগের সঙ্গে সন্ধি করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট দেখিয়া, মনিয়ারসিংহ আপন গৃহে যাইয়া মনোদুঃখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মনিয়ার-সিংহেরও কোনো দুরভিসন্ধি ছিল না। বলবন্তসিংহের মান-সম্ভ্রম-রক্ষা করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।

দশ-পনেরদিন পরে, হেস্টিংসের দুরবস্থার কথা স্থানে স্থানে প্রচারিত হইল। কর্নেল মরগ্যান তখন কানপুরে ছিলেন। তিনি লোক-পরম্পরায় হেস্টিংসের বিপদের কথা শুনিয়া, আপন রেজিমেন্টসহ তৎক্ষণাৎ চুনারে যাত্রা করিলেন। এদিকে মুজাপুর হইতে কর্নেল পপহাম আসিয়া পৌঁছিলেন। কর্নেল হ্যানে হেস্টিংসের পত্র পাইয়াও বিলম্ব করিতে লাগিল। এবার বোধহয়, কর্নেল হ্যানে কেও স্বীয় কুকার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

চতুর্দিক হইতে দুই-তিন রেজিমেণ্ট সৈন্য একত্র হইবামাত্র হেস্টিংস চেৎসিংহের সমুদয় দুর্গ আক্রমণ করিবার আদেশ করিলেন। তখন চেৎসিংহকে একান্ত বাধ্য হইয়া যুদ্ধ করিতে হইল। কিন্তু বিদেশ হইতে যাহারা যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল, তাহারা সকলেই আপন আপন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। চেৎসিংহের নিজের যে অল্পসংখ্যক সৈন্য ছিল, তাহাদিগকে লইয়া

কয়েকদিন মহাবীরসিংহ ইংরাজ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেন। এত এত অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া মহাবীসিংহ একটি দুর্গও ইংরাজদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। ইংরাজদিগের প্রায় সাত-আট হাজার সৈন্য রহিয়াছে। মহাবীরের সঙ্গে একহাজার সৈন্যও নাই। বিশেষতঃ যে অল্পসংখ্যক সৈন্য আছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই জন্মের মধ্যে কখনোও সংগ্রামক্ষেত্র দর্শন করে নাই। কামানের শব্দ শুনিলে ইহারা পলায়ন করিতে উদ্যত হইত। ইহাদিগকে লইয়া সময়ে সময়ে মহাবীরকে ঘোর বিপদের মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল।

ইংরাজ-সৈন্য ক্রমে রামনগর, লতিপপুর এবং পতিতার দুর্গ দখল করিল। তখন চেৎসিংহ অনন্যোপায় হইয়া সপরিবারে পলায়ন-পূর্বক বিজয়ঘরের দুর্গে চলিয়া গেলেন। বিজয়ঘরের দুর্গেই তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চিত ছিল। ইংরাজ-সৈন্য বিজয়ঘরের দুর্গ আক্রমণ করিবার পূর্বরাত্রে চেৎসিংহ আপন স্ত্রী এবং জননীকে দুর্গমধ্যে রাখিয়া, একাকী কিছু ধন-সম্পত্তি সঙ্গে করিয়া পলায়ন পূর্বক রেওয়া চলিয়া গেলেন। চেৎসিংহ সুজনসিংহ উভয়ে পলায়ন করিলে পর, সৈন্যগণও পলায়ন করিল। কেবলমাত্র পাহারাওয়ালাগণ এবং মহাবীরসিংহ বিজয়ঘরে রহিলেন। ইংরাজ-সৈন্য দুর্গ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে পর, চেৎসিংহের মাতা পূর্ণিমা (পান্না) কর্নেল পপহ্যামের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন যে, চেৎসিংহ পলায়ন করিয়াছেন। তাঁহারা কয়েকজন স্ত্রীলোক মাত্র দুর্গমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। এই দুর্গে চেৎসিংহের আর কোনো ধন-সম্পত্তি নাই।

পপহ্যাম হেস্টিংসের নিকট পূর্ণিমার কথিত বিষয় লিখিয়া পাঠাইলেন। হেস্টিংস প্রত্যুত্তরে লিখিলেন যে স্ত্রীলোকদিগকে দুর্গ ছাড়িয়া যাইতে বলিবে। তাহারা দুর্গ হইতে কোনো জিনিস-পত্র লইয়া যাইতে পারিবে না।

পপহ্যাম সাহেব আবার হেস্টিংসের নিকট লিখিলেন স্ত্রীলোকগণ যদি দুর্গ হইতে যাইবার সময় বস্ত্রের নিচে গোপনে কোনো মণিমুক্তা লইয়া যায়, তবে তাহা নিবারণ করিবার কোনো উপায় নাই। প্রত্যুত্তরে হেস্টিংস লিখিলেন,—'বিজয়ঘরের দুর্গে যে সকল মণিমুক্তা রহিয়াছে তাহা সৈন্যদিগের

* Hasting's letter runs thus—I apprehend that she will contrive to defraud the captors of a considerable part of the booty by being suffered to retire without examination. But this is your consideration and not mine.

প্রাপ্য। সৈন্যগণ যদি ইচ্ছা পূর্ব্বক তাহাদিগকে মণিমুক্তা অপহরণের সুযোগ প্রদান করে, তাহাতে আমার ক্ষতি নাই। তাহাদেরই ক্ষতি। পরীক্ষা না করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে দুর্গের বাহির হইতে দিলে তাহারা নিশ্চয়ই মণিমুক্তা চুরি করিবে *।'

সৈন্যগণ হেস্টিংসের এই হুকুম জ্ঞাত হইল। এদিকে মহাবীরসিংহও এই পত্র পৌঁছিবার একদিন পূর্ব্বেই কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পপহ্যাম সাহেব চেৎসিংহের মাতা এবং স্ত্রীকে তাঁহাদের সঙ্গিনী দাসী ও অন্যান্য স্ত্রীলোকসহ দুর্গ ত্যাগ করিতে হুকুম দিলেন। কিন্তু দাস-দাসী সহ চেৎসিংহের মাতা এবং স্ত্রী দুর্গের দ্বারে আসিবামাত্র কি লোমহর্ষণ কাণ্ডই সমুপস্থিত হইল।

অর্থলোভে শত শত ইংরাজ, চেৎসিংহের মাতা, স্ত্রী, এবং সঙ্গিনী দাসীদিগের গাত্রাভরণ হরণ করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে আসিয়া আক্রমণ করিল। চেৎসিংহের মাতা এবং স্ত্রী তৎক্ষণাৎ ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। কেহ তাঁহাদের হস্ত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল, কেহ তাঁহাদের পদদ্বয় ধরিয়া টানিতে লাগিল। কেহ পরিধেয় বস্ত্রখানি টানিয়া লইয়া গেল। কেহ কণ্ঠের হার খুলিবার নিমিত্ত কঠিন হস্তে এই পরম সম্ভ্রান্তা রমণীদ্বয়ের গলদেশ চাপিয়া ধরিল।

রাজপরিবারস্থ পরম সম্ভ্রান্তা এই রমণীদ্বয়ের তৎকালে যেরূপ কষ্ট, যন্ত্রণা, অত্যাচার এবং অপমান সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিতে লেখনী অগ্রসর হয় না। দেশের এ কলঙ্ক যেন ইতিহাসে উল্লিখিত হয় না। ভাবী বংশাবলীর কর্ণে যেন এ কলঙ্কের কথা প্রবেশ করে না। এ জাতীয়-কলঙ্ক চিরকালের নিমিত্ত বিস্মৃতি-সাগরে নিমগ্ন হইলেই ভালো *।

* * *

ছিন্ন-বস্ত্র-পরিহিতা, শারীরিক যন্ত্রণা-নিপীড়িতা, প্রায় চলৎ-শক্তিহীনা রাজা চেৎসিংহের মাতা এবং স্ত্রী সঙ্গের দাস-দাসী সহ বিজয়ঘরের দুর্গ হইতে বারাণসীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এখানে রাজা চেৎসিংহের অনেকগুলি প্রস্তর এবং ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ ছিল। তাহারই একখানি গৃহে ইহারা অবস্থান করিতে লাগিলেন।

---

* And when the princesses, with their relatives and attendants withdrew from the castle, they were plundered of their effects; and their persons otherwise rudely and disgracefully treated by the licentious people and followers of the camp.—James Mill's History of India.

মহারানী গোলাপকুমারী, পূর্ণিমা এবং চেৎসিংহের স্ত্রীকে প্রথমতঃ আপন বাড়িতে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু লজ্জা এবং অপমানে তাঁহারা আত্মীয়-স্বজন কাহাকেও মুখ দেখাইতে সম্মতা হইলেন না। আত্মহত্যার পথাবলম্বন পূর্বক এ কলঙ্ক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

রানী গোলাপকুমারী স্বয়ং তাঁহাদিগের নিকটে যাইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু পূর্ণিমা এ জীবনে আর কাহাকেও মুখ দেখাইবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। তিনি আপন গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া ক্রমাগত তিন-চারিদিন অনশনে দিনাতিপাত করিলেন। এই ঘোর বিপদরাশি, এই লোক-লজ্জা-ভয়, তাঁহার হৃদয় ক্রমে বিগলিত করিল। সংসারের পদ-প্রভুত্বের অনিত্যতা এবং অসারতা ক্রমে ক্রমে তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন। ফিরিঙ্গীর স্পর্শ-স্বরূপ-কলঙ্ক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার নিমিত্ত তুষানলে দেহ ত্যাগ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু পিতার কথা স্মৃতি-পথা-রূঢ় হইবামাত্র, মনে করিলেন একবার পিতৃচরণে প্রণাম করিয়া তুষানলে প্রাণ-বিসর্জন করিবেন। বাল্যকালের সকল কথা, সকল অবস্থা ক্রমে স্মৃতি-পথা-রূঢ় হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে সেই বাল্যস্মৃতি অন্তরের মধ্যে সমুদিত হইয়া পূর্ণিমাকে আবার সেই পিতৃ-ক্রোড়স্থিতা বালিকা করিয়া তুলিল। পূর্ণিমা রাজপদ, অর্থ-সম্পত্তি, পদ-প্রভুত্ব সকলই বিস্মৃত হইলেন। বিলাসপ্রিয়তা, ধনগর্ব এবং পদ-প্রভুত্ব-সম্ভূত অজ্ঞানতার তমঃরাশি এ পর্যন্ত পূর্ণিমার অন্তরস্থিত অপরিমেয় পিতৃভক্তি এবং ধর্মভাব সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল। কিন্তু আজ বিপচ্চন্দ্রালোকে সে তমঃরাশি বিদূরিত হইল। তিনি পিতৃচরণ দর্শনার্থ ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। অহর্নিশ পিতৃচরণ ধ্যান করিতে লাগিলেন। পিতৃমুখ-দর্শন-আশাই কেবল কিছুকালের নিমিত্ত তাঁহাকে জীবন বিসর্জনের পথ হইতে বিরত রাখিল।

চেৎসিংহের সহধর্মিণীও শোকাকুল হৃদয়ে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ বৃথা শোক দ্বারা শরীর শোষণ করিলে কোনো লাভ নাই। এ সমুদয়ই চেৎসিংহের কাপুরুষতার প্রায়শ্চিত্ত। এ সংসারে প্রত্যেক কাপুরুষকেই চেৎসিংহের ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এই পাপ, অত্যাচার এবং স্বার্থপরতা পরিপূর্ণ সংসারে কাপুরুষের স্ত্রী এবং জননীকে পর্যন্ত চিরকাল এই প্রকার অপমান, যন্ত্রণা ও অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতেও চিরকাল কাপুরুষের স্ত্রী ও জননীকে এইরূপ বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়

ষড়যন্ত্র

চেৎসিংহ ও সুজনসিংহের পলায়নের পর বারাণসী রাজ্য ইংরাজদিগের হস্তগত হইল। কিন্তু বারাণসীর প্রজাবর্গ বিদেশীয় রাজার অধীনতা স্বীকার করিতে বড় ইচ্ছুক নহে। বিশেষতঃ বলবন্তসিংহের পরিবারের প্রতি তাহাদের বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা রহিয়াছে। মহাবীরের উত্তেজনায় আবার সংগ্রাম হইবার উপক্রম হইল।

ওয়ারেন হেস্টিংস বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন যে, চেৎসিংহের কাপুরুষতা নিবন্ধনই এবার আত্মরক্ষা এবং কোম্পানির রাজ্যরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সুতরাং তিনি অনতিবিলম্বে রাজ্যের স্থানে স্থানে ঘোষণাপত্র দ্বারা প্রচার করিলেন যে,—'বারাণসী রাজ্য কখনো ইংরাজ-রাজ্য-ভুক্ত করা হইবে না। ইংরাজদিগের পরমোপকারী বন্ধু মহারাজ বলবন্তসিংহের বংশোদ্ভব কোনো একজন উপযুক্ত রাজপুত্রকে সিংহাসন প্রদত্ত হইবে'

প্রজাদিগকে যুদ্ধ হইতে বিরত করিবার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় ঘোষণা-পত্র দ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা হইল যে,—'বারাণসী এবং অন্যান্য স্থানের যে সকল লোক চেৎসিংহের পক্ষ হইয়া ইংরাজদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে, তাহাদিগকে আর কোনো প্রকার দণ্ড প্রদান করা যাইবে না। স্বয়ং চেৎসিংহ এবং সুজনসিংহ ভিন্ন অন্যান্য সকলের অপরাধ মার্জনা করা হইল। তাহারা নির্বিঘ্নে পূর্বের ন্যায় এই রাজ্যে অবস্থান করিতে পারিবে।'

রানী তাঁহার দৌহিত্রকে সিংহাসন প্রদান করিতে সম্মতা হইলেন। ত্রিহুত নিবাসী রানীর জামাতা দুর্বিজয়সিংহের তিনবৎসর বয়স্ক পুত্র মহীপনারায়ণসিংহ বারাণসীর সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু রাজ্য-শাসন ও রক্ষণের প্রায় সমুদয় ক্ষমতা হেস্টিংস ইংরাজ রেসিডেন্টের হাতে রাখিলেন। দুর্বিজয়সিংহ আপন পুত্রের অভিভাবকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

কোম্পানির ধনাগার শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই, হেস্টিংস চেৎসিংহের সমুদয় ধন-সম্পত্তি অপহরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা অবস্থান কালে মনে করিতেন, চেৎসিংহের ধনাগারে অনেক টাকা সঞ্চিত আছে। কোনো একটা অবৈধ উপায় অবলম্বন পূর্বক চেৎসিংহের ধনাগার

লুণ্ঠন করিতে পারিলেই কোম্পানির রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু তাঁহার সে আশা বৃথা হইল। চেৎসিংহের ধনাগারে সর্ব্বশুদ্ধ বিশ-ত্রিশ লক্ষ টাকার অধিক পাইলেন না। ইহার কতকাংশ সৈন্যদিগের পুরস্কার স্বরূপ দিতে হইল। আর বক্রী টাকা যুদ্ধের ব্যয় বহনে নিঃশেষিত হইল। হেষ্টিংস এবার ঘোর বিপদে পড়িলেন। অর্থ সঞ্চয়ার্থ এখন কি উপায় অবলম্বন করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্থির করিলেন যে, অযোধ্যার বউবেগম এবং মতীবেগমের ধনাগার লুণ্ঠন করিবেন।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, ১৭৭৫ সালের ১৫ই অক্টোবরের একরারনামা দ্বারা ইংরাজ গবর্নমেণ্ট বউবেগমের ধনাগার এবং জায়গির রক্ষার্থ নবাবের প্রতিভূ হইয়াছেন। ইহার পর ১৭৭৭ সালে অনেক পত্রা-পত্রির পর মতীবেগমকেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এবং নবাব আসফউদ্দৌলা একত্র হইয়া তদ্রূপ একরারনামা * লিখিয়া দিয়াছেন। বেগমেরা আপন আপন তহবিল হইতে নবাবের দেও টাকা ইংরাজদিগকে পরিশোধ করিয়াছিলেন বলিয়াই, ইংরাজেরা তখন বেগমদিগের সঙ্গে এইরূপ সন্ধি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এই দুইখানি একরারনামা কিম্বা সন্ধিপত্র অনুসারে বেগমদিগের ধন-সম্পত্তি রক্ষার ভার ইংরাজদিগের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। সুতরাং ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক এই সন্ধিপত্র ভঙ্গ না করিলে, আর বেগমদিগের ধন-সম্পত্তি অপহরণ করিবার উপায় নাই।

কিন্তু লর্ড ক্লাইব এবং ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রভৃতি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিগণ কি কোনো প্রকার বিশ্বাসঘাতকতার কার্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন? জগতের এমন কি কুকার্য আছে, যাহা হইতে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তৎকালের গবর্নর ও অন্যান্য কর্মচারিগণ বিরত থাকিতেন?

হেষ্টিংস বেগমদিগের সঙ্গে পূর্ব্বকৃত সন্ধি ভঙ্গ করিবার ছলনা অন্বেষণ করিতে

---

* I who am the Nawab Asoph Dowla Bahadur do agree, that the gagheers, gunges &c. and those (properties) specefied in the accounts annexed shall be at the disposal and under the management and authority of the Begum, and no one shall oppose or prevent it; this I will punctually observe. In this agreement Mr. Middleton and the English are engaged.

Secondly—whenever the Begum should choose to go to Mecca I will not oppose it.

Thirdly—whenever the Begum should go to Mecca, she shall leave her lands, gagheers &c. either in the care of my mother or of me &c.

লাগিলেন। বেগমেরা অন্দরবাসিনী সম্ভ্রান্তা রমণী। কোনো লোকের সঙ্গে তাঁহাদের কোনো কথা-বার্তা হয় না, দেখা সাক্ষাৎ হয় না। ইহাদের বিরুদ্ধে কোনো সম্ভবপর মিথ্যা অভিযোগ প্রস্তুত করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু কোনো কার্যই ওয়ারেন হেস্টিংসের অসাধ্য ছিল না। হেস্টিংস মনে মনে স্থির করিলেন যে, বেগমেরা চেৎসিংহকে ইংরাজদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, চেৎসিংহকে সৈন্য প্রদান পূর্বক সাহায্য করিয়াছেন, এইরূপ ছলনা করিয়া তাঁহাদিগের ধন-সম্পত্তি অপহরণ করিতে হইবে। এইরূপ ছলনা ভিন্ন সন্ধি ভঙ্গের আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

এই দুরভিসন্ধি সংসাধনার্থ হেস্টিংস নবাব আসফউদ্দৌলাকে চুনারে আনয়ন করিবার কৌশল করিতে লাগিলেন। তিনি চুনারে পৌঁছিলে পর আসফ-উদ্দৌলা তথায় যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া পত্র লিখিলেন। হেস্টিংস তাঁহার পত্রের প্রত্যুত্তরে লিখিয়া পাঠাইলেন—'আপনার এখানে আসিবার কোনো প্রয়োজন নাই। আপনি কোম্পানির প্রাপ্য টাকা অবিলম্বে পরিশোধ করিতে চেষ্টা করুন।'

আসফউদ্দৌলার টাকা পরিশোধ করিবার সাধ্য নাই। সুতরাং এইরূপ পত্র প্রাপ্তিমাত্র হেস্টিংসের সহিত সাক্ষাৎ করা তিনি নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিলেন। এদিকে রেসিডেন্ট মিডলটন্ সাহেব বিশেষ চতুরতা সহকারে গোপনে বন্ধুত্বভাব প্রকাশ পূর্বক আসফউদ্দৌলাকে হেস্টিংসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পরামর্শ দিলেন। আসফউদ্দৌলা মনে করিলেন যে রেসিডেন্ট নিঃস্বার্থ বন্ধুতার অনুরোধেই কেবল তাঁহাকে এই সৎপরামর্শ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু ইংরাজদিগের রাজনৈতিক-কৌশল যে কি ভয়ানক প্রবঞ্চনা-মূলক-ব্যবহার, তাহা কি আর আসফউদ্দৌলার ন্যায় নির্বোধ লোক বুঝিবেন? আসফউদ্দৌলা হেস্টিংসকে উৎকোচ প্রদানার্থ দশলক্ষ টাকা সঙ্গে করিয়া চুনারে আসিলেন। পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে পর হেস্টিংস বলিলেন, —'আপনাকে আমি এখানে আসিতে নিষেধ করিয়াছি। আপনার এখানে আসিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। আমাদের সৈন্যের ব্যয় নির্বাহার্থ আপনার নিকট যে টাকা বাকি পড়িয়াছে, তাহা অবিলম্বে দিতে হইবে।'

নিস্তেজ আসফউদ্দৌলা বলিতে লাগিলেন,—'আপনি আমার স্বর্গীয় পিতার পরম বন্ধু। আমি আপনাকে পিতৃ-তুল্য মনে করি। আমার রাজ্য রক্ষার ভার আপনার হস্তে প্রদান করিয়াছি। আপনাদিগের সঙ্গে আমার যে সন্ধি

আছে অনুসারে আমার ইচ্ছানুসারে আপনাদের কেবল একদল সৈন্য আমার রাজ্যে রাখিতে হইবে; তাহার ব্যয় মাসিক দুই লক্ষ বাট হাজার টাকা আমার দিতে হইবে। কিন্তু আর-একদল অতিরিক্ত সৈন্য যে তিন বৎসর পর্যন্ত আমার রাজ্যে রাখিয়াছেন, তাহার ব্যয় আমি কোনো প্রকারেই বহন করিতে পারি না। বিশেষতঃ আপনাদের সৈন্য আমার রাজ্যে এখন রাখিবারও কোনো প্রয়োজন নাই। দেশীয় অন্য কোনো রাজার সঙ্গে আমার বিবাদ নাই। আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই অতিরিক্ত সৈন্যের (Temporary Brigade) ব্যয়ভার বহন হইতে আমাকে অব্যাহতি প্রদান করুন।'

আসফউদ্দৌলা এই কথা বলিয়াই প্রকারান্তরে হেস্টিংকে দশলক্ষ টাকা উৎকোচ প্রদান করিবার প্রস্তাব করিলেন। আসফউদ্দৌলা মনে মনে আশা করিয়াছেন যে, হেস্টিংস দশলক্ষ টাকা উৎকোচ পাইলে নিশ্চয়ই কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট এই অতিরিক্ত সৈন্যদল অযোধ্যা হইতে স্থানান্তর করিতে লিখিবেন।

পাঠকদিগের জ্ঞাতার্থে এই অতিরিক্ত সৈন্যদল (Temporary Brigade) অর্থাৎ প্রসিদ্ধ সাময়িক ব্রিগেড্ সম্বন্ধীয় দুই-একটি কথা এই স্থানে উল্লেখ করিতেছি। অযোধ্যার নবাব ইংরাজ-সৈন্য চিরকাল স্বদেশে রাখিবেন বলিয়া কোনো প্রতিজ্ঞা করেন নাই। রোহিলা যুদ্ধের সময় ইংরাজগণ সুজাউদ্দৌলাকে একদল সৈন্য প্রদান করিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। সেই সৈন্যদল সুজাউদ্দৌলা যত দিন স্বেচ্ছাপূর্বক আপন রাজ্যে রাখিবেন, তত দিন তাঁহাকে তাহার ব্যয়নির্বাহার্থ মাসিক দুইলক্ষ দশহাজার টাকা দিতে হইবে; এই প্রকার সন্ধি হইয়াছিল। সুজার মৃত্যুর পর ইংরাজগণ অন্যায়পূর্বক আপন সৈন্য অযোধ্যায় রাখিয়া দিলেন। অযোধ্যার নবাবের এখন আর ইংরাজ-সৈন্য স্বদেশে রাখিবার কোনো প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইংরাজেরা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেন না। সৈন্যের ব্যয় নবাবের নিকট হইতে আদায় করিবার দুরভিসন্ধি করিয়া অযোধ্যায় আপনাদের সৈন্য রাখিয়াছেন এবং এখন সেই সৈন্যের ব্যয় নির্বাহার্থ মাসিক দুইলক্ষ বাট হাজার টাকা ধার্য করিয়াছেন। আসফউদ্দৌলার সিংহাসনারোহণের পর তিনি ইংরাজদিগকে তাহাদের সৈন্য অযোধ্যা হইতে স্থানান্তরিত করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। কিন্তু ইংরাজেরা বলেন যে এখনোও অযোধ্যায় সৈন্য রাখিবার বিলক্ষণ প্রয়োজন রহিয়াছে। নবাব নিজের হিতাহিত বুঝিতে পারেন না। তজ্জন্যই সৈন্য

আনিতে অনুরোধ করিতেছেন। নবাবকে বাধ্য করিয়া ইংরাজেরা এই প্রকারে আপন সৈন্য অযোধ্যায় রাখিলেন। অত্যল্পকাল মধ্যেই নবাব এই সৈন্যের ব্যয়ভার বহন করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। তখন ইংরাজেরা তাঁহাকে নিজের সৈন্যের সংখ্যা হ্রাস করিতে পরামর্শ প্রদান করিলেন। ইংরাজেরা বলিলেন যে, তাঁহার নিজের সৈন্য বিশেষ কার্যদক্ষ নহে। তাহাদিগকে পদচ্যুত করা উচিত। ইংরাজদিগের অনুরোধে ব্যয় সঙ্কোচ করিবার নিমিত্ত আসফউদ্দৌলা আপন সৈন্যের সংখ্যা হ্রাস করিলেন। তাঁহার নিজের অনেক সৈনিক কর্মচারিদিগকে পদচ্যুত হইতে হইল।

ইংরাজগণ চিরকালই এদেশীয় লোকের উপকারার্থ এত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অবস্থান করিতেছেন। এদেশীয় লোকের উপকার করাই তাঁহাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য। আসফউদ্দৌলার যে সকল সৈনিক কর্মচারী বরখাস্ত হইল, তাহারা অনাহারে কষ্ট না পায়, তজ্জন্য ইংরাজেরা তাহাদিগকে আপন সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত করিলেন। খ্রীস্টধর্মাবলম্বী লোকেরা পরোপকারই ইহাদিগের একমাত্র ব্রত বলিয়া মনে করেন। সুতরাং এই পদচ্যুত সৈন্যদিগের অন্নের সংস্থান করিয়া দিলেন। কিন্তু ইহাতে ইংরাজ-সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হইল। তখন তাঁহারা এই সকল পদচ্যুত সৈন্যদ্বারা একটা ব্রিগেড প্রস্তুত করিয়া, নবাবের সাহায্যার্থ এই নূতন সৈন্যদল সাময়িক সৈন্যদল-স্বরূপ নবাবের রাজ্যরক্ষার্থ অযোধ্যায় রাখিয়া দিলেন। এই সৈন্যের ব্যয় আবার নবাবকেই বহন করিতে হইল।

পাঠক, এই প্রকার কৌশলকেই বিদেশীয়-রাজনৈতিক-কৌশল বলা যায়। ইংরাজেরা নবাবকে তাঁহার নিজের সৈন্য পদচ্যুত করিতে বলিলেন। সেই পদচ্যুত সৈনিক-পুরুষগণ ইংরাজদিগের অধীনে নিযুক্ত হইলেন। ইংরাজেরা সেই সৈন্যের ব্যয়-নির্বাহের-ভার আবার নবাবের হস্তেই প্রদান করিলেন। কেবল ব্যয়-নির্বাহের-ভার নহে, নবাবকে ইংরাজদিগকে কিছু লাভ প্রদান পূর্বক সেই সৈন্যের ভাড়া দিতে হইল। আজ আসফউদ্দৌলা সেই অতিরিক্ত সৈন্যদলের ব্যয়-নির্বাহের-ভার হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত হেস্টিংসের চরণ ধরিয়া ক্রন্দন করিতেছেন।

প্রথমতঃ হেস্টিংস আসফউদ্দৌলার কথায় একেবারেই কর্ণপাত করিলেন না। কিন্তু এখন তাঁহাকে একটু হাতের মধ্যে আনিতে না পারিলে বেগমদিগের অর্থাপহরণের সুবিধা হইবে না। সুতরাং হেস্টিংস এই অতিরিক্ত-

সৈন্যদল অযোধ্যা হইতে স্থানান্তর করিবেন বলিয়া সম্মত হইলেন। এবং বেগমদিগের ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া কোম্পানির টাকা পরিশোধার্থ আসফউদ্দৌলাকে পরামর্শ প্রদান করিলেন। আসফউদ্দৌলা তাঁহার জননীর এবং পিতামহীর ধনাগার লুণ্ঠন করিতে প্রথমতঃ সম্মত হইলেন না। কিন্তু হেষ্টিংস বলিলেন যে তাঁহার মাতা এবং পিতামহী যখন চেৎসিংহের সাহায্য করিয়াছেন তখন ইংরাজেরা তাঁহাদিগের সঙ্গে সন্ধি প্রতিপালন করিতে বাধ্য নহেন। বেগমদিগের ধনাগার তিনি লুণ্ঠন না করিলে তাঁহাদিগের সম্পত্তি লুণ্ঠনার্থ ইংরাজ সৈন্য প্রেরিত হইবে।

হেষ্টিংস বারম্বার ভয় প্রদর্শন করিলে পর, নিস্তেজ আসফউদ্দৌলার আর হেষ্টিংসের কথার প্রতিবাদ করিতে সাহস হইল না। তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। 'মৌনং সম্মতি লক্ষণম্'—স্থির করিয়া হেষ্টিংস তৎক্ষণাৎ এক নতুন সন্ধিপত্রে নবাবকে দস্তখত করাইলেন। আজ ইংরাজ গবর্নমেণ্টের সঙ্গে নবাব আসফউদ্দৌলার এক নতুন সন্ধি সংস্থাপিত হইল। এই সন্ধিপত্রই চুনারের সন্ধিপত্র নামে ইতিহাসে অভিহিত হইয়াছে। ১৭৮১ খ্রীঃ অব্দের ১০শে সেপ্টেম্বর চুনারের সন্ধিপত্র দস্তখত হইল *।

চুনারের সন্ধিপত্র দ্বারা ওয়ারেন হেষ্টিংস অতিরিক্ত সৈন্যদল অযোধ্যা হইতে স্থানান্তর করিতে সম্মত হইলেন এবং নবাবকে দেশের সমুদয় জায়গিরদারের জায়গির খাস করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। এইরূপ অনুমতি প্রদান করিবার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে। ইংরাজেরা বেগমদিগের জায়গির রক্ষার্থ জামিন হইয়াছিলেন। এখন আর ইংরাজ গবর্নমেণ্ট জামিন রহিলেন না। নবাব প্রকারান্তরে তাঁহার পিতামহী ও মাতার জায়গির খাস করিতে অনুমতি দিলেন। আজ বেগমদিগের সর্বনাশ করিবার ষড়যন্ত্র হইল।

---

* চুনারের সন্ধিপত্রে লিখিত হইল।—That the temporary brigade and three regiments of cavalry be no longer charged to the Nawab's account for the year Fussulee 1189 excepting a term for two and a half months, which is required for their passing the Nawab's boundaries—Aitchison's treaties &c.

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়

প্রমাণ সংগ্রহ

অন্যের অনিষ্ট করিবার নিমিত্ত যাহারা চক্রান্ত করে, ষড়যন্ত্র করে, তাহাদের মন সর্বদাই অশান্তিতে পরিপূর্ণ থাকে। এ সংসারে ধূর্ত, শঠ এবং প্রবঞ্চক কখনো শান্তি ভোগ করিতে সমর্থ হয় না।

অযোধ্যার বেগমদ্বয়ের অর্থাপহরণ করিবার দুরভিসন্ধি হেস্টিংসের অন্তরে বিবিধ বিপদাশঙ্কা আনয়ন করিল। হেস্টিংস মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—বেগমদ্বয় যে চেৎসিংহকে সাহায্য করিতেছেন তাহার কোনো প্রমাণ নাই। বিশেষতঃ চেৎসিংহ প্রাণান্তেও আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। চেৎসিংহের প্রজাগণ তাঁহার অসম্মতিতে তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়াছিলেন। কারামুক্ত হইবার পর পনের দিবসের মধ্যেও চেৎসিংহ ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেণ নাই। ইংরাজ সৈন্য তাঁহার এক-একটি দুর্গ আক্রমণ করিবামাত্র তিনি পলায়নপূর্বক অন্য দুর্গে চলিয়া গিয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় যখন চেৎসিংহ নিজেই কোনো যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন না, তখন তাঁহার সাহায্যকারী বলিয়া অপরকে কিরূপে দণ্ড প্রদান করা যাইতে পারে?

এই প্রশ্ন হেস্টিংসের মনে উদয় হইবামাত্র তিনি স্বীয় দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ করিবেন কি না, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ধনাগারে টাকা নাই। বিলাত হইতে ডিরেক্টরেরা টাকা প্রেরণ করিতে লিখিয়াছেন। তিনি দস্যুবৃত্তি অবলম্বন পূর্বক সহজে টাকা সংগ্রহ করিতে পারেন বলিয়াই, ডিরেক্টরেরা তাঁহার সকল অপরাধ মার্জনা করেন। এমতাবস্থায় টাকা সংগ্রহ ভিন্ন আপন পদ রক্ষার উপায় নাই। সুতরাং এ দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন না।

কিন্তু বেগমদিগের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অভিযোগ সাব্যস্ত করিবার পূর্বে কোনো প্রমাণ গ্রহণ করা হইল না। ভবিষ্যতে যদি এই বিষয় লইয়া বিলাতে কোনো আন্দোলন হয় তবে তাঁহাকে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে।

এই চিন্তা হেস্টিংসের মনে বিশেষ কষ্ট প্রদান করিতে লাগিল। হেস্টিংস মনে করিলেন যে আপন প্রিয়বন্ধু এবং তাঁহার সকল কুকার্যের সহচর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান জজ ইলা ইজা ইম্পির সহিত পরামর্শ না করিয়া এই প্রকার গুরুতর কার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ ইম্পিকে উত্তর-

পশ্চিমাঞ্চলে আসিতে অনুরোধ করিলেন। ইনা ইচ্ছা ইম্পি স্বাস্থ্য রক্ষার ছলনায় উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আসিলেন।...

ইম্পি ব্যবহারশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী। তিনি আইন ব্যবসায়ী লোক। জনসাধারণের অর্থাপহরণার্থ কলঙ্কিত না হইয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বনার্থই বোধহয় আইনের সৃষ্টি হইয়াছে। এই দুইটি উদ্দেশ্য আইনের সাহায্য ভিন্ন কখনোও সংসিদ্ধ হয় না। ভারতে মুসলমানদিগের সময় আইন-কানুন বিশেষ রূপে প্রচলিত ছিল না। তাঁহারা রাজস্ব আদায় উপলক্ষে প্রজার বাড়ি লুট করিতেন, সুতরাং লোকে তাঁহাদিগকে দস্যু বলিয়া অভিহিত করিত। কিন্তু এখন মাল ক্রোকী পরওয়ানা আইনানুসারে জারি হয়। এই পরওয়ানা জারি উপলক্ষে প্রজার গৃহের সর্বস্ব লুট করিলেও কেহ নিন্দা করিতে পারে না। এ আইনসঙ্গত কার্য। আইনের ন্যায় ঈদৃশ মহাস্ত্র যিনি ধারণ করেন, তাঁহার ন্যায় সৌভাগ্যশালী এ সংসারে কেহই নাই। তিনি চুরি করিলেও চোর নহেন, ডাকাতি করিলেও দস্যু নহেন। তাঁহার ব্যবসার পরিচ্ছদ তাঁহার সকল কলঙ্ক ঢাকিয়া রাখে। তিনি সর্বদাই ভদ্রলোক।

আজ হেস্টিংস অনন্যোপায় হইয়া আইন ব্যবসায়ী ইম্পির শরণাগত হইলেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারক বেগমদিগের অপরাধের প্রমাণ সংগ্রহার্থ লক্ষ্ণৌ চলিয়া গেলেন। বেগমদ্বয় ফৈজাবাদে অবস্থান করিতেছেন। সেখানে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলে, পাছে অভিযোগ মিথ্যা সাব্যস্ত হয়, স্থানান্তরে যাইয়া প্রমাণ সংগ্রহ করাই উচিত বোধ হইল।

কিন্তু এ মকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি প্রমাণ গ্রহণের পূর্বেই হইয়াছে। নবাবের সন্ধিপত্রদ্বারা হেস্টিংস নবাবকে বেগমদিগের জায়গীর খাস করিতে অনুমতি দিয়াছেন। বেগমদিগের অপরাধ সাব্যস্ত করি। পূর্বেই হেস্টিংস তাঁহাদিগের সহিত সন্ধি ভঙ্গ করিয়াছেন। তবে এখন কোন আইন অনুসারে ইম্পি প্রমাণ গ্রহণ করিতেছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা পাঠকদিগকে এইমাত্র বলিতে পারি, যে আইন অনুসারে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হইয়াছিল, এবারও ইম্পি সেই আইনের আশ্রয় লইয়াছেন, সেই আইনানুসারেই কার্য করিতেছেন।

ইম্পি হেস্টিংসের অনুরোধে লক্ষ্ণৌ নগরে পৌঁছিলে পর, রেসিডেন্ট মিডলটন সাহেব বেগমদিগের অপরাধ সাব্যস্ত করিবার নিমিত্ত বিস্তর খোজা সাক্ষী আনিয়া উপস্থিত করিলেন, কিন্তু বেগমেরা ইহার বিন্দুবিসর্গও

জানেন না। প্রথম সাক্ষী কাপ্তেন গর্ডন। গোরক্‌পুরের প্রজাগণ ইহার প্রাণ বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে পর সহৃদয়া বউবেগম আপনার লোক প্রেরণ করিয়া ইঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। প্রায় বৎসরেক হইল ইনি বউবেগমের নিকট আপন হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্বক লিখিয়াছিলেন,—'মা আপনার কৃপাতেই আমার জীবন রক্ষা হইয়াছে। আপনি সাহায্য না করিলে নিশ্চয়ই আমাকে প্রজাগণ হত্যা করিত।' কিন্তু কৃতজ্ঞতার নেশা আর কতদিন থাকিবে। উৎকৃষ্ট ব্রাণ্ডী কিম্বা রাজসাহীর উৎকৃষ্ট গাঁজার নেশাই পাঁচঘণ্টার অধিক থাকে না। গর্ডনের সে কৃতজ্ঞতার নেশা চলিয়া গিয়াছে। তিনি বউবেগমের বিরুদ্ধে আজ অম্লানবদনে মিথ্যাসাক্ষ্য-প্রদান করিলেন। ইম্পির নিকট বলিলেন, লোক পরম্পরায় শুনিয়াছেন যে, বেগমেরা চেৎসিংহের সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন্ লোকের নিকট শুনিয়াছেন, তাহা বলিবার সাধ্য নাই। দ্বিতীয় সাক্ষী কর্নেল হানে বলিলেন, তিনিও কেবল লোক পরম্পরায় শুনিয়াছেন যে, বেগম গোরক্‌পুর এবং বেরুচের লোকদিগকে বিদ্রোহী হইতে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। গোরক্‌পুর এবং বেরুচের প্রজাগণ ইঁহারই অত্যাচারে বিদ্রোহী হইয়াছিল। কিন্তু ইনি লোক পরম্পরায় শুনিলেন, বেগম তাহাদিগকে বিদ্রোহী হইতে উৎসাহ দিয়াছেন। প্রজার সর্বনাশ করিয়া নবাবের প্রাপ্য রাজস্ব নয় লক্ষ টাকা বাদে, দুই বৎসরের মধ্যে ইনি ত্রিশলক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছেন। ইহাতেও প্রজাগণ অস্ত্রধারণ করিবে না ?

এইরূপে অনেক সাক্ষীর জবানবন্দী হইল। কিন্তু কোনো সাক্ষীই বেগমকে কিম্বা তাঁহার কোনো কর্মচারীকে কোনো অপরাধের কার্য করিতে দেখেন নাই। ইম্পি ইহাদের জবানবন্দী শুনিয়া বড় হতাশ্বাস হইলেন। তিনি ইহাদের সাক্ষ্য আর নিজহস্তে লিখিলেন না। প্রত্যেক সাক্ষীকে আপন আপন কথা লিপিবদ্ধ করিয়া আফিডেবিট প্রদান করিতে বলিলেন। এই সকল আফিডেভিট সংগ্রহ করিয়া সুপ্রিম কোর্টের প্রধান জজ ইলা ইজা ইম্পি আপন প্রিয়বন্ধু ওয়ারেন হেস্টিংসের এই বিপদকালে যারপর নাই উপকার করিলেন।

এই অধ্যায় সমাপ্ত করিবার পূর্বে, কর্নেল হানের বিষয় এই উপন্যাসে আর যাহা কিছু বলিবার আছে, তাহা এই স্থানেই উল্লেখ করিতেছি। এ পিশাচ মূর্তি বারবার পাঠক, বিশেষতঃ কোমল-হৃদয়া পাঠিকাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা হয় না।

কর্নেল হ্যানে ইলা ইজা ইম্পির মাসতাত ভ্রাতা। এই জন্যই হেষ্টিংস এ পর্যন্ত ইহাকে পদচ্যুত করেন নাই। ইহার বিরুদ্ধে বারম্বার স্বয়ং নবাব আসফউদ্দৌলা এবং তাঁহার মন্ত্রী হায়দরবেগ খাঁ হেষ্টিংসের নিকট অনেকানেক অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু হেষ্টিংস তাঁহাদের কথায় কখনো কর্ণপাত করেন নাই। এবার কর্নেল হ্যানের দুরদৃষ্টবশতঃ হেষ্টিংসের আজ্ঞাপালনে ত্রুটি হইল। চুনার হইতে হেষ্টিংস কর্নেল হ্যানেকে সসৈন্যে তাঁহার সাহায্যার্থ বারাণসীতে আসিতে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু কর্নেল হ্যানে অনেক বিলম্ব করিয়া চুনারে আসিয়া পৌছিল। সহস্র সহস্র নরহত্যাপেক্ষাও হ্যানের এই ত্রুটীই গুরুতর অপরাধ বলিয়া সাব্যস্ত হইল। হেষ্টিংস কর্নেল হ্যানের সাক্ষ্য প্রদানের পর তাঁহাকে বরখাস্ত করিলেন। হ্যানের বিরুদ্ধে পূর্বে নবাব যে সকল অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহারও বিচার হইবে বলিয়া জনরব উঠিল। কিন্তু এই জনরব সম্পূর্ণ অমূলক। কর্নেল হ্যানে এই জনরব সত্য মনে করিয়া কলিকাতা পৌছিয়াই উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিল।

কাহারও অপমৃত্যু হইলে শাস্ত্রানুসারে তাহার শ্রাদ্ধের কোনো বিধান দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং কোনো ইংরাজ ইতিহাস লেখকই কর্নেল হ্যানের শ্রাদ্ধ করিতে সাহস করিলেন না। তাঁহারা সকলেই কর্নেল হ্যানেকে নরপিশাচ বলিয়া অভিহিত করিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে বিবিধ প্রকারের লোক এবং বিবিধ প্রকারের শাস্ত্র রহিয়াছে। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে বঙ্গদেশের রাজা দেবীসিংহ সদৃশ অযোধ্যানিবাসী আবুতালিব কর্নেল হ্যানের আসিষ্টাণ্ট ছিলেন। কাপ্তেন রিচার্ডসনের মত গ্রহণান্তর এবং অযোধ্যার মন্ত্রীর পদ লাভের প্রত্যাশায়, আবুতালিব কর্নেল হ্যানের মন্ত্র পাঠ করিলেন। তাঁহার "লাব্বিলিকা কৈফিয়াত" নামা পুস্তকে * কর্নেল হ্যানেকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া তিনি শাস্ত্রানুসারে তাঁহার যথোচিত শ্রাদ্ধ করিলেন। আবুতালিব পিণ্ড প্রদান না করিলে আর কর্নেল হ্যানের কখনোও শ্রাদ্ধ হইত না। ভারতের হিন্দু এবং মুসলমানগণ বোধহয় কেবল শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পাদনার্থ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এক-একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন কালে, দেশের প্রধান প্রধান হিন্দু এবং মুসলমানগণকে প্রায়ই টাউনহলে সমবেত হইয়া তাঁহাদের শ্রাদ্ধের মন্ত্র পাঠ করিতে দেখা যায়।

---

* আবুতালিবের এই পারস্য পুস্তক এটাওয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট হুই সাহেব ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছেন।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়

পিতাপুত্র

অন্নকষ্ট কি ভয়ানক দুরবস্থা। অন্নকষ্টে পড়িয়া মানুষ সর্বদাই মনুষ্যত্ব বিবর্জিত হয়। দারিদ্র্য এবং অন্নকষ্ট মানুষের সমুদয় সদ্‌গুণকে বিনাশ করে, হৃদয়কে দয়া, মায়া, স্নেহস্পর্শশূন্য করে; এবং অন্তরাত্মাকে কঠিন করে।

এ সংসারে এই অন্নকষ্ট এবং দারিদ্র্য কি মানুষের অপরিহার্য এবং অখণ্ডনীয় দুর্ভাগ্য? যদি তাহা হয়, তবে কে অস্বীকার করিতে পারে যে ঈদৃশ নরকতুল্য, এই প্রকার দুঃখ-যন্ত্রণা-পরিপূর্ণ সংসারের স্রষ্টা নিতান্তই নিষ্ঠুর। মানুষ কেবল আপন আপন অন্তরস্থিত কাপুরুষতা নিবন্ধনই এইরূপ স্রষ্টাকেও দয়াময় বলিয়া অভিহিত করে। কিন্তু এ অন্নকষ্ট কিরূপে সমুদ্ভূত হইয়াছে? এ ঘোর অন্নকষ্ট কি ঈশ্বরের বিধান? না মানুষের স্বীয় স্বীয় কর্মফল।

ইংরাজদিগের অত্যাচার এবং অর্থগৃধ্নুতা নিবন্ধন রোহিলখণ্ড এবং অযোধ্যার অধিবাসিগণ এখন মানব প্রকৃতি বিবর্জিত হইয়া পড়িয়াছে। অন্নকষ্ট এবং দারিদ্র্য তাহাদিগের হৃদয় মায়াশূন্য করিয়াছে। জননী ক্রোড়স্থিত শিশুকে বিক্রয় করিয়া উদরপূর্তির উপায় করিতেছে, সন্তান চলৎশক্তিহীন বৃদ্ধ পিতা মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া আহারান্বেষণে স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেছে। স্বামী, স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতেছে; স্ত্রী, স্বামীকে পরিত্যাগ করিতেছে। এ দিকে দেশের মধ্যে যে সকল লোকের শরীরে অপেক্ষাকৃত অধিকতর বল আছে, তাহারা দস্যুবৃত্তি অবলম্বন পূর্বক কি স্বদেশীয়, কি বিদেশীয়, কি পথিক, কি তীর্থযাত্রী সমুদয় লোকের অর্থ অপহরণ করিতেছে। অযোধ্যা এবং রোহিলখণ্ড ভূত প্রেতের আবাস স্বরূপ শ্মশানভূমি হইয়া পড়িয়াছে। দুই জন পথিক অত্যন্ত আক্ষেপ করিতে করিতে মনোদুঃখে এই শ্মশানস্বরূপ সুবিস্তীর্ণ প্রদেশের মধ্যস্থিত দিগন্তর ব্যাপ্ত রাজপথ দিয়া সন্ন্যাসীর বেশে পশ্চিম হইতে ক্রমেই পূর্বদিকে চলিয়াছেন। ইঁহারা বেরিলি হইতে যাত্রা করিয়া কয়েক-দিনের মধ্যে লক্ষ্মৌ পৌঁছিলেন। পরে লক্ষ্মৌ হইতে আজ প্রত্যূষে ফায়েজাবাদে আসিয়াছেন।

ফায়েজাবাদে নবাব বাড়ির দক্ষিণ সিংহদ্বারের বাহিরেই চকবাজার। এই চকবাজারের একখানি দোকানের নিকট দাঁড়াইয়া এই সন্ন্যাসীদ্বয়ের মধ্যে

অপেক্ষাকৃত ক্ষীণকায় ব্যক্তি, স্থূলকায় সন্ন্যাসীকে বলিতেছেন,—'চল ঠাকুর, আগে তোমাকে আমি সেই ভগ্ন গৃহে লইয়া যাইয়া আমার বাছার হস্তলিপি দেখাইব। বাছার অক্ষর কি সুন্দর।'

দ্বিতীয় সন্ন্যাসী বলিলেন,—'সে কি বাংলা অক্ষর?'

প্রথম। হাঁ স্পষ্ট বাংলা অক্ষর। আট বৎসরের বালকও তাহা পাঠ করিতে পারে।

দ্বিতীয়। আমি যে একেবারেই বাংলা অক্ষর চিনি না। দেবনাগর হইলেও পাঠ করিতে পারিতাম।

প্রথম। আমি তোমাকে পাঠ করিয়া শুনাইব। তুমি চল; আর এখানে বিলম্ব করিলে কি হইবে? সে বৎসর এখানে বহুসংখ্যক দোকান দেখিয়া গিয়াছি। কিন্তু এ বাজার যে একেবারে জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে।

দ্বিতীয়। সে ভগ্ন গৃহ এখান হইতে কতদূর?

প্রথম। প্রায় একক্রোশ পশ্চিমে। একক্রোশ অপেক্ষাও দূর হইবে। সে স্থানের নিকট দিয়া সরযূনদী দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহারই নিকট।

দ্বিতীয়। পথ পর্যটনে বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। সেখানে তো আর কোনো বাজার নাই। এখানে স্নান আহার সমাপন করিয়া, অপরাহ্ণে সেখানে যাইব। সে হস্তাক্ষর দেখিয়া যে কিছু নির্ণয় করিতে পারিব না। বরং এখানে কিছুকাল থাকিয়া, ফরাক্কাবাদের নবাবকন্যা এখানে কোথাও আছেন কি-না, কিম্বা কখনো এখানে ছিলেন কি-না; তাহা লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে পারিব।

আহারান্তে শ্রীনিবাস এবং বাণেশ্বর ফারেজাবাদের সেই ভগ্ন গৃহাভিমুখে চলিলেন। ভগ্ন গৃহের পশ্চিম বারান্দার প্রাচীরে বাণেশ্বর স্বীয় পুত্রের হস্তলিপি দেখিয়া গিয়াছেন। গৃহের নিকটে পৌঁছিয়া, তিনি গৃহের পশ্চাদ্দিক দিয়া শ্রীনিবাসকে সেই গৃহের পশ্চিম বারান্দায় লইয়া গেলেন। ইঁহারা উভয়েই বারান্দায় দাঁড়াইয়া হস্তলিপি দেখিতে লাগিলেন। গৃহে প্রবেশকালে ইঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, তথায় অন্য কোনো লোক নাই। কিন্তু বারান্দায় দাঁড়াইয়া হস্তলিপি দর্শন করিবার সময় ইঁহাদের বোধ হইল যেন অপর দুই জন লোক গৃহের প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে বসিয়া পরস্পরে কথা বলিতেছে। তাহাদিগের পরস্পরের কথাবার্তা ইঁহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন না। কিছুকাল পরে তাহাদিগের মধ্যে একজন বিশেষ উত্তেজিত হইয়া বলিল,—

দাদা,- কি কলঙ্কের কথা! কাশীর রানী চেৎসিংহের মা এবং স্ত্রীর উপর এইরূপ অত্যাচার করিয়াছে। আমি নিশ্চয়ই তোমাকে বলিতেছি, এই সময় কাশীতে থাকিলে নরপিশাচ হেষ্টিংসের মাথা কাটিয়া ফেলিতাম।'

'চেৎসিংহের মা এবং স্ত্রীর উপর এইরূপ অত্যাচার করিয়াছে'—এই কথা শ্রীনিবাসের কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি চমকিয়া উঠিলেন। বক্তা যে প্রকোষ্ঠে বসিয়া কথা বলিতেছিলেন, তিনি সেই প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু সেখানে প্রবেশ করিয়াই দেখেন যে তাঁহার পূর্ব পরিচিত নেহালসিংহের পুত্র অমরসিংহ অপর একটি বৃদ্ধ লোককে সম্বোধন করিয়া কথা বলিতেছেন। শ্রীনিবাস কলিকাতার কয়েক দিন নেহালসিংহের ভবনে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময়েই অমরসিংহের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। শ্রীনিবাস জানিতেন অমরসিংহ নেহালসিংহের পুত্র। বক্সারের যুদ্ধের সময়েও ইহাঁদিগের পরস্পরে দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বক্সারের যুদ্ধের পর ষোলবৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। ষোল বৎসর পরে অমরসিংহ এবং শ্রীনিবাস ইহাঁদিগের পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু উভয়ে উভয়ের মুখাকৃতি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। ভক্তি ও স্নেহের চমৎকার শক্তি। শ্রীনিবাসের প্রতি অমরসিংহের অত্যন্ত ভক্তি। সুতরাং শ্রীনিবাসের মুখাকৃতি তাঁহার হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। আবার শ্রীনিবাসও নেহালসিংহের ভবনে অবস্থানকালে অমরসিংহের সৌজন্য এবং শাস্ত্রানুশীলন দর্শনে তাহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। অমরসিংহ অকস্মাৎ শ্রীনিবাসকে দেখিয়াই আশ্চর্য হইলেন। বাণেশ্বর শ্রীনিবাসের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। অমরসিংহ এখনোও তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। তিনিও অমরসিংহের মুখাকৃতি সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাইলেন না।

অমরসিংহ শ্রীনিবাসকে দেখিবামাত্র তাঁহার পদতলে পড়িয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীনিবাস সস্নেহে তাহাকে আলিঙ্গনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—'বাছা তুমি কোথা হইতে এখানে আসিলে?'

অমরসিংহ বলিলেন,—'গুরুদেব, আপনি আমার সমুদয় দুরবস্থার কথা জানেন না। কলিকাতায় অবস্থানকালে আপনি আমাকে ৺নেহালসিংহের পুত্র বলিয়াই জানিতেন। কিন্তু নেহালসিংহ আমার পিতা ছিলেন না। তিনি আমার জীবনদাতা এবং অন্নদাতা ছিলেন। আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া পূর্বে আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এখন জানিতে পারিয়াছি, তিনি

জীবিত আছেন। দৈবক্রমে তিনি এই গৃহে আসিয়া আমার হস্তলিপি দেখিতে পাইলেন। হস্তলিপি দর্শন করিয়াই তিনি স্থানে স্থানে আমার অনুসন্ধানে ভ্রমণ করিতেছেন।'

অমরসিংহ এই পর্যন্ত বলিবামাত্র শ্রীনিবাসের পশ্চাৎ হইতে প্রাণেশ্বর অগ্রসর হইয়া, অমরসিংহের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন,—'এই যে আমার বাছা—এই যে আমার ভুবন—আমি আমার বাছাকে এতক্ষণ চিনিতে পারি নাই—'

অমরসিংহ আশ্চর্য হইয়া প্রাণেশ্বরের মুখের দিকে চাহিবামাত্র আপন পিতাকে চিনিতে পারিলেন। তখন পিতার পদতলে পড়িয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ সম্বরণ পূর্বক, অমরসিংহ পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

'আমি মুসলমান কন্যা বিবাহ করিয়াছি বলিয়া আপনার মনে অনর্থক সন্দেহ হইয়াছে। পিতৃ-মাতৃ শোকানলে যাহার হৃদয় সর্বদা দগ্ধ হইতেছিল, তাহার কি আবার বিবাহ করিতে ইচ্ছা হয়? ফরক্কাবাদের নবাবের কন্যাকে আমি হাফেজ-নন্দিনী বলিতাম। তাহার কি নাম ছিল, তাহা কখনো ও আমি জানিতে পারি নাই। সেই পিতৃ-মাতৃ-হীন নবাব-কন্যাকে কামাসক্ত লম্পট অযোধ্যার ভূতপূর্ব দুরাচার নবাব সুজাউদ্দৌলার অত্যাচার হইতে রক্ষা করিব বলিয়া, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। তাহাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আমি এবং আমার সঙ্গী এই বৃদ্ধ সিপাহী, এই গৃহে আসিয়া গোপনে অবস্থান করিতে লাগিলাম। ইনি তখন গাঁজা খাইতেন। এখন সে অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহার গাঁজার কল্কি হইতে সময়ে সময়ে এক-একটি অঙ্গার হাতে লইয়া আমি এই প্রাচীরে শ্লোক লিখিতাম। যখনই হাফেজ-নন্দিনীর বিষয় ভাবিতে ভাবিতে মন অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া পড়িত, তখনই এই প্রকার শ্লোক লিখিয়া হৃদয়কে আশ্বস্ত করিতাম।'

ইহার পর অমরসিংহ, হাফেজ-নন্দিনীর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রথম দিবস হইতে মৃত্যু দিবস পর্যন্ত যে সকল ঘটনা হইয়াছিল, তৎসমুদয় শ্রীনিবাস পণ্ডিত এবং তাঁহার পিতার নিকট বিবৃত করিলেন। চিন্তাশীল শ্রীনিবাস পণ্ডিত অমরসিংহের সমুদয় কথা শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—'এ সংসারের কার্যকলাপের মধ্যেও ঈশ্বরের অলঙ্ঘনীয় নিয়ম এবং অদ্ভুত কৌশল পরিলক্ষিত

হয়। অন্তরস্থিত সদিচ্ছা এবং হৃদয়ের সদ্ভাব, ফানস্‌-বাক্সের মধ্যস্থিত দীপের ন্যায় কার্য করিয়া, মানুষকে ঊর্ধ্বে এবং স্বর্গের দিকে সমুত্থিত করে। আবার সেই দীপটি নির্বাণ হইলে ফানস্‌টি যদ্রূপ ভূমিতলে পড়িয়া যায়, মানুষের হৃদয়ও সেই প্রকার সদিচ্ছা এবং সদ্ভাব পরিশূন্য হইলে, ক্রমেই তাহার অধঃপতন হয়, ক্রমেই সে বিপদ হইতে বিপদান্তরে নিমগ্ন হইতে থাকে।

'বাছা, এই অনাথা নবাব-কন্যাকে উদ্ধার করিবার সদিচ্ছাই তোমাকে পিতা, মাতা, স্ত্রী এবং ভগ্নীর সহ পুনর্মিলনের সুযোগ প্রদান করিয়াছে। মনে কর এই সদিচ্ছা—এই সদ্ভাব যদি তোমার হৃদয়ে সমুদিত না হইত, তবে এ জন্মে তুমি কখনোও পিতা-মাতার চরণদর্শনে সমর্থ হইতে না।

'পরমেশ্বর এ সংসারের প্রত্যেক মনুষ্যকেই আপনার ইচ্ছানুসারে কার্য করিতে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু সমগ্র মানবমণ্ডলীর কার্যসমষ্টির মধ্যে তাঁহার এক অপূর্ব কৌশল রহিয়াছে। সেই অপূর্ব কৌশলই একটি অখণ্ডনীয় নিয়ম। সে নিয়ম দ্বারা আমরা সকলেই আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি। সেই অখণ্ডনীয় নিয়মই আমাদিগের জীবনের সমুদয় কার্য-কলাপ পরিচালন করিতেছে। এই অখণ্ডনীয় নিয়ম-সম্বন্ধীয় জ্ঞানই প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞান। এই জ্ঞানের অভাবে শাস্ত্র অধ্যয়ন কেবল অভিমান উৎপাদন করে, এই জ্ঞানের অভাবে সংসারের ধন-মান, পদ-প্রভুত্ব বিষের ন্যায় কার্য করিয়া তদধিকারীর হৃদয় পাষাণবৎ কঠিন করে। এই শ্রেষ্ঠজ্ঞান লাভ হইলেই মানুষ আপনা-আপনি ঈশ্বরের নিকট বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বলিয়া উঠে—

'কি হবে সে জ্ঞানে, যা'তে তোমাকে না পাই
কি হবে সে ধনে, যা'তে তোমাকে হারাই'

শ্রীনিবাস পণ্ডিতের বাক্যাবসানে অমরসিংহ বলিলেন,—'গুরুদেব, আমাদের এখন আর এখানে বিলম্ব-করা শ্রেয়ঃবোধ হইতেছে না। লোকপরম্পরায় শুনিতে পাইলাম, কাশীতে মহারাজ চেৎসিংহের সঙ্গে ইংরাজদিগের যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইংরাজ-সৈন্যগণ অত্যন্ত জঘন্য চরিত্রের লোক; তাহারা নাকি চেৎসিংহের জননী এবং স্ত্রীর উপর পর্যন্তও অত্যাচার করিয়াছে। রোহিলখণ্ডের স্ত্রীলোকদিগের উপর ইংরাজ-সৈন্য যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিল, কাশীতে তদ্রূপ নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া থাকিলে, আমাদের পরিবারদিগের যে কি অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা ভাবিলেও হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। অতএব আপনার নিকট হইতে এখন বিদায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীনিবাস পণ্ডিত এখন সর্বদাই অন্যের সুখ দুঃখের কথা শুনিতে আরম্ভ করিলে নিজের সুখ দুঃখের বিষয় বিস্মৃত হইয়া পড়েন। চেৎসিংহের জননীর উপর ইংরাজেরা অত্যাচার করিয়াছে শুনিয়াই, তিনি গৃহের এই প্রকোষ্ঠের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু অমরসিংহের কথা শুনিতে আরম্ভ করিলে পর, তিনি সে কথা বিস্মৃত হইয়া পড়িলেন। চেৎসিংহের জননী পূর্ণিমা, শ্রীনিবাসের কন্যা। আপন কন্যার প্রতি অত্যাচার হইয়াছে শুনিয়া, তিনি প্রথমতঃ চমকিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু অন্যান্য কথায় তাহা বিস্মৃত হইলেন। এখন অমরসিংহ সেই কথা আবার বলিবামাত্র তিনি বলিয়া উঠিলেন,—

'বাছা, আমি তোমাদিগের সঙ্গে কাশীতে যাইব। চেৎসিংহের জননী আমারই কন্যা। এ সংসারে মানুষ সর্বত্যাগী হইলেও বোধহয় সন্তানস্নেহ বিবর্জিত হইতে পারে না। আমার পূর্ণিমার বিপদের সংবাদ তাহার দিকেই আমার চিত্তাকর্ষণ করিতেছে।'

ইঁহারা চারিজন তৎক্ষণাৎ জৌনপুরের রাস্তা দিয়া কাশীতে রওয়ানা হইলেন। কিন্তু বাণেশ্বরের সঙ্গে ছত্রসিংহ রাস্তায় কি তৎপূর্বে একবারও বাক্যালাপ করেন নাই। বাণেশ্বরের সংসর্গ ছত্রসিংহের নিকট অত্যন্ত বিরক্তিজনক বোধ হইতে লাগিল।

ছত্রসিংহ ইতিপূর্বে প্রায় দুই বৎসর কাল অমরসিংহের সঙ্গে একত্র হইয়া বাণেশ্বরের অনুসন্ধান করিতেছিলেন। অনুসন্ধানের সময় তিনি কতবার অমরসিংকে বলিয়াছেন,—'তোমার পিতাকে দেখিতে পাইলে আমার চক্ষু সফল হইবে।' কিন্তু এখন বাণেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর তিনি একবারও তাঁহার সঙ্গে বাক্যালাপ করেন নাই।

অমরসিংহ ছত্রসিংহের বর্তমান আচরণের কিছুই মর্মভেদ করিতে সমর্থ হইলেন না। রাস্তায় একদিন গোপনে অমরসিংহ ছত্রসিংহকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

'দাদা, তুমি আমার পিতার সঙ্গে তো একবারও কথা বলিলে না? তোমার যে এই কয়েকদিন হইতে কি হইয়াছে, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।'

ছত্রসিংহ অমরসিংহের প্রশ্নোত্তরে প্রথমতঃ কিছুই বলিলেন না। কিন্তু অমরসিংহ বারম্বার অনুরোধ করিলে পর, তিনি বলিতে লাগিলেন,—

'তোমার পিতাকে দেখিবামাত্র ইঁহার প্রতি আমার বড় ঘৃণার ভাব উপস্থিত হইল। আমার মনে হইতে লাগিল যে ইঁহাকে আর কোথাও দেখিয়া থাকিব। অনেক চিন্তা করিতে করিতে আমার স্মরণ হইয়াছে। বর্ধমানের

যুদ্ধক্ষেত্রে ইঁহাকে দেখিয়াছিলাম। ইঁহার মুখাকৃতি আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে। ইঁহার ন্যায় নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক বোধহয় এ সংসারে আর কোথাও দেখি নাই। আমি আর সে সকল কথা তোমার নিকট বলিতে চাহি না।'

অমরসিংহ বলিলেন,—'আমার পিতার হৃদয় অত্যন্ত কোমল। আমার পিতার মুখাকৃতি সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তোমার ভ্রম হইয়াছে।'

ছত্রসিংহ বলিলেন,—'আমার কখনোও ভুল হয় নাই। তোমার পিতাকে জিজ্ঞাসা কর, বক্সারের যুদ্ধের পর কোনো মৃতপ্রায় লোক সংগ্রামক্ষেত্রে পড়িয়া ইঁহার নিকট একটু জল চাহিয়াছিল কি না? বক্সারের যুদ্ধে যখন আমি আহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়াছিলাম, তখন ইঁহাকে দেখিতে পাইয়া আমিও ইঁহার নিকট একটু জল চাহিয়াছিলাম। এ ব্রাহ্মণ এত নিষ্ঠুর যে, আমাকে একটা দুর্বাক্য বলিয়া গেল। ইঁহার চলিয়া যাইবার পাঁচ মিনিট পরে তুমি সংগ্রামক্ষেত্রে আসিয়া আমাকে ক্রোড়ে করিয়া তাঁবুতে লইয়া গেলে।'

অমরসিংহ এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য হইলেন; সত্য সত্যই তাঁহার পিতা এইরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছিলেন কি না, তাহা জানিবার নিমিত্ত পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

'বাবা, আপনি বক্সারের যুদ্ধের সময় কি সেখানে ছিলেন?'

বাণেশ্বর বলিলেন,—'হাঁ—আমি তখন বক্সারে ছিলাম।'

অমরসিংহ। 'কোনো মৃতপ্রায় ধরাশায়ী সিপাহী কি তখন আপনার নিকট একটু জল চাহিয়াছিল?'

বাণেশ্বর। হাঁ চাহিয়াছিল বটে। কিন্তু তখন এই পৃথিবী যাহাতে লোকশূন্য হয়, তাহাই আমার একমাত্র কামনা ছিল। আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম,—'তোর মৃত্যু হইলে ভালো—আমি তোকে জল দিব না।

অমরসিংহ। মৃতপ্রায় লোককে আপনি এইরূপ দুর্বাক্য বলিয়াছিলেন? তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া আপনার হৃদয়ে একটু দয়ার সঞ্চারও হইল না?

শ্রীনিবাস ইঁহাদিগের পরস্পরের কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—'বাণেশ্বর তখন প্রকৃতিভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। এ সংসারের অত্যাচারই মানুষকে সময় সময় এই প্রকার নিষ্ঠুর করে। এ বাণেশ্বরের দোষ নহে, দেশপ্রচলিত অত্যাচারের অবশ্যম্ভাবী ফল।'

ছত্রসিংহ বাণেশ্বরকে আপন দোষ স্বীকার করিতে দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। ছত্রসিংহের হৃদয় সংগ্রামিকভাবে পরিপূর্ণ। বীরোচিত হৃদয়ে

হিংসা-বিদ্বেষের ভাব অধিককাল স্থায়ী হয় না। তখন বাগেশ্বরের চরণে প্রণাম করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—'ঠাকুর! তুমি তখন পাগল হইয়াছিলে, তাহা আমি জানিতাম না।'

শ্রীনিবাস এই ঘটনা শ্রবণ করিয়া আবার বাগেশ্বরকে বলিলেন,—'আমি কতবার তোমাকে বলিয়াছি, কর্ত্তব্যের পথই মানুষকে একমাত্র সুখ শান্তির দিকে পরিচালন করে। মৃতপ্রায় ছত্রসিংহকে জলদান করিবার নিমিত্ত যদি তখন কেবল পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করিতে, তবে সেই দিনই তোমার পুত্রের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইত। ষোল বৎসর হইল, বক্সারের যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই ষোল বৎসর কাল তোমাকে পথভ্রান্ত পথিকের ন্যায় এই সংসারারণ্যে ভ্রমণ করিতে হইত না।'

বাগেশ্বরের প্রতি যে ছত্রসিংহের ঘৃণার ভাব ছিল, তাহা দূর হইল। ইঁহারা চারিজনে পরমানন্দে একত্র হইয়া চারি-পাঁচদিনের মধ্যে কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ষড়্ত্রিংশত্তম অধ্যায়

ডাকাইতি

বউ-বেগম এবং মতী-বেগমের ধনাগার লুণ্ঠন করিবার নিমিত্ত ওয়ারেন হেষ্টিংস যে সকল ষড়যন্ত্র করিয়াছেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ১৭৮১ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে চুনারে অবস্থান কালে হেষ্টিংস এই সকল ষড়যন্ত্র করিলেন। কাপুরুষ আসফউদ্দৌলাও তখন হেষ্টিংসের ভয়ে স্বীয় জননী এবং পিতামহীর ধনাগার লুণ্ঠন করিবার প্রস্তাবে এক প্রকার মৌন সম্মতি প্রদান করিলেন। কিন্তু লক্ষ্ণৌ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই তিনি এই ঘোর নিষ্ঠুরাচরণে আবার অসম্মত হইলেন। ইংরাজ রেসিডেন্ট মিডলটন সাহেব দিন দিন তাঁহাকে এই কুকার্য্যানুষ্ঠানে পরামর্শ প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর—তিনমাস গত হইল। ইংরাজ-রেসিডেন্ট শত চেষ্টা করিয়াও আসফউদ্দৌলাকে এই তিনমাসের মধ্যে এ কুকার্য্যানুষ্ঠানে পরিচালন করিতে সমর্থ হইলেন না।

এদিকে ওয়ারেন হেষ্টিংস দিন দিন বেনারস হইতে রেসিডেণ্ট মিডলটন সাহেবের নিকট পত্র লিখিতে লাগিলেন,—'তুমি অবিলম্বে নবাবের দ্বারা বেগমদিগের জায়গির বাজেয়াপ্ত এবং ধনাগার লুণ্ঠন করাইবে।'

১৭৮১ খ্রীঃ অব্দের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে মিডলটন সাহেব হেষ্টিংসকে লিখিলেন,—'নবাব এখনো পর্যন্তও জায়গির বাজেয়াপ্ত এবং ধনাগার লুণ্ঠন সম্বন্ধে স্পষ্টরূপে কোনো মতামত প্রকাশ করিতেছেন না। আপনার আদেশ অনুসারে অগত্যা অদ্য আমি নিজেই জায়গির খাস করিবার পরওয়ানা বাহির করিতেছিলাম। কিন্তু আমি পরওয়ানা বাহির করিতেছি, এই কথা নবাব তাঁহার মন্ত্রীর প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া, একদিনের নিমিত্ত পরওয়ানা জারি স্থগিত রাখিতে বলিয়াছেন। কল্য প্রাতে তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। অন্ততঃ একদিনের নিমিত্ত আমি পরওয়ানা জারি স্থগিত রাখিলাম। যদি নবাব সম্মতি প্রদান করেন, তাহা হইলে সকল কার্যই সুশৃঙ্খলরূপে নির্বাহ হইবে। কিন্তু কল্য তিনি সম্মতি প্রদান না করিলেও আমি নিজেই বেগমদিগের জায়গির বাজেয়াপ্ত করিবার পরওয়ানা জারি করিব। বেগমদ্বয়ের সম্বন্ধে অন্যান্য যে সকল সৎপরামর্শ করিয়াছেন, তৎসমুদয় আমি সার ইলা ইজা ইম্পির প্রমুখাৎ বিস্তারিতরূপে শুনিয়াছি জায়গির বাজেয়াপ্তের অব্যবহিত পরে সে সকল সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব *।

---

* Finding the Nawab wavering in his determination about the resumption of the Jagheers, I this day, in, presence of and with the minister's concurrence, ordered the necessary Purwannahs to be written to the several Aumils for that purpouse, and it was my firm resolution to have despatched them this evening, with people to see them punctually and implicitly carried into execution ; but before they were all transcribed, I received a message, from the Nawab, who had been informed by the minister of the resolution I had taken, entreating that I would withhold the Purwannahs until to-morrow morning when he would attend me. As the loss of a few hours in the despatch of the Purwannahs appeared of little moment, and as it is possible the Nawab, seeing that the business will at all events be done, may make it an act of his own, I have consented to indulge him in this request ; but be the result of our interview whatever it may, nothing shall prevent the orders being issned to-morrow, either by him or myself. with the concurrence of the minister. Your pleasure respecting the Begums I have learnt from Sir Elijah, and the measure here tofore proposed will soon follow the resumption of the Jagheers. From both, or inded from the

ইহার পর ৭ই ডিসেম্বর মিডলটন সাহেব আবার হেষ্টিংসের নিকট এই মর্মে পত্র লিখিলেন,—

'অদ্য প্রাতে নবাব আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বৃথা কথায় কাল হরণ করেন। প্রস্তাবিত বিষয়ে কোনো মতামত প্রদান করেন না। আমি অগত্যা নিজে জায়গির খাসের পরওয়ানা জারি করিব বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছি *।'

৯ই ডিসেম্বর তারিখে মিডলটন সাহেব আবার হেষ্টিংসের নিকট লিখিলেন,—'আমি পরওয়ানা জারি করিয়াছি, এই কথা শুনিয়া নবাব অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার মন্ত্রী আমার এই কার্যে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন বলিয়া, মন্ত্রীকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া ভৎ'সনা করিয়াছেন। কিন্তু এখন বুঝিতে পারিয়াছেন, যে আমাদের এ সকল কার্য তিনি নিবারণ করিতে পারিবেন না। অগত্যা বাধ্য হইয়া অবশেষে নিজের প্রভুত্ব সংরক্ষণার্থ নিজেই জায়গির খাসের পরওয়ানা জারি করিতেছেন। আমি যার-পর-নাই আনন্দের সহিত আপনাকে আরও জানাইতেছি যে নবাব এখন বেগমদিগের সর্বনাশ সাধন ও ধনাগার লুণ্ঠনার্থ আমার সঙ্গে ফায়েজাবাদ যাইতেও অগত্যা সম্মত হইয়াছেন †।'

নিস্তেজ হতভাগ্য আসফউদ্দৌলা যখন দেখিলেন যে, ইংরাজেরা কোনো

former alone, I have no doubt of the complete liquidation of the Company's balence.—Letter from Mr. N. Middleton to Warren Hastings Esq. Dated 6th December, 1781.

* This morning the Vizier come to me according to his agreement, but seemingly without any intention or desire to yield me satisfaction on the subject under discussion ; for after a greatdeal of conversation, constisting on his part of trifling evation and puerile excuses for withholding his assent to the measure, though at the same time professing the most implicit submisison to your wishes, I found myself without any other resource than one of employing that exclusive authority with which I consider your instrcuction to vest me.—Letter from Mr. N. Middleton to W. Hastings Esg, 7th Dec. 1781

† His Excellency appeared to be very much hurt and incensed at the measure, and loudly complains of the treachery of the minister. He at length yielded a nominal acquiescence and has this day issued his own Purwannah ; declaring at the same time both to me and his minister, that it is an act of compulsion.

I have the pleasure to inform you, the Nawab still adheres to his resolution of proceeding immediately to Fyzabad for the purpose already mentioned to you.—Letter from N. Middleton to W. Hastings Esq. Dated 6th December 1781.

ক্রমে তাহাদিগের অভিপ্রেত কুকার্য হইতে বিরত হইল না, তখন অগত্যা প্রজাদিগের দৃষ্টিতে আপন সম্ভ্রম রক্ষার্থ ইংরাজদিগের এই সকল কার্য নিজের কার্য বলিয়া প্রকাশ করিলেন। কিন্তু জননী এবং পিতামহীর ধনাগার লুণ্ঠন করিবার ইচ্ছা তাঁহার একেবারেই ছিল না। ইংরাজ রেসিডেন্ট মিডলটন সাহেব বলিলেন,—'নবাব স্বয়ং ফয়েজাবাদে যাইয়া তাঁহার জননী এবং পিতামহীর ধনাগার লুণ্ঠন না করিলে, ইংরাজ-সৈন্যগণ তাঁহার জননী ও পিতামহীর অন্দরে প্রবেশপূর্বক তাঁহাদের যথাসর্বস্ব লুট করিবে।'

রেসিডেন্টের এইরূপ কথা শুনিয়া আসফউদ্দৌলা অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন; মনে করিতে লাগিলেন যে, ইংরাজ-সৈন্য তাঁহার জননীর এবং পিতামহীর অন্দরে প্রবেশ করিলে ভদ্রসমাজে তাঁহার অত্যন্ত কলঙ্ক হইবে। প্রজাগণ তাঁহাকে ঘৃণা করিবে। সুতরাং অগত্যা তিনি নিজেই জননী এবং পিতামহীর ধনাগার লুণ্ঠন করিতে যাইবেন বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। তাঁহার এই প্রকার সম্মত হইবার মুখ্যাভিপ্রায় এই যে, তাঁহার প্রজাগণ জানিতে না পারে যে, ইংরাজেরা তাঁহার জননীর উপর অত্যাচার করিতে সমর্থ।

এদিকে ওয়ারেন হেস্টিংস এই সকল কুকার্য সংসাধনে বিলম্ব দেখিয়া ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে বেনারস হইতে মিডলটন সাহেবকে লিখিলেন,—

'আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছি। এখান হইতে কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করিব, কি লক্ষ্ণৌ চলিয়া যাইব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আমি আশা করিয়াছিলাম যে এতদিনে তুমি সকল কাম সুসম্পূর্ণ করিয়াছ, চুনারে অবস্থানকালে আমি যে সকল বন্দোবস্ত করিয়াছি, তৎসমুদয়ই তুমি কার্যে পরিণত করিয়াছ। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে বিগত তিন মাসের মধ্যে তুমি কিছুই কর নাই। তোমাকে আমি লিখিতেছি যে, ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া আমার নিকট বলিবে, যে সকল কার্যের ভার তোমার প্রতি অর্পিত হইয়াছে, তাহা তুমি সম্পন্ন করিতে পারিবে কি-না? যদি এই সকল কার্য সংসাধনে তুমি আপনাকে নিতান্ত অসমর্থ বলিয়া মনে কর, তবে অবিলম্বে আমাকে তাহা জানাইবে, আমি সত্বর লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিব। আমি বিলক্ষণ জানি যে তোমার ন্যায় লোকের অসাধ্য কিছুই নাই। কিন্তু তথাচ তোমাকে সাবধান করিতেছি যে, কার্যে যেন কোনো বিলম্ব না হয় *।'

---

* I have waited this long in the hopes of hearing that some progress had been made in the execution of the plan which I

মিডলটন সাহেবকে যে হেষ্টিংস্ লিখিয়াছেন,—'তোমার অসাধ্য কোনো কার্য নাই,' এ কথা মিথ্যা নহে। দুই-একজন লোকভিন্ন সাধারণতঃ ইংরাজ-রেসিডেন্টদিগের অসাধ্য কোনো কার্যই নাই। মিথ্যা প্রবঞ্চনা এবং উৎকোচ গ্রহণে ইহারা বিলক্ষণ পটু।

এই প্রকারে ১৭৮২ সালের জানুয়ারির প্রারম্ভ পর্যন্ত মিডলটন সাহেব এবং হেষ্টিংসের মধ্যে অনেক পত্রাপত্রি চলিতে লাগিল। সে সমুদয় পত্রের সারাংশ উদ্ধৃত করিতে হইলে পুস্তকের আয়তন বৃদ্ধি হইয়া পড়িবে। এই স্থানে সংক্ষেপে কেবল এই ডাকাইতির মূল বিবরণ বিবৃত করিতেছি।

ছয়-বৎসর-বয়স্ক বালককে ধৃত করিয়া গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় লইয়া যাইবার সময়, বালক গুরুমহাশয়ের বেত্রাঘাতের বিষয় স্মরণ করিয়া যদ্রূপ কাঁপিতে থাকে, আজ হতভাগা আসফউদ্দৌলা সেই প্রকার কাঁপিতে কাঁপিতে মিডলটন সাহেবের সঙ্গে স্বীয় জননী এবং পিতামহীর ধনাগার লুণ্ঠনার্থ ফায়েজাবাদে যাত্রা করিলেন।

বেগমদ্বয় অজ্ঞাত চিন্তায় দিন যামিনী যাপন করিতেছেন। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির গবর্নর জেনেরল যে ষড়যন্ত্র পূর্বক তাঁহাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ প্রস্তুত করিয়া, তাঁহাদের যথাসর্বস্ব অপহরণ করিবেন, ইহা তাঁহারা স্বপ্নেও কখনো মনে করেন নাই। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁহাদের দুইজনের নিকটই পৃথক্ পৃথক্ একরারনামা লিখিয়া দিয়াছেন যে, অন্য কেহ তাঁহাদের ধন-সম্পত্তি অপহরণ করিতে উদ্যত হইলে, কোম্পানি স্বীয় সৈন্য প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের ধন-সম্পত্তি রক্ষা করিবেন। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কেবল অনুগ্রহ করিয়া এই প্রকার একরারনামা লিখিয়া দেন নাই। আসফউদ্দৌলা ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে টাকা দিতে অসমর্থ হইলে, বেগমেরা আপন আপন তহবিল হইতে, সময়ে সময়ে ইংরাজদিগকে টাকা

---

concluded with the Nawab in September last. I do not find that any step towards it has been yet taken though three months are elapsed···I now demand and require you most solemnly to answer me. Are you confident in your own ability to accomplish all these purposes and the other points of my instructions? If you reply that you are, I will depart with a quiet and assured mind to the presidency.···I know that your capacity is equal to any service.—Letter from W. Hastings to Mr. Middleton, dated 26th December 1781.

দিয়াছেন। বেগমদ্বয়ের সাহায্য-প্রাপ্তি-নিবন্ধন ইংরাজেরা এইরূপ উপকৃত হইয়াই তদ্রূপ একরারনামা লিখিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সন্ধিভঙ্গ কিম্বা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে ফিরিঙ্গীর একটুও লজ্জাবোধ হয় না। অর্থের লোভে তৎকালের ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীগণ কোনো প্রকার কুকার্যেই বিরত হইতেন না। বেগমদিগের বিরুদ্ধে ওয়ারেন হেস্টিংস মিথ্যা অভিযোগ প্রস্তুত করিয়া, পরে তাহার প্রমাণ-সংগ্রহার্থ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান জজকে নিযুক্ত করিলেন। মিথ্যা-প্রমাণ সংগ্রহই প্রধান বিচারপতির একমাত্র কর্তব্য হইল। এখন প্রমাণ প্রস্তুত করা হইয়াছে। সুতরাং নিঃশঙ্কহৃদয়ে মিডলটন্ সাহেব আসফউদ্দৌলাকে সঙ্গে করিয়া ফায়েজাবাদে চলিয়াছেন।

বেগমদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইয়াছে যে, তাঁহারা সৈন্য প্রদান করিয়া, চেৎসিংহের সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, চেৎসিংহ প্রাণান্তেও ইংরাজদিগের সঙ্গে কখনো যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই। ইংরাজেরা তাঁহার এক-একটি দুর্গ আক্রমণ করিবামাত্র, তিনি তথা হইতে অপর দুর্গে, তৎপর তৃতীয় দুর্গে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশেষে শেষ দুর্গ আক্রান্ত হইবামাত্র তিনি দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন।

এদিকে বেগমেরা চেৎসিংহকে চিনিতেনও না। বেনারসে যে চেৎসিংহের সঙ্গে ইংরাজদের বিবাদ হইয়াছে, তাহার বিন্দুবিসর্গও এখনো পর্যন্ত তাঁহারা জানেন না। ইহাঁদিগের চেৎসিংহের নাম শুনিবার কথনোও সুযোগ হইত না। কিন্তু রাজা বলবন্তসিংহের মৃত্যুর পর নবাব সুজাউদ্দৌলা বলবন্তসিংহের রাজ্য দখল করিবার নিমিত্ত একবার বেনারসে গিয়াছিলেন। চেৎসিংহ সুজার আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া একাকী জৌনপুরে আসিয়া নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি আপন উষ্ণীষ নবাবের ক্রোড়ে রাখিয়া বলিলেন,—'আপনি আমার পিতা, আমাকে রক্ষা করুন।'

সুজা চেৎসিংহকে শরণাগত দেখিয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্বক আপন পুত্রস্বরূপ গ্রহণ করিলেন। চেৎসিংহ পরম সুন্দর পুরুষ। তাঁহার বয়ঃক্রম তখন বারো-বৎসর মাত্র। এই সময় নবাবপুত্র বালক আসফউদ্দৌলাও সুজার সঙ্গে ছিলেন। সুজার আদেশানুসারে চৌদ্দবৎসর বয়স্ক আসফউদ্দৌলা চেৎসিংহের সঙ্গে আপন পাগড়ি বদল করিলেন *। বেগমেরা বাল্যাবস্থায় আসফউদ্দৌলার মস্তকে চেৎসিংহের সেই বিবিধ মণি-মুক্তা-খচিত পাগড়ি দেখিয়াই

* বলবন্তনামায় এই ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে।

পূর্বে চেৎসিংহের নাম শুনিয়াছিলেন। এই ঘটনা না হইলে চেৎসিংহের নাম পর্যন্তও বেগমদিগের শুনিবার সুযোগ হইত না।

মিডলটন সাহেব নবাব আসফউদ্দৌলাকে সঙ্গে করিয়া ফায়েজাবাদে আসিয়া পৌঁছিলেন। এই ঘটনার কয়েক মাস পূর্বে আসফউদ্দৌলা একবার জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছেন। আবার অত্যল্পকাল মধ্যেই তাঁহাকে ফায়েজাবাদে আসিতে দেখিয়া, সকলে আশ্চর্য হইলেন। ইঁহারা যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন তাহার বিন্দুবিসর্গও এখনো পর্যন্ত বউবেগম কি মতীবেগম জানিতে পারেন নাই। বউবেগম সাদরে এবং সস্নেহে পুত্রকে গ্রহণ করিবেন বলিয়া বিবিধ আয়োজন করিতেছেন।

নবাব আসফউদ্দৌলা এবং ইংরাজ রেসিডেণ্ট ক্রমে বেগমদিগের প্রাসাদের নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন। ইঁহারা সিংহদ্বারের নিকট পৌঁছিয়াই দ্বাররক্ষক সিপাহিদিগকে তাড়াইয়া দিয়া সঙ্গের সৈন্যদিগকে বেগমদিগের প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ পূর্বক তাঁহাদিগের ধনাগার লুণ্ঠন করিবার আদেশ করিলেন। বেগমেরা তচ্ছ্রবণে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। প্রাসাদের ভিন্ন ভিন্ন দ্বারে প্রায় একশত সিপাহী ছিল। তাহারা ইংরাজ রেসিডেণ্টের সৈন্যদিগকে বেগমের প্রাসাদ আক্রমণ করিতে দেখিয়া, অস্ত্র-শস্ত্র-সহ সংগ্রামার্থ প্রস্তুত হইল। ফায়েজাবাদে বউবেগমের যে অল্পসংখ্যক সিপাহী ছিল, তাহারা বউবেগমকে আপন জননী বলিয়া মনে করিত। সুতরাং তাহারা প্রাণপণে দ্বাররক্ষা করিতে লাগিল। এদিকে ইংরাজ রেসিডেণ্টের সঙ্গে যে সকল দেশীয়-সৈন্য আসিয়াছিল, তাহারা পূর্বে অযোধ্যার নবাবের সিপাহী ছিল। বিদেশীয় রাজনৈতিক কৌশলেই তাহারা এখন ইংরাজদের সৈন্যভুক্ত হইয়াছে। তাহারা বেগমের অন্দরে প্রবেশ করিতে হইবে এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক বলিল,—'আমরা সাতপুরুষ যাঁহার নুন খাইয়াছি, তাঁহার অন্দর লুট করিতে পারিব না *।'

মিডলটন সাহেব দেখিলেন যে, ঘোর বিপদ উপস্থিত। সিপাহিগণ বেগমদিগের অন্দর এবং ধনাগার দেবমন্দির বলিয়া মনে করে। যে কয়েকজন ইংরাজ সৈনিক-পুরুষ আছে, তাহারা অন্যান্য সিপাহীর সাহায্য ভিন্ন অন্দরে প্রবেশ করিতে

* Mr. Middleton (in his evidence) states that they found great difficulties in getting at their treasures; that they stormed their fort successively; but found great reluctance in the Sepoys to make their way into the inner enclosure of the women's appartment.—E. Burke p. 191.

সমর্থ হইবে না। বেগমদিগের সিপাহিগণ অনায়াসে তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিবে ; তিনি অনন্যোপায় হইয়া আসফউদ্দৌলার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ধনাগার লুণ্ঠনার্থ এখন কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে ?'

আসফউদ্দৌলা অত্যন্ত বিরক্তিভাব প্রকাশপূর্বক বলিলেন,—'আমি কিছু বলিতে পারি না ; তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয় কর।'

কিন্তু ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিদেশীয় রাজনৈতিক কৌশল অতি চমৎকার। ইহারা দেশীয় রাজগণের মন্ত্রী এবং প্রধান প্রধান কর্মচারীকে সর্বদাই হাতের মধ্যে রাখেন। দেশীয় রাজগণের মন্ত্রী এবং অন্যান্য প্রধান কর্মচারী নির্বাচনের ক্ষমতা ইংরাজ গবর্নমেণ্ট সঞ্চালন করেন। এই সময় যদিও ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এই বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল না, তথাচ উৎকোচাদি প্রদান পূর্বক দেশীয় রাজগণের মন্ত্রীকে হাতের মধ্যে রাখিতেন। আসফউদ্দৌলার মন্ত্রী হায়দরবেগ খাঁ এখন ইংরাজদিগের প্রসাদাকাঙ্ক্ষী। মিডলটন সাহেব কিরূপে বেগমদিগের ধনাগার লুণ্ঠন করিবেন, তৎসম্বন্ধে হায়দরবেগ খাঁর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক হায়দরবেগ খাঁ মন্ত্রিপদ প্রাপ্তির দীর্ঘকাল পূর্বে সুজাউদ্দৌলার আমলে একজন ক্ষুদ্র আমিন ছিল। তহবিল তছরূপের অপরাধে সুজাউদ্দৌলা ইহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু দয়াবতী বউবেগমের অনুরোধে সুজা ইহাকে কারামুক্ত করিয়া পুনর্বার কার্যে বহাল করিলেন। আজ হায়দরবেগ খাঁ বউবেগমকে সেই উপকারের প্রতিশোধ প্রদান করিল। মিডলটন সাহেবের নিকট বলিল যে, বউবেগমের খোজা বহর আলি এবং জহর আলিকে কারারুদ্ধ করিয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেই, বেগম তাহাদের প্রাণরক্ষার্থ সমুদয় ধনাগার ছাড়িয়া দিবেন *।

* হায়দরবেগ খাঁ যে এইরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত মিডলটন সাহেবের পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। Dear Sir Elijah—I have the satisfaction to infrom you that we have at length so far obtained the great object of our expedition to this place as to commence on the receipt of money, of which, in the course of this day, we have got about sixty lacs. I konw not yet what amount we shall actually realize.....

It has been at once the important and the most difficult point of duty, which have ever occured in my office ; and the anxiety, the hopes and fears which have alternately agitated in my mind, can not be described or conceived but by those who have been witness to what has passed in the course of this long contest. The Nawab's ministers have supported me nobly and deserve much commendation. Without the

বহুবেগম এবং মতীবেগমের ধনাগার খোজা জহর আলি, বহর আলি এবং জবাব আলি খাঁর জিম্মা ছিল। এই সকল খোজা বেগমদিগের মন্ত্রীর ন্যায় সৎপরামর্শদাতা, বন্ধুর ন্যায় সহচর; বিশ্বস্ত ভৃত্যের ন্যায় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী; পিতার ন্যায় রক্ষক; জননীর ন্যায় প্রতিপালক ছিল। বিশেষতঃ বহুবেগম বাল্যাবস্থায় বৃদ্ধ জহর আলি এবং বহর আলির অঙ্কে প্রতিপালিত হইয়াছেন। এখনো তিনি ইঁহাদিগকে জননীর ন্যায় মনে করেন। অকৃতজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক হায়দরবেগ খাঁর পরামর্শানুসারে অর্থলোভী নরপিশাচ মিডলটন সাহেব বৃদ্ধ জহর আলি এবং বহর আলিকে কারারুদ্ধ করিয়া লৌহ-শৃঙ্খল-দ্বারা তাহাদের হস্তপদ বন্ধনপূর্ব্বক প্রহার করিতে লাগিল। বেগমেরা ইঁহাদিগের যন্ত্রণা এবং কষ্টের কথা শ্রবণ করিয়া, শোকদুঃখে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন।

মিডলটন সাহেব বেগমদিগের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহাদের উভয়েই ধনাগারের সমুদয় টাকা প্রদান করিলে খোজা জহর আলি এবং বহর আলিকে কারামুক্ত করিবেন। বেগমেরা তখন আপন আপন ধনাগার শূন্য করিয়া প্রায় দুই কোটি টাকা প্রদান করিলেন; কিন্তু তাঁহাদের ধনাগারের টাকা পথেই লুট হইতে লাগিল। এই দুই কোটি টাকা ষাট লক্ষ টাকা মাত্র হইয়া পড়িল। কোম্পানির প্রাপ্য টাকার মধ্যে কেবল ষাট লক্ষ টাকা উসুল পড়িল। বাকী সমুদয় টাকাই পথে লুট হইল। ইহাতে আসফউদ্দৌলার সমুদয় দেনা পরিশোধ হইল না।

মিডলটন সাহেব আবার বেগমদিগের নিকট লিখিলেন,—'আরো টাকা না দিলে খোজাদিগকে কারামুক্ত করা হইবে না। কিন্তু বেগমদিগের আর নগদ টাকা প্রদান করিবার সাধ্য নাই। সুতরাং নগদ টাকার পরিবর্ত্তে গৃহের সমুদয় মূল্যবান মণি-মুক্তা প্রদান করিলেন। লক্ষটাকা মূল্যের হীরক, দশ হাজার টাকা মূল্যের মুক্তা দশ-পাঁচ টাকা মূল্যে নিলাম হইতে লাগিল। ফয়েজাবাদস্থ ইংরাজ এবং ইংরাজ রমণীগণ এই সকল মণি-মুক্তা ক্রয় করিতে

shrewed discernment and knowledge of the finenss and tricks of the country which Hyder Beg Khan possesses, I believe we should have succeeded but indifferently; for I soon found that no real advantage was to be obtaind by proceedining at once to violent extremities with the Begum, and she was only to be attacked through the medium of her confidential servants....

We at last effected it; and by using some few severities with them, we at length came to the secret hoards of this old lady.

লাগিলেন। এই সকল মহামূল্য মণি মুক্তা দ্বারাও আসফউদ্দৌলার দেনা পরিশোধ হইল না। বৃদ্ধ খোজাদ্বয়কে রেসিডেণ্ট কারামুক্ত করিলেন না। আজীবন এই খোজাদ্বয় নবাবদিগের ন্যায় পরম সুখে নবাবগৃহে জীবন যাপন করিয়াছেন। আজ হস্ত-পদে লৌহশৃঙ্খল পরিধান পূর্বক অতি মলিনগৃহে কারারুদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। কয়েদীর ভোগ্যবস্তু দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়

আজ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল

পাঠক, জহর আলি এবং বহর আলিকে কারাগারে রাখিয়া একবার খোর্দমহলে প্রবেশ কর। জহর আলি খাঁ এবং বহর আলি খাঁর কারামুক্ত হইবার এখনো ছয়মাস বিলম্ব আছে। যখন ইঁহারা একেবারে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িবেন, যখন দস্যু-দল-পতি ওয়ারেন হেস্টিংস বুঝিতে পারিবেন যে, বেগমদিগের আর একটি পয়সাও প্রদান করিবার ক্ষমতা নাই, তখন ইঁহারা কারামুক্ত হইতে পারেন। কারাগারে বসিয়া দিন দিন ইঁহাদের কষ্ট যন্ত্রণা দর্শন করিতে কি কাহারো ইচ্ছা হয়? কারাগারে ইঁহাদের দুরবস্থা দর্শন করিলে পাষাণ-হৃদয়ও বিগলিত হয়। পাঠক ও পাঠিকাগণ একবার খোর্দমহলে প্রবেশ কর। ভিন্ন ভিন্ন খোর্দমহলবাসিনী নবাব সুজাউদ্দৌলার এবং তাঁহার পিতা-পিতামহের প্রত্যেক উপপত্নী এবং তাঁহাদের গর্ভজাত সন্তান-সন্ততি সুজাউদ্দৌলার আমলে নবাব সরকার হইতে ভরণ-পোষণের ব্যয় নির্বাহার্থ মাস মাস নির্দিষ্ট হারে মাসহরা পাইতেন।

আমরা ইঁহাদিগকে উপপত্নী বলিয়া অভিহিত করিতেছি। কিন্তু মুসলমানদিগের শাস্ত্রানুসারে ইঁহারা সকলেই ধর্মপত্নী। ইঁহাদিগের গর্ভজাত সন্তানগণও কখনো কখনো সিংহাসন লাভ করিতেন।

নবাব আসফউদ্দৌলার সিংহাসনারোহণের পর ইঁহাদিগের প্রাপ্য টাকা বাকী পড়িতে লাগিল। সুজাউদ্দৌলার একজন পত্নীর গর্ভজাত পুত্র মুজাফুদ্দৌলা অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন। তাঁহার দুই বৎসরের প্রাপ্য টাকা বাকী পড়িলে পর, তিনি অযোধ্যা হইতে পলায়ন পূর্বক সিন্ধিয়ার রাজ্যে চলিয়া গেলেন। সেখানে সিন্ধিয়ার সৈন্যাধ্যক্ষের পদের প্রার্থী হইলেন।

খোর্দমহল-বাসিনী নবাবপত্নীদিগের ভরণ পোষণের ব্যয় নির্বাহার্থ আসফউদ্দৌলা প্রায় চারি-পাঁচ বৎসর হইতে একটি পয়সাও দিতে পারেন না। কিন্তু সহৃদয়া বউবেগম এবং মতীবেগম আপন আপন জায়গিরের উপস্বত্ব দ্বারা আজ চারি বৎসর কাল খোর্দমহল-বাসিনী প্রায় দুই হাজার নিরাশ্রয়া রমণীর ভরণ-পোষণ করিতেছেন। ইঁহাদিগের অন্নকষ্ট নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যেই বউবেগম টাকা সঞ্চয়ার্থ এত যত্ন করিতেন। খোর্দমহল-বাসিনী রমণীদিগের সন্তান-সন্ততির বিবাহের ব্যয়ও বউবেগম এবং মতীবেগম বহন করিতেন।

কিন্তু ১৭৮২ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে বেগমদ্বয়ের তহবিলের সমুদয় অর্থ-সম্পত্তি ইংরাজেরা লুণ্ঠন করিয়াছে। বেগমদিগের সমুদয় জায়গির বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। খোর্দমহলের মাসিক নিঃমিত ব্যয় প্রায় বিশ হাজার টাকা। খোর্দমহল-বাসিনী প্রত্যেক নবাবপত্নীর তিন-চারিজন বাঁদী এবং তিন-চারিজন গোলাম রহিয়াছে। এই সকল বাঁদীদিগের সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণের ব্যয়ও বউবেগম এবং মতীবেগমকে দিতে হইত।

জানুয়ারি মাস হইতেই বউবেগম এবং মতীবেগম খোর্দমহলের ব্যয় বহন করিতে একেবারে অসমর্থা হইলেন। তাঁহাদের হাতে এখন আর একটি পয়সাও নাই। খোর্দমহল-বাসিনী রমণীগণ অতিকষ্টে আপন আপন গাত্রাভরণ বিক্রয় করিয়া একমাসের খাদ্যের সংস্থান করিলেন। ফেব্রুয়ারি মাসের কয়েকদিন ঋণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাস গত হইতে-না-হইতেই ইঁহাদের ঘোর অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল। পরিধেয়বস্ত্রাদি বিক্রয় করিয়া ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক দিন একসন্ধ্যা আহার করিয়া দিন যাপন করিতে লাগিলেন। খোর্দমহলে নবাব পত্নীগণ এবং দাস-দাসী ভিন্ন অন্যূন তিন-চারিশত বালক-বালিকাও অনাহারে এইরূপ কষ্টভোগ করিতে লাগিল।

মার্চ মাসের ৩রা, ৪ঠা, ৫ই তারিখ পর্যন্ত তিন-চারিশত বালক-বালিকাসহ সমুদয় খোর্দমহল-বাসিনী রমণীগণ অনাহারে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তিনদিনের অনশন এবং অন্নকষ্ট ইঁহাদিগের অন্তরস্থিত লজ্জা ভয় একেবারে বিদূরিত করিল। অনাহার এবং দারিদ্র্য ইঁহাদিগের মানব প্রকৃতি হরণ পূর্বক ইঁহাদিগকে রাক্ষস প্রকৃতি প্রদান করিল। ৫ই মার্চ রাত্রে ইঁহারা খোর্দমহলের সিংহদ্বার ভগ্ন করিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। খোর্দ-

মহল-বাসিনী রমণীগণ বারবন্দক সিপাহিদিগের মস্তকে ইষ্টক নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন *। কোনো কোনো রমণী আত্মহত্যার চেষ্টা করিলেন।

ইংরাজদিগের ফায়েজাবাদ কেন্টনমেন্টের অধ্যক্ষ কাপ্তেন লেনার্ড জ্যাক সাহেব এই সকল ঘটনার উল্লেখ করিয়া লক্ষ্ণৌর প্রতিনিধি রেসিডেন্ট জনসন্ সাহেবের নিকট এক পত্র লিখিলেন। কিন্তু ইহাদিগের আহারের কোনো সন্ধান করিলেন না।

বউবেগমের হাতে একটি পয়সাও নাই। তিনি বাজারের দোকানদারদিগকে ইহাদিগকে আহার্য দ্রব্য দিতে হুকুম করিয়া পাঠাইলেন। তাহার মূল্যের বাবত নিজে প্রতিভূ হইলেন।

এই বন্দোবস্ত দ্বারা দুই-তিনমাসের মধ্যে আর ইহাদের একেবারে অনশনে দিন যাপন করিতে হইল না। মার্চ-এপ্রিল-মে,—এই তিনমাস অতিকষ্টে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

যে মাসে এদিকে বউবেগমের প্রিয় খোজা বহর আলি এবং জহর আলি কারাগারে একেবারে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। ওয়ারেন হেস্টিংস কলিকাতা হইতে লিখিলেন,—'বেগমদ্বয় তাঁহাদের সমুদয় টাকা এখনো বাহির করেন নাই। খোজাদিগকে আরও কষ্ট প্রদান করিবে। কিন্তু খোজাদ্বয় যে মাসে একেবারে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলে ফায়েজাবাদ কেন্টনমেন্টের অধ্যক্ষ লেনার্ড জ্যাক রেসিডেন্ট মিডলটন সাহেবের নিকট লিখিলেন,' †—'জহর আলি এবং বহর আলি মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। এখন তাহাদের হস্ত-পদের লৌহশৃঙ্খল মোচন করিলেও তাহারা পলায়ন করিতে পারিবে না। অতএব এই বিষয়ে আপনার

---

*The women belonging to the Khourd Mahal are at last drove to desperation....They at night get on the top of the zenana, make a great disturbance....Last night not only abused the sentinels, but threw dirt at them; they threatened to throw themselves from the walls of the zenana, and also to break out of it.—Letter from Captain Leonard Jaques to R. Johnson Esq, offg. Resident, Lucknow, Dated 6th March 1782.

† The prisoners, Behar and Jowar Ali Khan, who seem to be very sickly have requested their irons might be taken off for a few deys, that they might take medicine, and walk about the garden of the place where they are confined, to assist the medicine in its operation. Now as I am sure they would be equally as secure without their irons as with them &c.—Letter from Leonard Jaques to Mr. Middleton Esq., Resident at Lucknow, Dated, Fyzabad, 18th May, 1782.

মতামত সত্বর আমার নিকট লিখিবেন।'

এই পত্রের প্রত্যুত্তরে মিডলটন সাহেব লিখিলেন যে ইহাদিগের লৌহশৃঙ্খল মোচন করা হইবে না। ইহারা এখন পর্যন্ত সমুদয় টাকা প্রদান করে নাই *'।

ইহার কয়েক দিন পরে মেজর গিল্পিন সাহেব হেষ্টিংস এবং মিডলটন সাহেবের আদেশানুসারে জহর আলি এবং বহর আলিকে অযোধ্যা হইতে ইংরাজদিগের রাজ্যে দ্বীপান্তর করিবেন বলিয়া বেগমদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বেগমেরা এই সংবাদ শ্রবণে একেবারে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। কি উপায়ে যে এই খোজাদিগকে উদ্ধার করিবেন, তাহা আর চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে বেগমদ্বয়ের গৃহে যে-কিছু জিনিস-পত্র ছিল—জলপান করিবার গ্লাসটি ঘটিটি পর্যন্ত—সমুদয় বিক্রয় করিয়া যে কিছু টাকা সংগ্রহ করিলেন, তৎসমুদয় ইংরাজদিগকে প্রদান করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহারা খোজাদিগকে কারামুক্ত করিলেন না। ইংরাজ-কর্মচারিদিগের নিকট বেগম বিনীতভাবে ইহাদিগের কারামুক্ত করিবার অনুরোধ করিলে, তাঁহারা বলিতেন,—'এ সকল, নবাব আসফউদ্দৌলার হুকুমানুসারে হইতেছে। আমাদের ইহাতে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা নাই।'

বেগম গৃহের জিনিসপত্র বিক্রয়ের টাকা দিয়াও খোজাদিগকে কারামুক্ত করিতে পারিলেন না। ইহার পর, নিজের এবং তাঁহার বাঁদীদিগের যে সকল মূল্যবান বস্ত্র ছিল, তাহা বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। একজন বাঁদীর একখানি ছিন্নবস্ত্র নিজে পরিধান করিয়া নিজের পরিধেয় বস্ত্রখানি পর্যন্ত বিক্রয় করিলেন। কিন্তু ইহাতেও পাষাণসদৃশ ইংরাজ হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল না। বস্ত্র বিক্রয়ের সমুদয় টাকা গ্রহণ করিয়া পরে জুন মাসে জহর আলি এবং বহর আলিকে ইংরাজেরা লক্ষ্ণৌ জেলে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু এদিকে প্রচার হইল যে, নবাব আসফউদ্দৌলার হুকুমানুসারে ইহারা লক্ষ্ণৌ প্রেরিত হইল।

বেগমের নিকট যখন ইংরাজেরা বলিয়া পাঠাইলেন যে, নবাব আসফ-উদ্দৌলার হুকুমানুসারে এই খোজাদ্বয় লক্ষ্ণৌ প্রেরিত হইল, তখন পুত্রের প্রতি তাঁহার ক্রোধানল শতগুণে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি অত্যধিক কোপাবিষ্ট হইয়া আসফউদ্দৌলাকে লিখিয়া পাঠাইলেন,—

* I am sorry it is not in my power to comply with your proposal of easing the prisoners for a few days of their fetters &c.—Letter from N. Middleton Esq., Resident at Lucknow to Captain L. Jaques at Fyzabad, Dated Lucknow, 22nd May 1782.

'রে নরাধম। মুসলমানকুলের কুলাঙ্গার ; যে হতভাগিনী দশমাস তোকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিল, আজ একবার তাহার দুর্দশা এখানে আসিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া যা। তোর ন্যায় কুপুত্র গর্ভধারণ করা অপেক্ষা আজীবন বন্ধ্যা থাকাই ভালো ছিল। তোর ন্যায় কুপুত্রকে গর্ভে ধারণ করিয়া যে ঘোর পাপানুষ্ঠান করিয়াছি, আজ সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। তোকে রাজ-পদে অভিষিক্ত করাইয়া, রাজপদের উপযুক্ত সপত্নী-পুত্রের প্রতি যে অন্যায়াচরণ করিয়াছি, আজ সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। আমার যে বক্ষ সতত স্বর্ণ-মুক্তা-খচিত বস্ত্রাবৃত থাকিত ; যে বক্ষ তোরই নিরাশ্রয় বাল্যকালের একমাত্র শয্যা ছিল, এ সংসারের অন্য কেহ যে বক্ষ কখনো দেখিতে পায় নাই ; বস্ত্রাভাবে আজ সেই বক্ষ অনাবৃত হইয়া রহিয়াছে; আজ আমি অনাবৃত বক্ষে ভিখারিণীর বেশে কালযাপন করিতেছি। এ বক্ষ মধ্যে শোকানল প্রজ্বলিত হইয়া আমার সমুদয় শরীর দগ্ধ করিতেছে। তুই আজ এ বক্ষে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিস। ধিক্ তোর রাজপদে! ধিক্ তোর জীবনে!'

পারস্য ভাষায় বেগমের স্বহস্ত লিখিত এই পত্রখানি নবাব আসফউদ্দৌলার নিকট প্রেরিত হইল। কিন্তু এ পত্র তো পত্র নহে। এ মাতৃ-হৃদয়ের আগুন। বেগম কোপাবিষ্ট হইয়া বুঝিলেন না যে, এ অগ্নি সংস্পর্শে নিশ্চয়ই আসফ-উদ্দৌলাকে জ্বলিয়া মরিতে হইবে। হতভাগ্য আসফউদ্দৌলার যদি কোনো অপরাধ থাকে, তবে সে কেবল কাপুরুষতা। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অর্থ গৃধ্নুতাই অযোধ্যা বিনাসের মূল কারণ। হাফেজ-নন্দিনীর শোণিতানলেই সমুদয় অযোধ্যা দগ্ধ হইতেছে।

এই সকল ঘটনার পর বেগম চিত্তসংযম পূর্বক ভাবিতে লাগিলেন,— 'এ সকলই আমার নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত। হিন্দু পণ্ডিত যাহা বলিয়াছে সে সকলই সত্য। বিশ্বাসই নারীর বল, প্রেম নারীর অস্ত্র, পবিত্রতা নারীর বর্ম। ধনসম্পত্তি রক্ষার চিন্তা এক সময়ে আমাকে ঘোর মোহান্ধকারে নিমগ্ন করিয়াছিল। আমার হৃদয় বিশ্বাস এবং প্রেমশূন্য করিয়াছিল ; সে

অসার ধনসম্পত্তি বিনষ্ট হইল। কিন্তু লাভের মধ্যে কেবল বিশ্বাস এবং প্রেমের পথ পরিত্যাগ করিয়া, আমাকে এই ঘোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল। অবলার বল একমাত্র ঈশ্বর। ধন-সম্পত্তি পদ-প্রভুত্বের চিন্তায় ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইলে নারীদিগকে এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। নারীগণ যেন আমার দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়া, অর্থাকাঙ্খা এবং পদ-প্রভুত্বের লিপ্সা পরিত্যাগ করেন। বিশ্বাস, প্রেম এবং পবিত্রতার পথ অবলম্বন করেন।'

উনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়

বাঁদীর বেশ

কয়েক মাস পর্যন্ত বউবেগম নিজে ঋণ করিয়া খোর্দমহল-বাসিনী রমণী এবং বালক-বালিকাদিগের দৈনিক অন্নের সংস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, হয় তো কয়েক মাস পরে ইংরাজেরা তাঁহার জায়গির ছাড়িয়া দিতে পারেন। এই সম্বন্ধে অনেক পত্রাপত্রি চলিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার সে আশা নিষ্ফল হইল। দুই বৎসরের পূর্বে তাঁহার জায়গির মুক্ত হইল না। ইংরাজগণ তাঁহার জায়গিরের উপসত্ব আসফউদ্দৌলার দেয় টাকার পরিবর্তে আদায় করিয়া লইতে লাগিলেন।

খোর্দমহলের মাসিক ব্যয় প্রায় বিশহাজার টাকা। বউবেগম এবং মতীবেগম আর খোর্দমহল-বাসিনী হতভাগিনীদিগকে এবং এই সকল হতভাগিনীর সন্তান-সন্ততিদিগকে অন্ন প্রদান করিতে সমর্থা হইলেন না।

অক্টোবর মাসে আবার খোর্দমহল হইতে অন্নকষ্টের চীৎকার শুনা যাইতে লাগিল। এ চীৎকারে গগন-মেদিনী পরিপূর্ণ হইল।

এই হতভাগিনী খোর্দমহল-বাসিনীগণ কি বলিয়া আর্তনাদ এবং চীৎকার করিয়াছিল, তাহা এই স্থানে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। কখনো তাহারা আপন আপন অদৃষ্টকে তিরস্কার করিয়াছে, কখনো পরমেশ্বরকে গালি বর্ষণ করিয়াছে, কখনো কখনো সর্বজন ঘৃণিত ইংরাজদিগকে বিবিধ প্রকারে অভিসম্পাত করিয়াছে।

কিন্তু ফায়েজাবাদস্থিত ইংরাজদিগের কেন্টনমেন্টের প্রধান কার্যাধ্যক্ষ

মেজর গিল্পিন লক্ষ্ণৌর রেসিডেন্টের নিকট ইহাদিগের দুরবস্থা সম্বন্ধে যাহা-কিছু লিখিয়াছিলেন, তাহাই কেবল এখানে উল্লেখ করিতেছি।

এখন আবার ব্রিস্টো সাহেব রেসিডেন্ট হইয়া আসিয়াছেন। মিডলটন এবং জন্‌সন্ হেস্টিংসের কোপানলে পড়িয়া পদচ্যুত হইয়াছেন। বেগমদের ধনাগার লুণ্ঠনকালে যে, মিডলটন সাহেব কিছু এদিক-ওদিক করিয়াছেন, তাঁহা হেস্টিংসের ন্যায় ধূর্ত লোকের বুঝিতে বড় বিলম্ব হয় না। সুতরাং অন্যান্য কার্যের ত্রুটির ছলনায় মিডলটন এবং জন্‌সন্‌কে লক্ষ্ণৌ হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

১৭৮২ খ্রীঃ অব্দের ৩০শে অক্টোবর তারিখে ব্রিস্টো সাহেবের নিকট মেজর গিল্পিন ফায়েজাবাদ হইতে লিখিলেন *।

'গতরাত্রে আট ঘটিকার সময় খোর্দমহল-বাসিনী রমণীগণ ছাদের উপর উঠিয়া অন্নকষ্ট-নিবন্ধন ভয়ানক চীৎকার করিয়াছে। বিগত চারিদিবস হইতে তাহাদের ঘোর অন্নকষ্ট হইয়াছে। কিন্তু গতকল্য ইহারা একেবারে অনাহারে ছিল। ইহাদিগের সে চীৎকার এবং আর্তনাদ, ভাষাদ্বারা সহজে ব্যক্ত করা যায় না।'

ইহার পর, আবার ১৫ই নভেম্বর মেজর গিল্পিন সাহেব ব্রিস্টো সাহেবের নিকট লিখিলেন †,—

'খোর্দমহল-বাসিনী রমণীগণের ক্রন্দন এবং আর্তনাদ অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা খোর্দমহল পরিত্যাগ করিয়া বাজারে যাইতে

* Last night about 8 o'clock, the women in the Khourd Mahal zenana, under the charge of Latiff Ali Khan assembled on the top of the buildings, crying in a most lamentable manner for food, that for the last four days they had got but a very scanty allowance, and that yesterday they had got none. The melancholy cries of famine are more easily imagined than described &c.—Letter from Major Gilpin to John Bristow Esq., Resident at Lucknow, Dated Fyzabad, 30th October 1782.

† Sir,—The repeated cries of the women in Khourd Mahal zenana for subsistence have been truly melancholy. They beg most pitiously for liberty, that they may earn their daily bread by laborious servitude; or be relieved from their miseries by immediate death. In consequence of their unhappy situation, I have this day taken the liberty of drawing on you in favour of Ramnarain at ten day's sight for twenty thousands KERAH rupees, ten thousands of which I have paid to Khojah Latiff Ali Khan, under whose charge that zenana is.—Letter from Major Gilpin to Gohn Bristow Eqs. 15th November 1782.

চায়ে। তাহারা বলে যে, বাহিরে যাইয়া তাহারা শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা অর্থ উপার্জন পূর্বক জীবিকা নির্বাহ করিবে। আমি আর ইহাদিগের এ ভয়ানক দুরবস্থা দেখিতে পারি না। অদ্য আপনার নামে রামনারায়ণকে বিশ হাজার টাকার হুণ্ডী লিখিয়া দিয়া, বিশ হাজার টাকা কর্জ করিয়াছি। এই টাকা হইতে দশ হাজার টাকা তৎক্ষণাৎ খোর্দমহলের দারোগা খোজা লতিফ আলি খাঁর হাতে দিয়াছি।

খোর্দমহলের স্ত্রীলোকগণ বাজার হইতে প্রায় ত্রিশহাজার টাকার জিনিস বাকীতে পূর্বেই আনিয়াছেন। মেজর গিল্পিনের প্রদত্ত দশহাজার টাকা পূর্ব দেনা পরিশোধ করিতেই নিঃশেষিত হইল। ইহাদিগের অন্নকষ্ট নিবারণের আর কোনো উপায় রহিল না। ইহার কয়েক দিন পরে এই হতভাগিনী রমণীগণের চীৎকার এবং আর্তনাদ আবার শতগুণে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইহারা খোর্দমহলের দ্বার ভগ্ন করিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিল। খোজা লতিফ আলি খাঁ ইহাদিগকে অনেক বলিয়া কহিয়া আপন আপন গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। লতিফ আলি ইহাদিগের নির্দিষ্ট প্রাপ্য টাকা লক্ষ্ণৌ হইতে আনাইয়া দিবেন। তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া তিন-চারিদিন ইহারা নির্বাক রহিল। কিন্তু দশদিনের মধ্যেও লক্ষ্ণৌ হইতে কোনো টাকা আসিয়া পৌঁছিল না। তখন ইহারা লতিফ আলিকে বিশ্বাসঘাতক মনে করিয়া শতগুণে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। খোর্দমহলের দ্বার ভঙ্গ করিয়া বাহিরে আসিল।

লতিফ আলি তখন অনন্যোপায় হইয়া হাস্মৎ আলি খাঁ জমাদারের নিকট যাইয়া এই সকল বিবরণ বিবৃত করিলেন। হাস্মৎ আলি প্রহার পূর্বক ইহাদিগকে পুনর্বার খোর্দমহলের ভিতরে বদ্ধ করিয়া রাখিবার অভিপ্রায়ে কেন্টনমেন্ট হইতে কতক সিপাহী সঙ্গে করিয়া আনিলেন।

খোর্দমহলের দ্বার অন্যূন দুই হাজার লোকে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সম্মুখে তিন-চারিশত বালক, তাহাদের পশ্চাতে সাত-আটশত বাঁদী ও বালিকা সকলের পশ্চাতে প্রায় তিনশত নবাবপত্নী। শেষোক্ত স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই নবাব বরহানমূলক, নবাব সফদরজঙ্গ এবং নবাব সুজাউদ্দৌলার পত্নীগণ দাঁড়াইয়াছেন।

সিপাহীদিগকে লক্ষ্য করিয়া ইহারা ইষ্টক নিক্ষেপ করিতে লাগিল। দুই তিনশত সিপাহী অত্যল্পকাল মধ্যে ইহাদিগকে যষ্টির প্রহারে চতুর্দিকে তাড়াইয়া দিল। বালক-বালিকাগণ কি আর সিপাহিদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে

পারে? ইহারা চতুর্দিকে দৌড়াইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। চারি-পাঁচজন নবাবপত্নীর পৃষ্ঠে সিপাহিদিগের যষ্টির আঘাত পড়িতে লাগিল। সেই সকল নবাবপত্নী তখন লজ্জা ভয় বিবর্জিত হইয়া, বউবেগমের আবাসগৃহ রঙ্গমহলে মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বউবেগম নিজের ইজ্জতের ভয়ে খোজাদিগকে দ্বাররুদ্ধ করিতে বলিয়া, তৎক্ষণাৎ হাসমত আলি খাঁ জমাদারকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। এদিকে এই অনাথা নবাবপত্নীগণ বাহিরে সিপাহিদিগের সম্মুখে নিতান্ত ভিখারিণীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

হাসমৎ আলি খাঁ জমাদার বউবেগমের নিকট আসিবামাত্র বেগম সক্রোধে বলিলেন—

'বেওয়াফা? নেমকহারাম? সাতপুরুষ পর্যন্ত যাহার নুন খাইয়া মানুষ হইয়াছিস, আজ তাঁহার পত্নীদিগের ইজ্জত নষ্ট করিতেছিস্। তাঁহার পত্নীদিগের পিঠে আঘাত করিতেছিস্।'

হাসমৎ আলি খাঁ এখন ইংরাজদিগের সৈন্যভুক্ত হইয়াছেন। পূর্বে নবাবের সরকারের একজন সুবেদার ছিলেন। তিনি বেগমের ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,—

'আজ্ঞে? নবাব আসফউদ্দৌলার হুকুমানুসারেই এইরূপ আচরণ করিয়াছি। ইংরাজদিগের হুকুমানুসারে যে এইরূপ করিয়াছেন, তাহা বলিতে আর ইঁহার সাহস হইল না।

বেগম আবার সক্রোধে বলিলেন,—'নবাব সুজাউদ্দৌলা, এবং নবাব মনসুর আলি খাঁ সফদরজঙ্গের পত্নীগণকে এইরূপ অপমান করিবার কোনো ক্ষমতা আসফউদ্দৌলার নাই। দুর্বৃত্ত গোলাম? ভবিষ্যতে যদি আর তুই কখনো এইরূপ আচরণ করিস্, তবে নিশ্চয়ই তোর শিরশ্ছেদন করা হইবে।'

বেগম এই বলিয়া নিজে বাহিরে আসিয়া খোর্দমহলবাসিনী রমণীদিগকে বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন,—

'তোমরা অন্ততঃ আপন আপন স্বামীর ইজ্জত রক্ষার্থ এইরূপ আচরণ পরিত্যাগ কর। আমি আত্মবিক্রয় করিয়া তোমাদিগের অন্নের সংস্থানের চেষ্টা করিব।'

সিপাহীদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার সময় যষ্টির আঘাতে যে দুইটি বালকের মাথা ফাটিয়া গিয়াছিল, তাহারা দুইজনই সুজাউদ্দৌলার ঔরসজাত পুত্র। বেগম হাতে ধরিয়া তাহাদিগকে আপন গৃহে লইয়া গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ

নিজের একজন প্রাচীনা বাঁদীর নিকট হইতে কর্জ করিয়া চারিশত টাকা ইহাদের হাতে দিলেন *।

বউবেগমকে সমুদয় খোর্দমহল-বাসিনী রমণীই অত্যন্ত সম্মান করিতেন, সুতরাং তাঁহারা বেগমের অনুরোধে নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন।

বউবেগম ইহাদিগকে অন্নের সংস্থানার্থ কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারেন না। পরদিন প্রাতে তিনি স্বয়ং মতীমহলে আপন শাশুড়ীর নিকট গমন করিলেন। খোর্দমহলের সমুদয় দুরবস্থার কথা শাশুড়ীর নিকট বিবৃত করিলেন। কিন্তু মতীবেগম পুত্রশোকে এবং অর্থ সম্পত্তির শোকে এখন একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি কোপাবিষ্ট হইয়া বলিলেন,—

'সুজার যেমন কর্ম তেমন ফল—যখন এই বিশ্বাসঘাতক, দাগাবাজ ফিরিঙ্গীকে এ রাজ্যে স্থান দিয়াছে, তখন তাহার পত্নীদিগের যে এ দুর্দশা হইবে, তাহা আমি পূর্বেই বলিয়াছি। আমার নিকট তোমার কোনো পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই?'

বেগম শাশুড়ীর এই কর্কশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে রঙ্গমহলে প্রত্যাবর্তন করিলেন। মনে করিলেন যে এখন এক পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভর ভিন্ন আর কোনো উপায় নাই।

বেগম এই বিপদ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত দিবা-রাত্রি কেবল ঈশ্বরের চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় মৃজা সাদাত আলি খাঁ দুই-এক দিনের মধ্যেই কাশী হইতে ফায়েজাবাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

মাতৃর্জা খাঁর প্রাণ সংহারের পর আসফউদ্দৌলার ভয়ে সাদাত আলি এ পর্যন্ত বেনারসে অবস্থান করিতেছিলেন। খোর্দমহলবাসিনী নবাব পত্নীদিগের অন্ন-কষ্টের সংবাদ শ্রবণ করিয়া সাদাত আলি অবিলম্বে ফায়েজাবাদে চলিয়া আসিলেন। মৃজা সাদাত আলির গর্ভধারিণীও খোর্দমহল বাসিনী নবাবপত্নী। সুতরাং জননীর অন্নকষ্টের সংবাদে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল।

তিনি ফায়েজাবাদে আসিয়া দেখিলেন যে বউবেগম এখন বাঁদীর পোশাক পরিধান করেন। বউবেগমের এই দুর্দশা দেখিয়া সাদাত আলি যার-পর-নাই কষ্টানুভব করিতে লাগিলেন। সাদাত আলির নিজের দুই-তিনলক্ষ টাকা ছিল।

* The Begum then sent for two of the children who were wounded in the affray of the last night···She then gave the children 400 rupeess and dismissed them.—Vide Burke's Speeches, Vol. III, p. 272-73.

তাঁহারা খোর্দমহল-বাসিনীদিগকে অন্নের সংস্থান এবং বউবেগমকে বেগমের উপযুক্ত পরিচ্ছদ ক্রয় করিয়া দিলেন। কিন্তু বেগম আজীবন বাঁদীর পোশাক পরিধান করিবেন বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। যে বেশে তিনি সুজার উদ্ধারার্থ বক্সারে গিয়াছিলেন, সেই বেশেই তিনি দিন যাপন করিতে লাগিলেন; সেই বাঁদীর বেশই তাঁহার পাপের অন্যতম প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া মনে করিলেন।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়

সম্মিলন

বিগত ডিসেম্বর মাসে শ্রীনিবাস পণ্ডিত অমরসিংহ, ছত্রসিংহ এবং বাণেশ্বরের সমভিব্যাহারে কাশীতে যাত্রা করিয়াছেন। কাশীতে যাইবার সময়ে পথে শুনিলেন যে চেৎসিংহের মাতা মহারানী পূর্ণিমা ফিরিঙ্গীর স্পর্শ-স্বরূপ-কলঙ্ক হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবার নিমিত্ত তুষানলে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। রাস্তার এক-একজন লোক এক-এক প্রকার কথা বলিতে লাগিল। কেহ বলিল যে তিনি তুষানলে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কেহ বলিল যে আগামী মাঘী পূর্ণিমার দিবস তুষানলে প্রাণ বিসর্জন করিবেন। শ্রীনিবাস এইরূপ সংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া শীঘ্র শীঘ্র কাশীতে যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কাশীতে পৌঁছিয়াই তিনি অমরসিংহ, ছত্রসিংহ এবং বাণেশ্বরের নিকট হইতে বিদায় লইয়া পূর্ণিমার বাসস্থানে চলিলেন। পূর্ণিমার আবাসগৃহের ঠিকানা সংগ্রহ করিতে বিশেষ কোনো কষ্ট হইল না। চেৎসিংহের মাতা এবং স্ত্রী যে বাটিতে আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন, সে বাড়ি সকলেই চিনিত।

পূর্ণিমার বাসগৃহের দ্বারে যাইয়া শ্রীনিবাস দ্বাররক্ষকের নিকট বলিলেন,—'তোমাদের মহারানীকে বল যে শ্রীনিবাস পণ্ডিত তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।'

দ্বাররক্ষক বলিল,—'ঠাকুর রানী কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন না। এ দ্বার সর্বদা বন্ধ রাখিবার হুকুম হইয়াছে।'

শ্রীনিবাস বলিলেন,—'মহারাজ চেৎসিংহের মাতা আমার নাম শুনিলে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন।'

কিন্তু দ্বাররক্ষক কিছুতেই শ্রীনিবাসের কথা বিশ্বাস করিল না। সে বলিল যে স্বয়ং বড় মহারানী গোপালকুমারীর সঙ্গেও রানী সাক্ষাৎ করেন নাই।

শ্রীনিবাস তখন অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া আপন নামটি একখানি কাগজে লিখিয়া, দ্বাররক্ষককে রানীর হস্তে প্রদান করিতে বলিলেন। পূর্ণিমা বাল্যকাল হইতে পিতার স্বাক্ষর চিনিতেন। দ্বাররক্ষককে বলিয়া দিলেন রানীর নিকট মুখেও বলিবে যে, শ্রীনিবাস পণ্ডিত দ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন।

দ্বাররক্ষক শ্রীনিবাসের স্বাক্ষরিত কাগজখানি পূর্ণিমার হস্তে প্রদানান্তর "শ্রীনিবাস পণ্ডিত"—এ কথা বলিবামাত্র পূর্ণিমা আত্মবিস্মৃতের ন্যায় দৌড়িয়া গৃহের দ্বারাভিমুখে চলিলেন। এখন তিনি অহর্নিশ কেবল পিতার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। এই মুহূর্তেও পিতাকেই মনে মনে ভাবিতেছিলেন। পিতার নাম শ্রবণমাত্র পাগলিনীর ন্যায় পিতৃচরণ দর্শনার্থ ধাবিত হইলেন। দ্বাররক্ষক তাঁহার তৎসাময়িক অবস্থা দেখিয়া অবাক্ হইয়া পড়িল।

ঠিক্ অষ্টম বৎসর বয়সের সময় পূর্ণিমা পিতাকে কোথা হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে দেখিলে, যদ্রূপ দৌড়িয়া যাইয়া পিতার গলা জড়াইয়া ধরিতেন, আজ সেইভাবে পিতার নিকটে যাইয়া তাঁহার পদতলে পড়িলেন। শ্রীনিবাস কন্যাকে ধরিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পণ্ডিতেরা বলেন হৃদয়ের পূর্ণতানিবন্ধন মুখ হইতে বাক্য বহির্গত হয়। কিন্তু হৃদয়ের পূর্ণতা আবার কণ্ঠাবরোধ করে। পূর্ণিমা আজ গৃহে প্রবেশ করিয়া পিতার গলা ধরিয়া বসিলেন। দুই চক্ষু হইতে কেবল প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। দুই ঘণ্টার মধ্যেও কোনো কথা বলিবার সাধ্য হইল না। হৃদয়ের পূর্ণতা তাঁহার কণ্ঠরোধ করিল।

শ্রীনিবাস অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। পূর্ণিমা তাঁহার কথার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কোনো কথা স্পষ্টরূপে মুখ হইতে বাহির হইল না।

শ্রীনিবাস পূর্ণিমাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া কিছু কালের নিমিত্ত নির্বাক রহিলেন। পরদিন পূর্ণিমা তুষানলে প্রাণবিসর্জন করিবার সঙ্কল্প পিতার নিকট ব্যক্ত করিলেন।

কিন্তু শ্রীনিবাস পণ্ডিত তাঁহাকে নানাবিধ সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধ প্রদানান্তর বলিতে লাগিলেন—

'বাছা, মূঢ়েরা পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত অবধারণে অসমর্থ হইয়া, তুষানলে

প্রাণ বিসর্জন করে। কিন্তু অনুতাপানলই পাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। হৃদয়স্থিত পাপ, অনুতাপানল ভিন্ন কখনো তুষানলে ভস্মীভূত হয় না। যে সকল মূঢ়ের হৃদয়ে কোনো প্রকারেই অনুতাপানল প্রবেশ করে না, সে সকল পাষণ্ড মূঢ়ের অন্তরস্থিত দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি—একেবারে সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে; এই জড়দেহ বিনাশার্থ তাহাদের নিমিত্তই কেবল শাস্ত্রকারেরা তুষানলের ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন। অশিক্ষানিবন্ধন বর্ত্তমান সমাজ প্রচলিত-পাপ এবং ধনরত্ন-পদ-প্রভুত্বের-গর্ব একসময় হয়তো তোমার হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান বিপদরাশি তোমার হৃদয় মধ্যে অনুতাপানল প্রজ্বালিত করিয়া তোমার স্বাভাবিক প্রকৃতি পুনরুদ্ধার করিয়াছে। এ সংসার নর-নারীর একমাত্র কার্যক্ষেত্র। যত্নে জীবনরক্ষা করিয়া, মানব জীবনের কর্ত্তব্য সাধন কর।'

শ্রীনিবাস নানা কথা দ্বারা পূর্ণিমাকে সান্ত্বনা করিলে পর, তিনি তুষানলের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া, পিতার সঙ্গে কাশীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রত্যহই পিতার নিকট ধর্মের বিবিধ কথা, শাস্ত্রের কথা শ্রবণ করিতেন।

চেৎসিংহের স্ত্রীর বয়ঃক্রম ষোড়শ বৎসর মাত্র ছিল। রাজ্যচ্যুত হইবার সময় স্বয়ং চেৎসিংহের বয়ঃক্রমও বিশ-বাইশ বৎসরের অধিক ছিল না। শ্রীনিবাস পণ্ডিত, অমরসিংহ, মহাবীরসিংহ এবং অন্যান্য লোক সঙ্গে দিয়া চেৎসিংহের স্ত্রীকে চেৎসিংহের নিকট প্রেরণ করিলেন। মীরকাসিমের ন্যায় রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া চেৎসিংহকেও দীর্ঘকাল এ সংসারের কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে সিন্ধিয়ার রাজধানী গোয়ালিয়ার নগরে মহারাজ চেৎসিংহের মৃত্যু হয়। ইহার অনেক পূর্বে সুজনসিংহের মৃত্যু হইয়াছিল।

বাগেশ্বর একক্রমে অন্যূন বিশ-বাইশ বৎসর পর্যন্ত দেশ পর্যটন করিয়াছিলেন। বিবিধ শারীরিক নিয়ম-লঙ্ঘন-প্রযুক্ত বাগেশ্বরের অনেক পূর্বেই মৃত্যু হইত। কিন্তু মানুষের মন কোনো বিষয়-বিশেষের প্রতি ধাবিত হইলে শরীর সহজে পতন হয় না। বাগেশ্বরের মন এক এক সময়ে এক-একটা বিষয়ের প্রতি ধাবিত হইয়াছিল। সুতরাং আজ পর্যন্তও তিনি বাঁচিয়া রহিয়াছেন।

বাগেশ্বর আত্মহত্যা করিবার নিমিত্ত গলায় ফাঁস দিলে পর, কয়েক জন ধীবর তাঁহাকে অচৈতন্যাবস্থায় নদী হইতে উঠাইয়া পুনর্জীবিত করিয়াছিল। সেই আত্মহত্যার সময় হইতে আজ প্রায় বাইশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে।

স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মুখদর্শনে রণবীরবাগেশ্বরের মন আর কোনো বিষয়-বিশেষের

প্রতি ব্যথিত হইল না। সুতরাং শ্রীপুরের সহিত সাক্ষাতের অনতিকাল পরেই বাণেশ্বরের পরমায়ুঃ শেষ হইয়া আসিল। তাঁহার মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে শ্রীনিবাস সর্বদাই তাঁহার নিকট যাইয়া বিবিধ ধর্মের কথা বলিতেন। বাণেশ্বরের স্ত্রী, স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হইবেন বলিয়া পূর্বেই ঠিক্ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অমরসিংহ এবং তাঁহার ভগিনী মাতাকে এই পথ হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! বাণেশ্বরের মৃত্যুর কিছু পূর্বে তাঁহার স্ত্রী, স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে করিয়া বসিয়াছিলেন। বাণেশ্বরের মৃত্যুর দুই-চারি মিনিট পরে, অমরসিংহ দেখিলেন যে, তাঁহার মাতারও মৃত্যু হইয়াছে। তিনি মৃতাবস্থায় স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন।

বাণেশ্বরের মৃত্যুকালে শ্রীনিবাস সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি অমরসিংহের মাতার এই আকস্মিক মৃত্যু দর্শনে প্রথমে অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন। কিন্তু কিছুকাল চিন্তা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

'আজ সহমৃতা প্রথার প্রকৃত অর্থ আমার হৃদয়ঙ্গম হইল। জীবিতাবস্থায় যে সকল নারী স্বামীর চিতারোহণ করেন, তাঁহারা সত্য সত্যই আত্মঘাতিনী হন, প্রকৃত পতিপ্রাণা রমণীর আত্মা পতির মৃত্যুকালে এ জড়দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় পতির অনুসরণ করে। ঈদৃশ স্বাভাবিক মৃত্যুকে সহমরণ বলা যায়।

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর অমরসিংহ স্বীয় ভগ্নী, স্ত্রী, মহাবীরসিংহ, দুর্জ্জনসিংহ এবং চাঁদকুমারীকে সঙ্গে করিয়া হোলকারের রাজ্যে চলিয়া গেলেন। রানী গোলাপকুমারী ইঁহাদিগকে বেনারসের রাজার সৈনিক বিভাগে কার্য করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাবীর তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিতে লাগিলেন,—

'বেনারসের রাজা এখন একেবারে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীন হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং বেনারসের রাজার সৈন্যগণকে সর্বদাই কোম্পানির সাহায্যে যুদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু আমার পিতা এবং মাতামহের ভ্রম ও কুকার্য সংশোধন করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য। আমি কোম্পানির ছায়াও স্পর্শ করিব না।'

ইহার পর মহারাষ্ট্রীয়দিগের সঙ্গে ইংরাজদিগের যতবার যুদ্ধ হইয়াছে, তাঁহার প্রত্যেক যুদ্ধেই মহাবীর অলৌকিক বীরত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। দুর্জ্জনসিংহ, অমরসিংহ, মহাবীরসিংহ—ইঁহারা তিনজনেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সংগ্রামক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন করিয়া স্বর্গলাভ করিলেন।

রানী গোলাপকুমারী আপন জামাতা এবং কন্যার অনুরোধে কাশী হইতে রামনগর যাইয়া রাজকার্য পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইংরাজ গবর্নমেণ্ট এবং ইংরাজ-রেসিডেণ্টের সঙ্গে ইঁহার কোনো বিষয়ে মতৈক্য হইত না। কিরূপে প্রজার অর্থশোষণ করিবেন, তাহাই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একমাত্র চেষ্টা। পক্ষান্তরে গোলাপকুমারী প্রজাদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী ছিলেন। সুতরাং ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে কখনো মিল হইতে পারে না। হেস্টিংসের সঙ্গে রানী গোলাপকুমারীর প্রথম হইতে মতান্তর হইতে লাগিল। হেস্টিংস আলি ইব্রাহিম খাঁকে বেনারসের প্রধান জজের পদ প্রদান করিলেন। কিন্তু গোলাপকুমারী আলি ইব্রাহিম খাঁকে বিচারকের উপযুক্ত বলিয়া মনে করিতেন না। আলি ইব্রাহিম খাঁ যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, তাহার কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি অত্যন্ত ভীরু, সর্বদাই ইংরাজদিগের তোষামোদ করিতেন। গোলাপকুমারী সর্বদাই বলিতেন যে ভীরু, কাপুরুষ, তোষামোদকারী এবং চোর—এই চারিপ্রকারের লোক আর আর সকল কার্য করিতে সমর্থ, কিন্তু বিচারকের কার্য করিতে পারে না। কারণ নির্ভীক মন না হইলে বিচারশক্তি প্রখর ও সমুজ্জ্বল হয় না।

মহারানী গোলাপকুমারী স্ত্রীলোক হইলেও তাঁহার এ সিদ্ধান্ত একেবারে ভ্রমাত্মক বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারি না।

উপসংহার

এ সংসারে চিরকাল কাহাকেও কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। অনন্ত দুঃখানলে কাহাকেও জ্বলিয়া মরিতে হয় না। দুঃখ এবং বিপদ শারীরিক রোগের ন্যায় ঐশ্বরিক নিয়ম লঙ্ঘনেরই অবশ্যম্ভাবী ফল।

সীতাসদৃশী আমেতু জঁাহারা বেগমকে ধন-সম্পত্তি রক্ষার চিন্তা প্রকৃতি-ভ্রষ্ট করিয়াছিল। সেই ধন-সম্পত্তি বিনাশ-স্বরূপ বিপদরাশি অবিলম্বে তাঁহাকে দুঃখ সাগরে নিমগ্ন করিল। তাঁহার দুর্গতির সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইল। বিপন্নাবস্থায় তাঁহার নিজকৃত পাপের প্রতি দৃষ্টি পড়িল।

এ সংসারের সর্বপ্রকার বিপদই কেবল মানুষের সৃষ্টি তাহার পাপ, কুকার্য, এবং কর্তব্য লঙ্ঘনের প্রতি ফিরাইবার নিমিত্তই অভিপ্রেত হইয়াছে। সুতরাং বিপদ-সম্পদ উভয়ই মঙ্গলময় ঈশ্বরের করুণাসম্ভূত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

১৭৮২ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বরের পূর্বেই খোজা জহর আলি এবং বহর আলি কারামুক্ত হইয়া ফয়েজাবাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কোর্ট অব ডিরেক্টরের আদেশানুসারে প্রায় দুই বৎসর পরে বেগমের সমুদয় জায়গির প্রত্যর্পিত হইল। বেগমের জায়গির প্রত্যর্পিত হইলে পর, বেগমচলের অন্নকষ্টও দূর হইল।

হতভাগ্য নবাব আসফউদ্দৌলার হাতে মাতার ভৎসনা এবং আক্ষেপোক্তি পরিপূর্ণ পত্রখানি পৌছিবামাত্র, তাঁহার হৃদয়মধ্যে আত্মগ্লানি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এই পত্রই আসফউদ্দৌলার মৃত্যুবাণে পরিণত হইল। এ পত্রের প্রত্যেক অক্ষর হইতে জননী-হৃদয়ের আগুন উদ্‌গিরিত হইয়া আসফউদ্দৌলাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। ইহার পর তিনি রাজকার্যে মনোনিবেশ করিতে আর সমর্থ হইলেন না। অহর্নিশ অন্দরের মধ্যে শয্যাগত হইয়া পড়িয়া থাকিতেন। ইংরাজেরা বলিতেন যে, নবাব আসফউ-দ্দৌলা দিবারাত্র উপ-পত্নীদিগের সমভি-ব্যাহারে অন্দরের মধ্যে ইন্দ্রিয়সেবায় কালযাপন করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তাহা নহে। আসফউদ্দৌলার হৃদয়ে কেবল আত্মগ্লানির অগ্নি জ্বলিতেছে। যার-পর-নাই মনোকষ্টে কালযাপন করিতেছেন। অন্যূন পনের বৎসর পর্যন্ত এইরূপ মনোকষ্টে কাল যাপন করিয়া ১৭৯৭ খ্রীঃ অব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর কয়েক দিবস পূর্বে কলিকাতার গভর্নর জেনেরল স্যার

জন্ শোর কলিকাতা হইতে কয়েক জন ইউরোপীয় চিকিৎসক অযোধ্যায় প্রেরণ করিলেন। কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও আসফউদ্দৌলাকে কেহ ঔষধ খাওয়াইতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন,—"এই বিশ্বাসঘাতক ফিরিঙ্গীগণই আমার পরমায়ুঃ শেষ করিয়াছে। আমি আর ইহাদের ঔষধ সেবন করিব না।"

মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে একবার মাতৃচরণ দর্শন করিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে ফয়েজাবাদে লোক প্রেরিত হইল।

জননীর হৃদয় অসীম স্নেহে গঠিত। কুপুত্র-সুপুত্র সকলই মাতার নিকট সমান। বেগম পুত্রের মৃত্যুকাল উপস্থিত শুনিয়া লক্ষ্ণৌ যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু যে দিন লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, সেই দিন প্রাতে লক্ষ্ণৌ হইতে আসফউদ্দৌলার পাগড়ীসহ লোক আসিয়া বেগমকে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ প্রদান করিল। মৃত্যুর কিছু কাল পূর্বে তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার পাগড়ী তাঁহার জননীর পদতলে রাখিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। নিস্তেজ, কাপুরুষ কিন্তু সহৃদয় এবং দানে দাতাকর্ণ সদৃশ আসফউদ্দৌলা এইরূপে ১৭৯৭ খ্রীঃ অব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

ইংরাজেরা প্রথমতঃ অর্থলোভে আসফউদ্দৌলার পুত্র নবাব উজীর আলিকে সিংহাসন প্রদান করিলেন। কিন্তু চারি মাস পরে, আবার সদাত আলির নিকট হইতে প্রভূত পরিমাণে অর্থলোভের আশায়, উজীর আলিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, আসফউদ্দৌলার বৈমাত্র-ভ্রাতা সদাত আলিকেই সিংহাসন প্রদান করিলেন।

সদাত আলি অবৈধ উপায় অবলম্বন পূর্বক সিংহাসন লাভ করিলেও উত্তরকালে তিনি অত্যন্ত প্রজাবৎসল রাজা বলিয়া পরিচিত হইলেন। মস্নদে উপবেশন করিবার পূর্বে মসজিদে যাইয়া তোবা করিলেন যে, পিতৃরাজ্য রক্ষা না করিয়া কোনো প্রকার বিলাস কিম্বা ইন্দ্রিয়সেবায় রত হইবেন না। সিংহাসনারোহণের পর স্ত্রীসংসর্গ একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে সুচারুরূপে রাজ্যশাসন করিয়া আসফউদ্দৌলার সমুদয় ঋণ পরিশোধ করিলেন। তাঁহার রাজকোষ ধনরত্নে পরিপূর্ণ হইল। প্রজাদিগের হাহাকার শব্দ দূর হইল। অযোধ্যা আবার জান্নত-উল্লান নামে অভিহিত হইল। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির স্পর্শদোষ একবার যে রাজ্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহার আর উদ্ধার নাই। ওয়ারেন হেষ্টিংস চুনারের সন্ধিপত্রে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, সাময়িক সৈন্যদল (Temporary brigade) অযোধ্যা হইতে স্থানান্তরিত

করিবেন। লর্ড কর্নওয়ালিস্ সে সন্ধি আত্মনবলে ভঙ্গ করিলেন। ইহাতে সদাত আলি কোনো আপত্তি করিলেন না। তিনি সামরিক সৈন্যদলের ব্যয়ও বহন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহার পর লর্ড ওয়েলেস্‌লি সদাত আলির রাজকোষে অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে দেখিয়া, আফগান যুদ্ধাশঙ্কায় ছলনায় আবার বহুসংখ্যক নতুন ইংরাজ সৈন্য অযোধ্যায় রাখিবার প্রস্তাব করিলেন। সদাত আলি এই সকল সৈন্যের ব্যয়ভার বহন করিতে অস্বীকার করিলেন। লর্ড ওয়েলেস্‌লি তখন অন্যায় পূর্বক সাদাত আলির অসম্মতিতে বহুসংখ্যক নতুন সৈন্য অযোধ্যায় প্রেরণ করিলেন এবং নবাবের কর্মচারীদিগকে ধৃত করিয়া এই সকল সৈন্যের ব্যয় আদায় করিতে হুকুম করিলেন। সাদাত আলি তখন নিতান্ত নিরুপায় হইয়া ইংরাজদিগকে নগদ টাকা প্রদানের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার নিমিত্ত, রাজ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ একেবারে ইংরাজদিগেকে ছাড়িয়া দিলেন। অযোধ্যার কতকাংশ ইংরাজ-রাজ্য-ভুক্ত হইল।

ইহার পর আর ইংরাজদিগের নগদ টাকা দাবী করিবার বড় সুবিধা রহিল না। তখন তাঁহারা আর-একটি নতুন কৌশল অবলম্বন করিলেন। এক-গুলিতে দুই বাঘ সংহারের উদ্যোগ করিলেন। দিল্লীর বাদশাহের নাম লোপ করিয়া সাদাতআলিকে অযোধ্যার রাজা উপাধি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। এ পর্যন্ত অযোধ্যার নবাবগণ দিল্লীর বাদশাহকে কর প্রদান না করিলেও নামে বাদশাহের উজীর বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কিন্তু বাদশাহের নাম লোপ করিবার চক্রান্ত হইল।

সাদাত আলি বুঝিতে পারিলেন যে, এ কেবল দিল্লীর বাদশাহের নাম লোপ এবং অযোধ্যার অর্থ-শোষণের কৌশল হইয়াছে। তিনি ইংরাজ গবর্নমেণ্টকে লিখিয়া পাঠাইলেন,—

'আমার পিতা-পিতামহ দিল্লীর বাদশাহের গোলাম ছিলেন। দিল্লীর বাদশাহের উজীর বলিয়া পরিচয় দিতে তাঁহারা লজ্জা বোধ করিতেন না। আমি আপন পিতা-পিতামহের উপার্জিত রাজ্য রক্ষা করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। আমি কোন্ মুখে পিতা-পিতামহের অপেক্ষা উচ্চতর উপাধি গ্রহণ করিব?'

সাদাতআলির আমলে যেমনে আর্থিকের খাজনা সুচারুরূপে আদায় হইতে লাগিল। এখন আর কেবল নিজে আয়-ব্যয় কিছুই দেখেন না। লোভী সাদাত আলি খাঁই সঞ্চয় শুরু করিতে লাগিলেন। ১৮০৮ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে তহবিলে আদায় প্রায় এক কোটি টাকা সঞ্চিত হইল। [illegible]

হস্তাগিরীদিগের অন্ন সংস্থানার্থ বেগম পূর্বে একবার প্রবৃত্ত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এখনও সেই উদ্দেশ্যেই টাকা সঞ্চয় করিতেছেন।

কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর এ টাকা কাহার হাতে রাখিবেন সেই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অযোধ্যার নবাবের হাতে এই টাকা রাখিলে হয়তো তাহা ইংরাজেরা লুঠ করিবে; কিম্বা আসফউদ্দৌলার ন্যায় কোনো অপরিমিত-ব্যয়ী নবাবের হাতে টাকা পড়িলে অত্যল্প সময় মধ্যে সমুদয়ই নষ্ট হইবে।

বেগম অত্যন্ত সুচতুরা এবং বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন যে, ইংরাজ গবর্নমেন্টের হাতে আমানত রাখিলে আর এ টাকা তাহাদের আত্মসাৎ করিবার সুবিধা থাকিবে না। এই প্রকার চিন্তা করিয়া তিনি মৃত্যুর পূর্বে নগদ নিরানব্বই লক্ষ আটচল্লিশ হাজার, নয়শত ষোলটাকা খোর্দমহাল-বাসিনিদিগের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত ইংরাজ গবর্নমেন্টের হাতে আমানত রাখিলেন। আর জায়গির এবং সমুদয় জহাবর সম্পত্তি নবাব সাদাত আলিকে প্রদান করিলেন। কিন্তু বেগমের মৃত্যুর পূর্বেই সাদাত আলির মৃত্যু হইল। সাদাত আলির পুত্র গাজীউদ্দীন হায়দর সিংহাসনারূঢ় হইলেন। ইনিই ইংরাজদিগের অনুরোধে দিল্লীর বাদশাহের নাম লোপ করিয়া,অযোধ্যার রাজা উপাধি গ্রহণ করিলেন।

অযোধ্যার প্রথম রাজা গাজীউদ্দীন হায়দরের আমলে ১৮.৫ খ্রীঃ অব্দে সীতা সদৃশী অযোধ্যার বেগম শ্রীশ্রীমতী আমেতু জ'াহারা বউবেগম জীবনের বিবিধ কর্তব্য সাধন করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

সমাপ্ত